VISMRITA YATRI

প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬০

প্রকাশক
বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩/১, কলেজ রো
া-৯

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলিকাতা-৭

আমার বাবা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার

শ্রীচরণেষু—

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিন্দী তথা ভারতীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যেও তিনি সুপরিচিত। 'বিস্মৃত যাত্রী' তাঁর একটি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী। রাহুল একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন—'ষষ্ঠ শতাব্দীর ঐতিহাসিক উপন্যাস'। কাহিনীর আরম্ভ ৫১৮ খৃষ্টাব্দে, শেষ ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে। কাহিনীর নায়ক নরেন্দ্রযশের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের কাহিনী এতে বিবৃত হয়েছে। এই জীবন-কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, রোমান্স আছে. আর আছে ধর্মচেতনা ও ধর্মপ্রচারের ইতিবৃত্ত। কাহিনীর বড়ো কথা, নায়ক নরেন্দ্রযশ কোনো কাল্পনিক চরিত্র নন। তিনি আমাদেরই দেশের মানুষ। অধুনাতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক উদ্যানভূমিতে তাঁর জন্ম। মৃত্যু মহাচীনে।

রাহুলের মধুক্ষর: ভাষায় এই বিস্মৃত যাত্রীর কাহিনী প্রথম পড়ার সময় আমার চোখের সামনে অতীত দিনের চিত্রগুলি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন পরিপ্লুত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। রাহুল তখন জীবিত। কিন্তু অনুবাদের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হতেই মহাকাল এই মহাপণ্ডিতকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বাংলা অনুবাদ গ্রন্থটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু বাঙালী পাঠক গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবার পর তাঁদেরই আগ্রহে পর পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। তাঁদের কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

ভূমিকা

আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং পর্যটক। তাই 'বিস্মৃত যাত্রী'র মতো উপন্যাস লেখার প্রতি আকর্ষণ বোধ করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। এই ধরনের উপন্যাসে আমি ঐতিহাসিক আর পর্যটকের দায়িত্বই পালন করার চেষ্টা করি। ফলে, উপন্যাস-রসিক পাঠকরা এতে কিছুটা ঘাটতি দেখতে পান। যেইসব পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তবু যেসব দোষত্রুটি তাঁরা দেখান তার অনেকগুলিই আমি উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু সেগুলি দূর করা সহজ নয়। কারণ, তাহলে অনেক তথ্য বাদ দিতে হয়। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। তাছাড়া অতীতের সমাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার যথার্থ রূপে উপস্থাপিত করাই আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস আর ভূগোল কিংবা তৎকালীন দেশ-কাল-পাত্রের অসঙ্গতিকে আমি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি। নিছক কৈফিয়ত দিলেই সে অপরাধ স্খালন হয় না। 'বিস্মৃত যাত্রী' লেখার সময় এইসব দিকে আমি কতটা লক্ষ্য রাখতে পেরেছি, সহৃদয় পাঠকরাই তা বিচার করবেন।

নরেন্দ্রযশ কোনো কাল্পনিক চরিত্র নন তিনি আমাদেরই দেশের মানুষ। আধুনিক পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাত (উদ্যান)-ভূমিতে ৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষু হবার পর তিনি ভারত, সিংহল, মধ্য এশিয়া, যাযাবরদের দেশ আর চীন পর্যটন করেছিলেন। শেষে এসেছিলেন আধুনিক সিগান (প্রাচীন ছাঙ্-আন্) মহানগরীতে। সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। চীনা সাহিত্যে তাঁর সম্বন্ধে যা পাওয়া যায়, ডঃ পা চাউ তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

নরেন্দ্রযশ উদ্যানের ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সতের বছর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। একুশ বছর বয়সে বৌদ্ধ

সংঘ তাঁকে উপসম্পদা দিয়েছিল। ভিক্ষু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, যেখানে যেখানে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে সেইসব পবিত্রভূমি তিনি পরিদর্শন করবেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন বহু জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। দক্ষিণে গিয়েছিলেন সিংহল পর্যন্ত আর উত্তরে হিমালয় ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। একবার এক স্থবির তাঁকে বলেছিলেন: "নির্জনে শীল অভ্যাস করো, তাহলেই তুমি আর্যফল (নির্বাণ) লাভ করতে পারবে, নইলে তোমার এই পর্যটন ব্যর্থ হবে।

নরেন্দ্রযশ তাঁর কথা শোনেন নি।

সিংহল থেকে ফিরে কিছুকাল তিনি উদ্যানে ছিলেন। তাঁর বিহার যখন আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, সম্ভবত তখনই তিনি সাহায্য লাভের আশায় পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে হিমালয়ের উত্তরে যাত্রা করেছিলেন। হিমালয়ের ওপর দুটি রাস্তা ছিল—একটি মানুষের, অন্যটি দানবের। নরেন্দ্রযশ যখন বুঝতে পেরেছিলেন, তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন পথ-ভ্রষ্ট হয়ে দানবের পথে চলে গেছেন তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দানবরা ততক্ষণে তাঁর সেই সঙ্গীকে মেরে ফেলেছিল। নরেন্দ্রযশ মন্ত্রশক্তির বলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। পরে আবার এক ডাকাতের দল তাঁদের ঘিরে ফেলেছিল। সেবারও তিনি মন্ত্রবলে উদ্ধার পেয়েছিলেন। পূর্বদিকে যখন অবারদের দেশে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তখন সেখানে তুর্কদের বিদ্রোহ চলছিল। পশ্চিমদিকে গিয়ে উদ্যানে ফেরার সম্ভাবনা ছিল না। সেই কারণে উত্তরের দিকে যেতে যেতে শেষে তিনি নীলসমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই নীলসমুদ্র তুর্কদের দেশ থেকে সাত হাজার লী (সওয়া দু হাজার মাইলেরও বেশি) দূরে। সে দেশে শান্তি ছিল না, তাই ৫৫৮ খৃষ্টাব্দে চীনের উত্তরে ছীবংশের রাজধানী য়েহ্-তে গিয়েছিলেন। সেখানে সম্রাট বেন্-শ্বেন্ তাঁকে অভ্যর্থনা করে থিয়েন-পিঙ্ বিহারে থাকার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য রাজকুলের সমুদয় সংস্কৃত হস্তলিপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অনুবাদের কাজে সাহায্যের জন্য সম্রাট চীনের কয়েকজন বিদ্বান্ বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তাঁর হাতে সমর্পণ

করেছিলেন। চীনে আসার কিছুদিন পরই সম্রাট তাঁকে বৌদ্ধ সংঘের উপনায়কের পদ প্রদান করেছিলেন। তারপর প্রধান নায়কের। তাঁর পদ থেকে যে আয় হ'ত তার বেশির ভাগই তিনি ভিক্ষু, দরিদ্র আর বন্দীদের আহারের এবং পশুদের ঘাসকুটোর জন্য খরচ করতেন। সর্বজনীন হিতের জন্য তিনি অনেক কূয়ো কাটিয়েছিলেন। সেইসব কূয়ো থেকে তিনি নিজে জল তুলে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। নারী আর পুরুষের জন্য তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যেত। চিন-জুনে পশ্চিমপর্বতের ওপর তিনি তিনটি বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। তুর্কদের সরাইতেও তিনি যেতেন। তাদের অনুরোধ করতেন: মাসে অন্তত ছ'টা দিন নিরামিষ আহার ক'রো, খাবার জন্য ছাগল মেরো না।

এমনি নানা পুণ্যকর্ম তিনি করেছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন স্বয়ং সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞী তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এই সম্মান খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে।

শেষে ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরের ছীবংশ উত্তরেরই চাউবংশের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল। ৫৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বু-তা চীনের বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ বিহার আর অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস কবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। নরেন্দ্রযশ তখন বাইরে গৃহস্থের পোশাক পরতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও ভেতরে তিনি ভিক্ষুর চীবরই পরতেন। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করে তিনি এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সুই রাজবংশ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই অত্যাচার চলেছিল। নতুন রাজবংশের প্রারম্ভে বেন্‌-তী তাকে বৌদ্ধ সূত্রাবলী অনুবাদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বেন্‌-তী তাঁকে বিদেশী ভিক্ষুদের স্বাগতিকের পদ গ্রহণ করতেও অনুরোধ করেছিলেন। নরেন্দ্রযশ অতি সুচারুভাবেই তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। তিনি সকলেরই ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

আশিটিরও বেশি আহ্নিক (প্রতি আহ্নিকে প্রায় সাত শ শ্লোক)-সংবলিত পনেরটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। পঞ্চাশটিরও বেশি দেশ পরিভ্রমণ করে এক লক্ষ পনের হাজার লী (প্রায় পঞ্চাশ

হাজার মাইল) পথ অতিক্রম করে তিনি চল্লিশটি বছর কাটিয়েছিলেন। শেষে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান হয়েছিল।

ডঃ পা চাউয়ের লেখা থেকে নরেন্দ্রযশের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও যদি আমরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে সেই মহান্ যাত্রীকে স্মরণ করি, তবেই আমি আমাব এই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

পরিশেষে একটি কথা: আমার সব ঐতিহাসিক উপন্যাসই মুখ্যত উপন্যাস—ইতিহাস কিংবা জীবনী নয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

এক

'পা-কু-লাই' বা বোলোর প্রদেশ থেকে উদ্যান প্রদেশে যেতে হলে লোকে পোলের বদলে লোহার শেকলে করে যায়। লোহার শেকল ধরে ধরে ঝুলে যাওয়া ছাডা পাহাডী খাদ পাব হবার আর কোনো উপায় নেই। নিচের দিকে তাকালে পাহাডের তলদেশ দেখা যায় না। হাত যদি কোনো রকমে একবার ফসকে যায় তাহলে নির্ঘাত কয়েক হাজার ফুট নিচে পডে যেতে হবে। তাই বাতাস যখন জোরে বয়, যাত্রীরা তখন কিছুতেই খাদ পার হবার চেষ্টা করে না।...

'উদ্যান প্রদেশের উত্তবে পামীর পর্বতমালা আব দক্ষিণে ভারতবর্ষ। দীর্ঘ বিস্তৃত এই প্রদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশে ফসল আর জনসংখ্যা, তুইয়েবই আধিক্য। চীনেব লিন-স্তী উপত্যকাব মতোই এ দেশটা উর্বর। আবহাওয়া তার চেয়ে অনেক ভালো।...

'উদ্যান প্রদেশের রাজা নিবামিষাহাবী। উপোসথের দিন সকাল-সন্ধ্যায় ভগবান বুদ্ধেব পূজা করেন। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, বীণা আর বাঁশি বাজে পূজার সময়। তুপুরে আহারাদির পর বাজা বাজকার্য দেখেন। তাঁর রাজ্যে নর-হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড হয় না। সেবকম কোনো অপরাধীকে অল্প কিছু আহার্য দিয়ে দূর পর্বতমালার কোনো এক নির্জন জায়গায় নির্বাসিত করা হয়।'...

'উদ্যান প্রদেশের লোকেরা নদীর জলে শস্যের ক্ষেত ভরিয়ে দেয়। তাতে মাটি উর্বর হয়, নতুন মাটিতে ক্ষেত ঢেকে যায়। মানুষের প্রয়োজনীয় সব বকম খাদ্যই এখানে সহজলভ্য। শাক-সবজি আর নানা রকমের ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সন্ধ্যাবেলায় সংঘারামের ঘণ্টাধ্বনি চারিদিক মুখরিত করে তোলে। শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই গাছে গাছে নানা রঙেব ফুল ফোটে। শ্রমণ আর গৃহবাসী সেই ফুলে ভগবান বুদ্ধের পূজা করেন।'

...মহাচীনের মহাযাত্রী সুঙ-য়ুআন সেই ৫১৮ খৃষ্টাব্দে এ কথা লিখেছিলেন, যখন আমি প্রথম এই পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলমে। এর কুড়ি বছর আগে আর-একজন চীনা যাত্রী ফা-শীন (ফা-হিয়ান) আমার মাতৃভূমি এই উদ্যান প্রদেশে এসেছিলেন। চীনদেশে আমি দেখেছি, সেখানকার লোকেরা

ভ্রমণকাহিনী পড়তে খুব ভালোবাসে। আমাদের এখানেও গল্প শোনার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সে সত্যিকারের গল্প নয়, কাল্পনিক গল্প। আমাদের দেশেও বহু ভূ-পর্যটন জন্মেছেন। এই ৫৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক চীনদেশেই বিভিন্ন পথে বহু কষ্ট সহ্য করে কয়েক হাজার ভিক্ষু এবং বিদ্বান্ গেছেন। প্রতি বছর আমাদের মহাসংঘ চারিদিকে ধর্মদূত প্রেরণ করে। পথে কীভাবে কোন্ কোন্ দেশ পার হতে হয় তা জানতে হলে যাঁরা সেখানে গেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধর্মদূতরা যদি তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে রেখে যেতেন তাহলে কত সুবিধাই না হ'ত। জীবনের অনেকগুলি বছর ধর্মপ্রচার করে বার্ধক্যে তাঁরা ফিরে আসতেন নিজের নিজের সংঘারামে এবং বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু বেশির ভাগ ধর্মদূতই ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে সেই দূরদেশে দেহরক্ষা করতেন। তাঁদের কারও কারও অস্থি সংগ্রহ করে সংঘ তার আপন প্রাঙ্গণে স্তূপ নির্মাণ করত। আর তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণের দল তাঁদের পথ অনুসরণ করত। সাঁচির চৈত্যগিরি আর অন্যান্য বহু পুণ্যস্থানে ঐসব মহাপুরুষের অস্থি-স্তূপ আমি দেখেছি। আমাদের সংঘে প্রথম থেকেই দেশ-দর্শন আর পর্যটনে উৎসাহ দেওয়া হয়। সেই উৎসাহের দরুণই আমি সারাজীবন ধরে এত দেশ পর্যটন করতে পেরেছি।

আমি যদি আমার দেশ-ভাইদের মতো উদাসীন হতাম তাহলে হয়তো আমার এ ভ্রমণবৃত্তান্ত আমি লিপিবদ্ধ করতাম না। কিন্তু চীনা বন্ধুদের দেখে আমারও ইচ্ছা হয়েছে, উত্তরকালের পর্যটকদের জন্য আমিও আমার ভ্রমণকাহিনী লিখে রেখে যাই। কিন্তু আমার দেশ-ভাইরা আমার এ কাহিনী থেকে সত্যিই উপকৃত হবেন কিনা, হলে কতখানি হবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

সেই উদ্যান প্রদেশে আমার জন্ম, যার কথা সুঙ্-য়ুআন আগেই লিখেছেন সুঙ্-য়ুআনের এই লেখা আমি পড়েছি মহাচীনে এসে। নিজের মাতৃভূমি সবারই প্রিয়। তাই আমি কোনো দেশকে কুৎসিত কিংবা অসুন্দর বলি না কিন্তু উদ্যান সত্যিই স্বর্গোদ্যান। উত্তরে কর্পূরধবল তুষারে আচ্ছন্ন উত্তুঙ্গ শৈলশিখর। শৈশবে প্রথম যখন আমি এই স্তূপাকার গিরিমালা দেখেছিলাম তখন ভারি ভালো লেগেছিল। আর আজ এই সত্তর বছর বয়সে স্মৃতিপটে অঙ্কিত সেইসব পুরনো দৃশ্য যখন দেখি তখন ঠিক সেদিনেরই মতো ভালো

লাগে। জীবনের এই সত্তর বছরে আমি বহু পর্বত দেখেছি, বহু দেশ ঘুরেছি। কী বিচিত্র এই পৃথিবী! আমি যখন সিংহলদ্বীপে ছিলাম সেখানে দেখেছি বারো মাসে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর বর্ষা। সে দেশে শীতের কোনো সন্ধানই পাবেন না, যদি-না আপনি সেখানকার শ্রীপাদ পর্বতে ওঠেন। শ্রীপাদ পর্বতে উঠেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, পাহাড়ে যত উঁচুতে ওঠা যায়, শীতের আধিক্য তত বেশি হয়। আমাদের উড্ডানে যে এত শীত, সে-ও হয়তো এই কারণে। গ্রীষ্মকালেও আমরা এখানে পশম-বস্ত্র পরি। সিংহলদ্বীপে তা কল্পনাও করা যায় না। সিংহলে ভিক্ষুরা ডান কাঁধ উন্মুক্ত রেখে চীবর পরেন, মাথাও উন্মুক্ত রাখেন। তাঁদের যদি উড্ডান প্রদেশের মতো শীতের দেশে থাকতে হ'ত, তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, ডান কাঁধ আর মাথা খোলা রাখার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুকে আহ্বান করা।

দেব-মানবের শাস্তা ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, আত্মহত্যা গর্হিত কর্ম। জীবন-রক্ষার জন্য তিনি নানারকম ভেষজের বিধান দিয়েছেন, আর তাই তাঁকে আমরা ভিষক্‌গুরু বলে পূজা করি। ভিষক্‌গুরুর দেশনা (নির্দেশ) অনুসারে আমাদের বহু ভিক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং আতুর রোগীদের রোগমুক্ত করেন। বর্বর জাতিদের মধ্যেও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে এত সম্মান তার প্রধান কারণ, তাঁরা ভিষক্‌গুরুর শিষ্য। আমি আমার অন্যসব বন্ধুর মতো চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করি নি বটে, কিন্তু যে সামান্য জ্ঞান আহরণ করেছি তাতে আমার যাত্রাপথে অনেক উপকার হয়েছে। পথে যেসব নরনারীর সান্নিধ্যে এসেছি তাদেরও সাহায্য হয়েছে।

দুর্গম পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে স্বর্গতুল্য এই উড্ডান প্রদেশ। এখান থেকে উত্তরাখণ্ডে যাবার পথে আমি এমন দেশেও গিয়েছি, যেখানে দারুণ গ্রীষ্মে শুধু পর্বতশীর্ষে নয়, শীতসমুদ্র (বৈকাল হ্রদ)-এর তীরেও প্রচণ্ড শীত—যেমন আমাদের দেশের নিচের দিককার গ্রামে শীতকালে দেখা যায়। দেশে থাকতে সেখানকার শীতকালের শীত আমি কল্পনাও করতে পারি নি। সত্যি, এই পৃথিবীতে কত বিচিত্র দেশই না আছে! পর্যটকরা কত নয়নাভিরাম দৃশ্যই না দেখেন।

উড্ডান প্রদেশের অনেক কথা আজও আমার মনে পড়ে। কত আনন্দই না হ'ত, যদি আমি আমার এই অস্থিগুলি আমার সেই মাতৃভূমিকে দিতে পারতাম, যেখানে এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তথাগতর কথায়, 'তৎ

কুতোত্র লভ্যঃ'। এমন ইচ্ছা ভিক্ষুর পক্ষে শোভা পায় না। তবু জননী জন্মভূমির মধুর স্মৃতি আমি কেমন করে ভুলব ?

উদ্যান প্রদেশকে সুদূর অতীতে বলা হ'ত সুবাস্তু। আজও সেখানে 'সুবাস্তু' বা 'স্বাত' নামে একটি নদী আছে। সেই নদীর জল দেখতে দুধের মতো। আমি যখন প্রথম দক্ষিণের গান্ধারদেশে যাই তখনই জানতে পারি, সুন্দর সুন্দর বাস্তু (বাড়ি)-র জন্যই তাকে বলা হ'ত সুবাস্তু। আর আজ উদ্যান নামেই তার প্রসিদ্ধি। কারণ, এখন তার চারিদিকে সুমিষ্ট সব ফলের উদ্যান। কপিশা (কাবুল) প্রদেশের দ্রাক্ষা সারা জম্বুদ্বীপে বিখ্যাত। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, আমাদের উদ্যানের দ্রাক্ষার চেয়ে সেখানকার দ্রাক্ষা কিসে ভালো। দ্রাক্ষার জন্য উদ্যান প্রদেশের যে খ্যাতি হতে পাবে নি তার কারণ হয়তো দুর্গম পর্বতমালার মধ্য থেকে শুকনো দ্রাক্ষা (মনাক্কা আর কিসমিস) বাইরে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। এখানকার উদুম্বর (ডুমুর) আর অন্যসব ফল কত মধুর।

মধ্যমণ্ডলের ভিক্ষুরা আমাদের দেশের শীতকে বলতেন তুষার। এই রকম শীতের দেশে আসার সাহস তাদের ছিল না। কিন্তু আমি যখন আমাদের ক্ষীরবাহিনী নদী আর অমৃতমধুর ফলের গল্প করতাম তখন তাদের মন উৎসাহে ভরে উঠত। অন্য দেশের লোকেরা যেমন কানে শুনে উদ্যান প্রদেশের শীত অনুভব করতে পারে না, ঠিক তেমনি উদ্যানের কিংবা এই ছাড়-আর মহানগরীর লোকেরা বুঝতেই পারে না, গ্রীষ্মকালে বারাণসী আর জেতবনে কী রকম উনুনের আগুনের মতো গরম পড়ে। চক্রবর্তী রাজা যেমন তিন ঋতুতে তিন রকম প্রাসাদে বাস করেন, আমরা উদ্যানবাসীরাও তেমনি তিন ঋতুতে তিন রকম গ্রামে গিয়ে থাকতাম। শীতকালে আমরা যেতাম আমাদের বড় বড় নদীর নিচের দিকে। আবার কখনও কখনও চিরহরিৎ বনেও যেতাম, যেখানে কখনও বরফ পড়ে না। বসন্তকালে যখন বরফ গলে যেত, ক্ষেত-খামার পরিষ্কার হয়ে যেত এবং সমস্ত গাছে নতুন পাতা দেখা দিত তখন আবার আমরা পাহাড়ের ওপর আমাদের গ্রামে ফিরে আসতাম। আমার সবচেয়ে ভালো লাগত উত্তুঙ্গ পর্বতপৃষ্ঠে দীর্ঘবিস্তৃত উদ্যানের অধিত্যকাগুলি। এখানে আরও দেরি করে, অর্থাৎ বর্ষার প্রথম দিকে বরফ গলত। এই অধিত্যকা শুরু হবার অনেক আগেই বড় বড় গাছের বন শেষ হয়ে গেছে—তারপর শুধু ঘাস আর ঘাস। এত লম্বা

লম্বা ঘাস যে, তার মধ্যে ছাগল আর ভেড়াই শুধু নয়, গোরুও দিব্যি লুকিয়ে থাকতে পাবে। ছাগল-ভেড়ার পক্ষে ঘাস খুব পুষ্টিকর। এই ঘাস খেয়ে ভেড়াগুলো এত মোটা হ'ত যে, চামড়ার মধ্যে নাকি আঁটত না, মধ্যমগুলের পাকা কাঁকুড়ের মতো ফেটে যেত। এ অবশ্য আমার শোনা কথা, নিজে কখনও দেখি নি।

উদ্যান প্রদেশের শোভা বলতে উর্বর শস্যভূমি, জলস্ফীত নদী, রমণীয় পর্বতরাজি আর মনোমুগ্ধকর বিশাল দেবদারু। তথাগত যে বোধিবৃক্ষের তলায় পরমজ্ঞান লাভ করেছিলেন তার সামনে সর্বদাই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। অনেকদিন ধরে আমরা এই বোধিবৃক্ষের পূজা করে আসছি। শীতপ্রধান দেশে অনেক যত্ন করে বোধিবৃক্ষ লাগানো হয়েছে, কিন্তু বাঁচে নি। বোধিবৃক্ষের পাতার মতো দেখতে যে গাছের পাতা তাকেই এখন লোকে বোধিবৃক্ষ বলে। আসল বোধিবৃক্ষ জম্বুদ্বীপ আর সিংহলদ্বীপের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। যাই হোক, বোধি-বৃক্ষের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। এর কোমল চিকন পাতা ভারি সুন্দর দেখায়, বিশেষ করে যখন মৃদুমন্দ বাতাসে দুলতে থাকে। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের উদ্যানের দেবদারু সত্যিই দেবের দারু। পাহাড়ের গা-ঢাকা আকাশ-ছোঁয়া ঐ বিশাল গাছগুলো ভারি সুন্দর লাগে। গাছের নিচে তুলাজিনের মতো শুকনো পাতা পড়ে থাকে আর তা থেকে মৃদু-মধুর গন্ধ বার হয়। আমাদের বাড়িতে দেবদারু কাঠই বেশি ব্যবহার করা হ'ত। ঘরের দেওয়াল তৈরির কাজে পাথরের চাইতে দেবদারু কাঠেরই ব্যবহার ছিল বেশি। ছেলেবেলায় আমি শুকনো দেবদারু কাঠের সরস গন্ধে নিশ্বাস নিতাম। আজও সেই সরস গন্ধে নিশ্বাস নেব বলে এই চাঙ্-আনে দেবদারু কাঠের ঘর তৈরি করিয়েছি। কিন্তু কই, সে গন্ধ তো এতে পাই না। আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারিত করছে না তো? শৈশবের সরল দৃষ্টি সব কিছুই সুন্দর দেখে, এ আমার সেই সরল চোখের ভুল নয় তো?

মাতৃভূমির প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। আমি অতিশয়োক্তি করতে চাই না। কিন্তু আমার মাতৃভূমির গুণ যদি আমাকে মুখর করে তোলে তাহলে আমি কী করব! আমি জানি, প্রত্যেক ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির আলাদা আলাদা কষ্টিপাথর থাকে, আলাদা আলাদা মানদণ্ড। আমাদের এখানে ক্রোশ আর যোজনই হ'ল দূরত্বের মাপ, কিন্তু মহাচীনে

'লী'। এক ক্রোশে চার লী। মহাচীনের লোকেরা লী বললে যত সহজে বুঝতে পারে, ক্রোশ কিংবা যোজন বললে তত সহজে পারে না। আমাদের এখানে ফরসা রঙ, সোনালী চুল আর নীল চোখ সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু মহাচীনের লোকেরা তাকে বাঁদরের রূপের সঙ্গে তুলনা করে। উঁচু আর লম্বা নাককে আমরা সুন্দর বলি, মহাচীনের লোকেরা তাকে বলে ভ্রমরী। প্রত্যেক জাতির খাদ্যও আলাদা। মগধের গন্ধশালী চাল খুব সুস্বাদু, আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার তো ছেলেবেলা থেকেই গমের রুটি ভালো লাগে। নুন দিয়ে সেদ্ধ করা মাংস আমাদের কাছে যত রুচিকরই হোক, মগধের লোকেরা তার চেয়ে বেশি পছন্দ করে তেলে ভাজা মাছ। সঙ্গীতের ব্যাপারেও ভিন্ন রুচি। মহাচীনের লোকেরা বীণাযন্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিন্তু বীণার স্বর আমাদের কাছে অতি প্রিয়।

উদ্যানবাসীরা রূপে-রঙে ভারি সুন্দর। যদিও চীনদেশীয় যাত্রীরা আমাদের আর মধ্যমণ্ডলের প্রচলিত বেশভূষায় কোনো পার্থক্য দেখেন না, তবু আমি জানি, দুই দেশের বেশভূষায় অনেক পার্থক্য। মধ্যমণ্ডলে যাকে ফরসা বলে, আমাদের এখানে তাকে কালো বলতে কোনো সংকোচ হয় না। মধ্যমণ্ডলে গিয়ে আমি এক হাসির কথা শুনেছিলাম: গর্ভিণী নারী শাক খেলে তার শিশুর রঙ হয় কালো কিংবা শামলা, আর ক্ষীর খেলে ফরসা। আমাদের উদ্যানে তো একজনও কালো কিংবা শামলা নেই, অথচ শাকের মরশুমে গর্ভিণী নারীরা খুব শাক খায়। আমার মনে হয়, রূপ আর রঙ মা-বাবার কাছ থেকেই আসে।

আমার মা-বাবা উদ্যানের এমন এক গ্রামে বাস করতেন, যেখানে শীত একটু বেশিই পড়ে। কুনার আর সুবাস্তু নদীর উৎস আমাদের গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়। হিমাচ্ছন্ন এক গিরিশিখরের ডাইনে-বাঁয়ে এই দুই নদী প্রবাহিত হয়েছে। গ্রামের এক পাশ দিয়ে গেছে সুবাস্তু নদীর জলধারা। উচ্ছল জলরাশি রাত্রিদিন গম্ভীর স্বরে গান গায়। পাথরখণ্ডের ওপর আছড়ে পড়া জল দুধের মতো সাদা দেখায়। ছেলেবেলায় মনে হ'ত, সত্যিই বুঝি দুধ। কিন্তু হাতে তোলার পর দেখা যেত জল। নিচের দিকে, যেখানে আমরা গ্রীষ্মকালে স্নান করতে যেতাম সেখানে জলের একটা কুণ্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার রঙ ছিল হাল্কা নীল কিংবা গাঢ় সবুজ। গ্রামের ওপরের দিককার পাহাড় ছিল দেবদারু গাছে ঢাকা। শীতকালে যখন গ্রামের অন্য সবার সঙ্গে আমাদের

পরিবারের লোকেরা ঘরবাড়ি বন্ধ করে পশুর দল নিয়ে নিচের দিকে নেমে আসত তখন সেই ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য আমার বড় দুঃখ হ'ত। কখনও কখনও আমি শীতকালটা মা'র সঙ্গে মামার বাড়িতেই কাটাতাম। সেখানে তিন হাত পুরু বরফ পড়ত। আমরা তখন কত রকম বরফের খেলাই না খেলতাম। মাকে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, শীতকালে আমরা আমাদের গ্রামে থাকি না কেন? মা বলতেন, আমাদের ওখানে আরও বেশি বরফ পড়ে। কখনও কখনও বরফের চাঙড়ে চাপা পড়ার ভয় থাকে। সেই বরফের চাঙড়ের ধাক্কায় বাড়িঘর সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাছাড়া শীতকালে পশুদের খাবারের জন্য এক টুকরো খড়কুটো কিংবা ঘাসও পাওয়া যায় না। জমা করে রাখা ঘাস-ভূষিতে বড় জোর দু মাস চলে। কিন্তু তারপর?

আমার বাবারা ছিলেন চার ভাই। ঠাকুরদাকে আমি দেখি নি, কিন্তু ঠাকুরমার কথা আজও আমার মনে আছে। তাঁর মাথার চুল ছিল সাদা—যেন হিমালয়ের হিম। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর। ঐ বয়সেও তাঁর শরীরে কোথাও বলিরেখা পড়েনি। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। ছেলেবেলায় আমাকে নানারকম গল্প শোনাতেন। আমার দুজন কাকা ভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলেন। আর-এক কাকার কেবল দুই মেয়ে ছিল। তাই প্রথম ছেলে হিসেবে বাড়ির সকলেরই ভালোবাসা আমার ওপর এসে পড়েছিল। পরে অবশ্য আমার দুটি ভাই হয়েছিল। এ তাঁরই কৃপা, যিনি আমাকে ভিক্ষু হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তথাগত নিয়ম করেছিলেন, মা-বাবার অনুমতি ছাড়া সংঘ কাউকে ভিক্ষু করতে পারবে না। আমি ছিলাম বাড়ির এক ছেলে, মা-বাবা নিশ্চয়ই আমাকে অনুমতি দিতেন না। ভাই হওয়াতে আমার ভিক্ষু হবার পথের বাধা সরে গেল। আমার ছোট ভাইটি হবার সময় আমার মা-মারা যান। তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। মা'র জন্য আমার মন খুব খারাপ লাগত। ঠাকুরমা সব সময় চেষ্টা করতেন, আমাকে ভুলিয়ে রাখতে। মা'র মৃত্যুর পর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। আমার সৎমার মধ্যে কিন্তু এমন কিছু ছিল না, যা সব সময় সৎমার কথা মনে করিয়ে দেয়। এর কারণ, তিনি আমার মা'র খুড়তুতো বোন ছিলেন।

আমাদের উদ্যান ছিল পুরোপুরি তথাগতর অনুযায়ী। পূর্বে প্রতিবেশী কাশ্মীর, দক্ষিণে গান্ধার, পশ্চিমে কপিশা আর কম্বোজ দেশেও তথাগতর অনেক অনুগামী ছিলেন। তীর্থিকদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। আমার মনে হ'ত

তথাগতর স্বরূপ যেমন উজ্জ্বল, তাঁর দেশনা যেমন স্বচ্ছ আর সুন্দর, তেমনি স্বচ্ছ আর সুন্দর আমাদের উদ্যান প্রদেশ ; আর তাই তাঁর প্রতি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার এত ভালোবাসা ও ভক্তি।

উদ্যানে কিছু ব্রাহ্মণও ছিলেন। তাঁরাও ছিলেন তথাগতর উপাসক। তফাৎ ছিল এই যে, আমরা তথাগতর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতাম। আমাদের এখানে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বেশি। আমরা যাদের শূদ্র বলতাম তাদেব দেহের রঙ ছিল অন্য বকম। তাবা কেবল গ্রীষ্মকালেই আমাদেব গ্রামের ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়াতে আসত। তারা ছিল শিল্পকার। আমাদেব জন্য লোহাব ফলা. তলোয়ার, কোদাল, কুড়ুল এইসব তৈরি করে আনত। তাদেব মধ্যে আবাব কেউ কেউ সোনা-রূপোর গহনা আর ধাতুর বাসনকোসনও তৈরি কবত। আমাদেব বেশিব ভাগ বাসনই ছিল কাঠেব। এই শূদ্রদের নিয়ে আমাদেব উদ্যানে তিনটি জাতি ছিল। বৈশ্যদের কথা কেবল বইতেই পাওয়া যেত। ব্রাহ্মণ আব ক্ষত্রিয় এই দুজাতি মিলে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েব রূপ-রঙ এমন ছিল যে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় কবা যেত না। আমাদের পরিবারেব লোকেবা নিজেদেব ক্ষত্রিয় বলে পবিচয় দিত। কোন কোন ক্ষত্রিয় নিজেদের শাক্যবংশীয় বলে কুলীন প্রমাণ কবাব চেষ্টাও করত। কিন্তু আসলে তাবা শাক্যমুনির বংশধরই ছিল না। তারা ছিল তুষার দেশ থেকে আসা শকদেব সন্তান। তাবা অনেকদিন জম্বুদ্বীপ, কম্বোজ এবং অন্যান্য দেশে বাজত্ব কবেছিল। ধর্মরাজ কণিষ্ক এই বংশেই জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। কণিষ্কের তৈবি বিবাট বিবাট সংঘারাম আর চৈত্য আমি বহুবাব দেখেছি। এখন শকদেব প্রাধান্য শেষ হয়ে গেছে। তাদের স্থান অধিকাব কবেছে যেথা (যস্যা)-বা।

যেথাদের অনেক নিষ্ঠুবতার কথা আমি ঠাকুরমার মুখে শুনেছি। এখন আর তারা ততটা নিষ্ঠুর নয়। দেখতে-শুনতে আমাদেব উদ্যানবাসীদেরই মতো। কেউ কেউ আবার আমাদেব চেয়েও ফরসা। তাবা যুদ্ধে পারদর্শী। আমাদের উদ্যানবাসীরাও অবশ্য এদিক দিয়ে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের উদ্যান কখনও শকদেব অধীন, কখনও যেথাদের করদ ছিল। আমার মনে হয়, তার কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা। সংখ্যাবলে আমরা কম ছিলাম। আমার ঠাকুরমা যেথারাজ তোরমাণের খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন, তোরমাণ ছিলেন ধর্মরাজ কণিষ্কের অবতার। তোরমাণের পুত্র

মিহিরকুলের (৫০৮-৫৭৪ খৃঃ) কিন্তু তিনি খুব নিন্দা করতেন। মিহিরকুলের শাসনকালেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে জন্মভূমির কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছি। মিহিরকুল হয়তো যৌবনে খুব অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে আমি যখন তাঁকে দেখেছি তখন তাঁর কোনো নিষ্ঠুরতা আমাব চোখে পড়েনি। আমাদের বহু লোক তাঁর সৈন্যদলে ছিল। বিদেশে তাদেরও লোকে যেথা কিংবা হুণ বলত। মহাচীনে আসার আগে পর্যন্ত আমিও মনে কবতাম, যেথারাই হূণ। কিন্তু এখন জেনেছি, হুণেরা তুরুস্কদের পূর্বপুরুষ। দেখতে-শুনতে তাবা চীনাদেরই মতো। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় হুণেরা একসময় চীনাদেব ঘোবতর শত্রু ছিল। আর আপনারা সবাই জানেন, এই হুণদেব আক্রমণ প্রতিবোধ কবাব জন্যই চীনে হাজাব হাজাব ক্রোশ লম্বা এক বিরাট প্রাচীর তৈবি করা হয়েছিল।

আমাদেব দেশেব অনেকে জানেই না, মিহিবকুল কে, তোবমাণ কে, কিংবা পৃথিবীতে অন্য কোন্ কোন্ রাজা আছে। উদ্যানের বাজাই আমাদের কাছে সবকিছু। আমবা উদ্যানেব রাজধানীতে তথাগতব জয়ন্তী-উৎসবে গিয়ে দেখতাম, রাজা-বানী ভক্তিভবে ভগবানেব পূজায় ভিক্ষুসংঘে আহার-বস্ত্র দিচ্ছেন। বাজাব পাশের আসনে এক সৈনিক-সামন্তেব কথা শুনে সেই প্রথম জানলাম যে, আমাদের রাজাব ওপবেও বাজা আছেন। তাব নাম মিহিবকুল। তিনি কাশ্মীরে তার নিজেব রাজধানীতে থাকেন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রাই আমাদের এখানে চলে। আব তাঁর সামন্ত-প্রতিনিধিব আদেশ আমাদেব রাজাকেও শিবোধার্য করতে হয়!

শিশুকাল সবচেয়ে মধুর আব সুন্দব। কিন্তু সেই শৈশবের স্মৃতি আজ আর বেশি মনে পড়ে না। গভীবভাবে ভাবলেও চাব বছব বয়সেব আগেকাব কথা মনে করতে পারি না। তখন আমার পরেব বোনটির জন্ম হয়েছে। আমার তখন ভীষণ হিংসা হয়েছিল, কারণ মা'র কোলেব ওপব যে একমাত্র আমারই অধিকার। কিন্তু মা যখন বলেছিলেন, আমার খেলার জন্যই সে এসেছে তখন আমার তাকে খুব ভালো লেগেছিল—ছোট্ট গোলাপী রঙের একটা পুতুল যেন। কিন্তু বেচারী দু বছর যেতে না যেতেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমার তখন ভারি দুঃখ হয়েছিল।

শৈশবের কত স্মৃতিই না আজ মনে পড়ছে! অন্ধকারে আমি দারুণ ভয় পেতাম। অপ্সরা আর ভূত আর ডাইনীদের গল্প শুনতাম। অন্ধকার হলেই

ঘরের কোণে আর গাছের তলায় তারা আমাকে ভয় দেখাত। আমি শুনেছিলাম, ভূত আর ডাইনীরা খারাপ, কিন্তু অপ্সরা আর দেবতারা ভালো। ভূত আর ডাইনীদের দেখার মতো সাহস আমার ছিল না, কিন্তু অপ্সরাদের দেখার ভারি ইচ্ছা ছিল। অপ্সরাদের যে রূপ-রঙের কথা আমি শুনেছিলাম তা আমার মা-মাসীর সঙ্গে খুব মিলত। আর তাই তাদের আমি ভয় পেতাম না। আমি শুনেছিলাম, পূর্ণিমার রাত্রে আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতো সাদা সাদা বরফ পড়ে পৃথিবী ছেয়ে যায় তখন অপ্সরারা দেবলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে, বরফের ওপর নাচে, গায়। জানি না, কত বছর আমি অপ্সরাদের নাচ দেখার চেষ্টা করেছিলাম। মা-বাবার ভয় না থাকলে আমি তখনই অপ্সরাদের দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম, দেবদারু বনে গিয়ে তাদের খুঁজতাম। কিন্তু মা-বাবার ভয়ে রাত্রে আমি ঘর ছেড়ে বেরুতে পারতাম না। সব থেকে যখন আমি একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম তখন আমার মনে হ'ত দূরের ঐ দেবদারু বনে সাদা বরফের ওপর পরীর মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেতাম না। সকালে ঘুম থেকে উঠে বরফ দেখতে বহুদূর পর্যন্ত ছুটে যেতাম। রাত্রে অপ্সরার যদি এসে থাকে তাহলে বরফের ওপর তাদের পায়ের চিহ্ন নিশ্চয়ই থাকবে! কিন্তু তাদের পায়ের চিহ্ন কোনোদিনও আমি দেখতে পাই নি। মাঝে মাঝে ছোটখাটো পায়ের দাগ দেখেছি। বড়রা বলেছেন, ও হ'ল ভালুক কিংবা ভেড়া অথবা অন্য কোনো জন্তুর পায়ের দাগ।

ন বছর বয়স পর্যন্ত আমার পৃথিবী ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নিচের দিকে যেতে হলে রাজধানী উদ্যানপুরী হয়ে যেতে হ'ত। তখন আমার কাছে উদ্যানপুরীর চেয়ে বড় কোনো শহর ছিল না। তখনও আমি পুরুষপুর (পেশোয়ার) দেখি নি, তক্ষশিলা দেখি নি—কান্যকুব্জও না, পাটলিপুত্রও না। উদ্যানপুরীর দোকানে দেখতাম, নানারকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কেউ আমাকে খেলনা দিত, আবার কেউ-বা মিষ্টি। আমাদের গ্রামে গুড় তৈরি হ'ত না, চিনিও না। মধুই ছিল আমাদের মিষ্টি। আমরা জানতাম, মৌমাছিরাই আমাদের জন্য মিষ্টি তৈরি করে। দোকানের ঐ মিষ্টি খাওয়ার পর যখন আমি শুনলাম, সে মিষ্টি মৌমাছিদের তৈরি নয়, একরকম গাছ থেকে বার করা, তখন আমার ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। তার চেয়েও আশ্চর্য লেগেছিল আর অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল, যখন একজন ভিক্ষুর চীবর দেখিয়ে

একটি লোক আমাকে বলেছিল যে, তার সুতো ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয় নি, হয়েছে গাছ থেকে। তখন আমাব মনে হয়েছিল, মিষ্টি আর কাপড় যেমন করে গাছে হয় তেমনি করে যদি মাংসও গাছে হ'ত তাহলে কত ভালোই না হ'ত! আমবা রুটি খেতাম। দ্রাক্ষা আর অন্য সব সুস্বাদু ফল শুকিয়ে সারা বছরের জন্য রেখে দেওয়া হ'ত। কিন্তু আমাদের এখানকার লোকে মাংস যত পছন্দ করে, অন্য কিছু তত নয়।:

আমি দেবতা আর অপ্সরাদের দেখতে চেয়েছিলাম। আবার যখন শুনেছিলাম, সামনের ঐ বরফে ঢাকা শৈলশিখরে অনেক অর্হৎ আর বোধিসত্ত্বের বাস তখন সেখানেও আমার যাবাব ইচ্ছা হয়েছিল। এই ইচ্ছাপূরণের জন্য আমি কত জায়গায়ই না গিয়েছি। কিন্তু সব জায়গাতেই নিরাশ হয়েছি। তবু আমি বলব না যে, তাঁরা নেই। হয়তো আছেন। কিন্তু যখন থেকে আমি বোধিসত্ত্বের মহাযান দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেছি তখন থেকে তাঁদের দেখার ইচ্ছাও আমার চলে গেছে। আমি এখন চাই, গরীব-দুঃখীর সেবা করতে। অবদান আব জাতকে তথাগত নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন যে, পরোপকারই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ হওয়া উচিত। আমার দেহচর্ম দিয়ে যদি অন্যের চরণ-রক্ষার জন্য জুতো তৈরি হয় তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? আমি তো বলি, মৃত্যুর পর আমার দেহ তোমবা দাহ ক'রো না, বরং দূরে কোথাও ফেলে দিও—যাতে তা দিয়ে পশুপাখির ক্ষুধানিবৃত্তি হতে পারে। শুধু এই জন্মেই নয়, হাজার হাজার জন্মেও আমি এই কথাই বলব যে, আমি যেন সবসময় সকল প্রাণীর সেবা করতে পারি, সবাই যাতে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পায় তার চেষ্টা করতে পারি।

দুই

আগেই বলেছি, উড্ডান এক বৌদ্ধ দেশ। এখানকার প্রথা অনুসারে সাত-আট বছর বয়স হলেই ছেলেদের শ্রামণের (শালভিক্ষু) আর মেয়েদের শ্রামণেরী হতে হয়। প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজনকে ভিক্ষুসংঘে দেওয়া হয়। সংঘারাম আমাদের কাছে ঘরবাড়ি কিংবা গ্রামেরই মতো। বুদ্ধমন্দির সব গ্রামেই আছে। কিন্তু সংঘারাম আছে সাধারণত চার-পাঁচ গ্রাম পর পর। সব পরিবার থেকেই যখন অন্তত একজন করে ভিক্ষু হতে হয় তখন সংঘারামে কাকা কিংবা মামা থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমার কাকাও ভিক্ষু ছিলেন। মাঝে মাঝে আহার কিংবা ভিক্ষার জন্য আমাদের বাড়ি আসতেন। কিন্তু আমাকে কখনও কোলে নিতেন না। সংঘের নিয়ম ছিল না। মা-বাবা তাঁকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করতেন, যদিও তিনি বয়সে তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন।

আমাদের গ্রামের অন্যসব পরিবারের সাত-আট বছরের ছেলেরা, যারা আমার সঙ্গে খেলা করত, তারা মাথা মুড়িয়ে তাম্রবর্ণ চীবর পরে শ্রামণের হয়েছে, ঘর ছেড়ে সংঘারামে গিয়ে বাস করছে। তা দেখে আমার শিশুমনেও বড় ইচ্ছা হ'ত, চলে যাই সংঘারামে। কিন্তু তখন আমাদের পরিবারে আমিই একমাত্র ছেলে। যদিও আমাদের এখানে একমাত্র সন্তানকে সংঘে দান করা মহৎ পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়, তবু আমার বাবা আমাকে ছাড়তে চাইলেন না। আমার যখন একটা ভাই হ'ল তখন একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। কিন্তু যখনই কাকাকে বলতাম, আমি শ্রামণের হয়ে সংঘারামে গিয়ে থাকব, কাকা বলতেন, একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব। কিন্তু সেই অপেক্ষার শেষ আর শিগ্‌গির হ'ল না।

তুর্কীদের মতো আমরা যাযাবর কিংবা পর্যটক ছিলাম না। তাদের গ্রামের মতো আমাদের গ্রামে তাঁবুর সমারোহও ছিল না। আমাদের গ্রামে ঘরবাড়ির দেওয়াল তৈরিতেও খুব কমই পাথর ব্যবহার করা হ'ত। গোটা বাড়িটাই তৈরি হ'ত সুগন্ধ দেবদারু কাঠ দিয়ে। ছাদও তৈরি হ'ত দেবদারু কাঠ দিয়ে, আর তার নিচে ভূর্জপত্রের ছালের মোটা স্তর বিছানো থাকত, যাতে জল ঢুকতে না পারে। আমাদের এখানে কাঠই সবচেয়ে সুলভ। আমাদের ঘরবাড়ি

কমপক্ষে দোতলা হ'ত। গোরু-বলদ আর ভেড়া-ছাগল রাখার জন্য বাড়ির বাইরে ছোট্ট একটা ঘেরা থাকত। তাদের গোবর আমরা সার হিসাবে ক্ষেতে দিতাম। অনেকদিন পর আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ঐ গোবর জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

সবারই যদি বসবাস করার জন্য তিন-চারটে করে গ্রাম থাকে তাহলে জীবন তো কিছুটা যাযাবরের মতো হবেই। যে গ্রামে আমরা সবচেয়ে বেশি থাকতাম সেই গ্রামের ঘরবাড়ি ছিল সবচেয়ে ভালো। ফসলের জমিও ছিল ভালো। তিনটি গ্রামেই কমবেশি চাষ-আবাদ হ'ত। ফসলের মধ্যে গম, যব আর কাপড়। চাল খেতাম আমরা শুধু পালেসে। সেই চাল আসত গান্ধার থেকে। আমি যখন প্রথম গন্ধশালী চালের নাম শুনেছিলাম তখন ভেবেছিলাম, গান্ধারের শালী থেকে 'গন্ধশালী' নাম। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, তা নয়।

আমাদের প্রদেশের চতুর্থ গ্রামটি ছিল কেবল তাঁবুতে ভরা। সেখানকার জীবনধারাও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা আর বিচিত্র। বর্ষার আরম্ভে আমরা এই গ্রামে এসে পৌঁছুতাম। আমাদের দ্বিতীয় আর তৃতীয় গ্রামেও বরফ পড়ত। প্রথম গ্রামটিতে তিন-চার হাত পুরু বরফ পড়ত, তৃতীয় গ্রামটিতে পড়ত দশ হাতেরও বেশি। আর তাঁবু-ভরা চতুর্থ গ্রামে বরফ পড়ার কোনো হিসাবনিকাশ ছিল না। গ্রীষ্মের শেষে আমরা যখন সেখানে যেতাম তখনও অনেক জায়গায় বরফ দেখা যেত। তিনটি গ্রামেরই আশপাশের সমস্ত পাহাড় ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কোথাও কোথাও অবশ্য জমি সমতল করে নিয়ে চাষ-আবাদ করা হ'ত। কিন্তু চতুর্থ গ্রামে, যেখানে তাঁবুর সমারোহ হ'ত, সেখানে চার হাত লম্বা ঝোপঝাড়ও দেখতে পাওয়া যেত না। শীতের সময় আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে বরফ পড়ত ক্বচিৎ কখনও। সেখানকার গাছপালা ঘাসপাতা সবই চিরসবুজ। নিচের সেই মুখ্য গ্রামে দেবদারু, বঙ্গ (বান) প্রভৃতি গাছই বেশি। এসব গাছের পাতা অত্যধিক শীত কিংবা হিমবৃষ্টিতে কখনও ঝরত না। তৃতীয় গ্রামটাতে দেবদারু আর ছুঁচের মতো পাতাওয়ালা গাছই ছিল বেশি। আর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দেখা যেত ভূর্জবৃক্ষ। ভূর্জবৃক্ষের ছাল সাদা। দেবদারু কাঠ আমরা ঘর তৈরি কিংবা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করতাম; ভূর্জ ব্যবহার করতাম অন্যসব কাজে। ভূর্জের ছাল দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে তাতে মাখন, দই অথবা অন্যান্য জিনিস রাখতাম। আমাদের বইপত্র সব লেখা হ'ত ভূর্জপত্রে।

আমি যখন পাটলিপুত্রের অশোকারামে ছিলাম তখন এই ভূর্জপত্র নিয়ে এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। সেখানকার ভিক্ষুরা ভূর্জছালকে বলতেন ভূর্জপত্র। আমার কথা তাঁরা কিছুতেই মানতেন না। বলতেন, পত্র যদি না-ই হবে তাহলে ভূর্জপত্র নাম কেন? আমিই-বা কী করে মানব যে, তা পত্র? কারণ, ছেলেবেলায় ছুরি দিয়ে এই সাদা গাছের ছাল কেটে নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি। আমি তাঁদের বলেছিলাম, ভূর্জছালকেই তাঁরা ভূর্জপত্র বলে থাকেন, এবং তাঁদের দেশে আমাদের দেশের মতো এত শীত আর হিমবৃষ্টি হয় না যে, ভূর্জবৃক্ষ জন্মাতে পারে। তাঁরা তালপাতা ব্যবহার করেন আর সেই তালপত্রের অনুসরণেই এই লেখনসামগ্রী নাম দিয়েছেন ভূর্জপত্র।

এ কথা তো বোঝাই গেল যে, আমাদের উদ্যানবাসীদের জীবন একরকম যাযাবরেরই জীবন। ঘরবাড়ি আর গ্রাম থাকতেও সারা বছর আমরা এক জায়গায় থাকতাম না। এই যাযাবর-জীবন কিন্তু আমার খুব ভালো লাগত। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামে ঘাসের অভাব হ'ত না। তবু আমাদের গ্রামের লোকেরা সেই অনাদিকাল থেকে দেবদারু আর ভূর্জবৃক্ষে ঢাকা পাহাড়েই পশুচারণ করত। ঐ পাহাড়ই তাদের পছন্দ। ঐ পাহাড়ী জায়গায় পৌঁছুনোর আগেই বড় জাতের গাছও বেঁটে হয়ে যেত, আর তাই সেসব জায়গা ঘাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হ'ত। নিচে থেকে দেখলে মনেই হ'ত না যে, পাথরে ঢাকা পাহাড়ের এই চড়াইয়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লম্বা লম্বা ঘাস আছে। শুধু ঘাস নয়, কোথাও কোথাও আবার বুনো গমের জঙ্গল। এই বুনো গম ঠিক আমাদের ক্ষেতের গমের মতো—তফাৎ শুধু দানাগুলো ছোট আর হাল্কা। এইসব পশুচারণভূমিতে কোনো সীমানা নির্দিষ্ট থাকত না। তবু সবাই জানত, কার কতদূর জায়গা। গ্রামে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ক্ষেত, কিন্তু এখানে সব এক। তোমার আমার বলে কিছু নেই। বাস করার কুঁড়েঘরগুলোও একসঙ্গে, এমন কি রান্নাও একসঙ্গে। শুধু এখানে তৈরি মাখন আলাদা আলাদা রাখা হ'ত। আমাদের যেমন মাংস, দুধ, দই, মাখন প্রভৃতি সুলভ ছিল, তেমনি পশুদের ঘাসপাতা। চীনে এসে আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, উদ্যান-বাসীদের কাছে হীনযান এত প্রিয় কেন। মাংস ছাড়া মানে তাদের কাছে সবচেয়ে সহজলভ্য খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। মাংস খাওয়া এখন আমার কাছে নিষ্ঠুরতা মনে হয়, কিন্তু তখন ভেড়া আর ছাগলের সদ্যোজাত বাচ্চার

মাংস ভেজে আমরা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম। গৃহস্থরা অতিথিদের এই সুস্বাদু মাংস খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। সদ্যোজাত ভেড়া আর ছাগলের চামড়া খুব মোলায়েম আর চকচকে, তাই চামড়ার লোভেও তাদের মারা হ'ত।

এই সত্তর বছর বয়সেও পয়ারের জীবন আমার কাছে বড় লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলার কথা আজও মনে পড়ে। সকালে ছাতু আর সেদ্ধ মাংস খেয়ে পশু চরাতে চারণভূমিতে চলে যেতাম। গ্রামের আশেপাশে যেমন পশুদের শত্রু ছিল, তেমনি চারণভূমিতেও ছিল। বরফের দেশের চিতা পশুদের ছাড়া পেলেই মেরে ফেলত। কিন্তু শিংওয়ালা পশুরা দলবদ্ধ থাকলে বড় বড় চিতা, এমন কি বাঘ-সিংহকেও ধারে কাছে ঘেঁষতে দিত না। ভেড়া আর ছাগলের সবচেয়ে বড় শত্রু নেকড়ে। পশুরা দলবদ্ধ থেকেও নেকড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না। তাদের রক্ষা করার জন্য থাকত কুকুর। কুকুরকে আমরা পশুর মধ্যে ধরতাম না। তারা আমাদের কাছে মানবসমাজেরই অঙ্গ ছিল। তাদেরও সকালে সেই একই খাবার দেওয়া হ'ত। খাবার খেয়ে তারা ভেড়া-ছাগলের সঙ্গে চারণভূমিতে বেরিয়ে পড়ত।

চারণভূমিতে সারাদিন পশুদের সঙ্গে থাকা আমাদের মতো ছেলেদের কাছে এক দারুণ আনন্দের ব্যাপার ছিল। সেটা ছিল খেলাধূলো আর নিশ্চিন্ত আনন্দের জীবন। দুপুরে খেতে যাবার সময়ও আমাদের থাকত না, পিঠের ওপর ঝোলায় থাকত ভাজা গম, সেদ্ধ মাংস, কিংবা রুটি আর থাকত ভেড়ার তাজা ঝিল্লিতে ভরা ঘোল কিংবা দুধ। খিদে পেলেই কোথাও বসে খেয়ে নিতাম।

পশুর দল আপন মনে চরে বেড়াত। মাঝে মাঝে বিশ্রামও করত। আবার চরত। তাদের দেখাশোনার জন্য থাকত কুকুর। বিপদ উপস্থিত হলেই কুকুর ডেকে উঠত আর তখন আমরা খেলা ফেলে ছুটে যেতাম। খেলাধূলোর সঙ্গে ছিল শিকার। কুকুরের সঙ্গে আমরা খরগোশ শিকার করতাম। তারপর যেতাম কাঠ কুড়োতে। চকমকি পাথর সঙ্গেই থাকত। চকমকি পাথর ঠুকে শুকনো কাঠে আগুন জেলে খরগোশের মাংস পোড়াতাম। সেই ঝলসানো মাংস আমাদের পরম প্রিয় খাদ্য ছিল। যেদিন শিকার পেতাম সেদিন আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না।

দিনের শেষে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের গ্রামের লোকেরা মদ

খেত আর গানবাজনা করত। স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে নাচগান করে অর্ধেক রাত কাটিয়ে দিত। কিন্তু এই আনন্দোৎসবে আমরা যেতে পারতাম না। তাই দিনের বেলায় পশু চরানোর সময় তা পুষিয়ে নিতাম। বাঁশি বাজিয়ে আর কাঠের ওপর তাল ঠুকে গানেব আসর বসাতাম। আমাদের পাহাড়ের লোকেরা বিশেষ করে উদ্যানবাসীরা মধুর কণ্ঠের জন্যে বিখ্যাত ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমরা গান গাইতাম। সমবয়সীদের মধ্যে আমার গলা ছিল সবচেয়ে মিষ্টি। আর তাই সমবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে খুব ভালোবাসত।

বর্ষাকালে পশু চরানোব সময প্রায়ই বৃষ্টি হ'ত। আমাদের থাকার জন্য কিছু তাঁবুও ছিল। ছাগল আর ঘোড়ার লোম দিয়ে তৈরি সেসব তাঁবু। তাঁবু ছাড়াও ছিল কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের সংখ্যাই বেশি। এই পাহাড়ী দেশে জলবৃষ্টি ছাড়া কখনও কখনও হিমবৃষ্টিও হ'ত। যখন অবিরাম বৃষ্টি হ'ত, জামা-কাপড ভেদ কবে শীত গিযে শরীবে আর হাড়ে বিঁধত। তখন বুঝতে পারতাম. এর পরই বৃষ্টিব বদলে হিমবৃষ্টি হবে। ভেড়ার পাল কিন্তু আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে যেত। আকাশে ঘন মেঘের ছায়া দেখলে তারা মনে কবত, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তখন তাবা ঘরে ফিবত। কিন্তু তখন বুনো জন্তুর হামলাব ভয় থাকত বেশি। প্রতি বছরই বুনো জন্তুব কবলে পড়ে আমাদেব অনেক পশু প্রাণ হারাত। যত সাবধানই হই না কেন, কিছু-না-কিছু তাবা মারতই। আমাদের কোনো পশুর ওপব হামলা হলে হৈ-হল্লা কবে মবা পশুটাকে আমবা ছিনিয়ে আনাব চেষ্টা কবতাম।

আমাদেব এখানকার ধর্মভীরু লোকেরা বুনো জন্তুর মাবা পশুর মাংস বেশি পবিত্র মনে করত, কারণ সেই মাংসের জন্য তাদের হিংসা কবতে হয় নি। অহিংসা সম্বন্ধে তথাগত অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেইসব উপদেশ তাবা মনে রেখেছে। তাই এই রকম ধারণা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কখনও কখনও ববফের দেশের চিতা পশুদের ওপব হামলা কবে গোরু-বলদ অথবা বাছুর মেরে ফেলত। তখন সময়মতো পৌঁছুতে পারলে সমস্ত মাংসটাই পেয়ে যেতাম। সেই মাংস একবারে শেষ করার জন্য সারা গ্রামের লোক ছাড়া প্রতিবেশীদেরও নেমন্তন্ন করা হ'ত। মদ ছাড়া ভোজ জমে না, তাই বরাবরই চামড়ার বড় বড পিপেয় করে গম আর যবেব কাঁচা মদ আসত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে. ঘোড়ার দুধেও মদ হয়। আমাদের এখানে অনেক ঘোড়া ছিল। শক্ত মজবুত সব ঘোড়া

—পাহাড়ী পথে চলার উপযোগী। আমাদের এখানে কেউ চামর পুষত না। চামর পুষতে আমি দেখেছি শীতসমুদ্রের আশপাশের লোকদের। আগে আমিও মনে করতাম, চামর এক জাতীয় হরিণ। কিন্তু মধ্যমণ্ডলে এসে দেখলাম, চামর গোরুর মতোই বড এক জন্তু। গায়ে এক হাত লম্বা কালো কালো লোম। সাধারণ গোরু আর চামরের মিলনে সন্তান হয় এবং তাদের বংশবৃদ্ধিও হয়। এইসব দেখে আমার বিশ্বাস হ'ল যে, চামর গোরুরই স্বজাতি।

আমাদের জীবন কেবল আমোদ-প্রমোদ, পশুচারণ আর দুগ্ধ-দোহনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমার কাকা ভদন্ত ভিক্ষু এলে আমাদের কুঁড়েঘরগুলি সরগম হয়ে উঠত। আবার যখন কোনো সংঘারামের মহাস্থবির আসতেন তখন সব নরনারী আর শিশু তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবাব জন্য গানবাজনা করতে কবতে এগিয়ে যেত, পঞ্চাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করত, তাঁব আশীর্বাদ গ্রহণ করত, তারপর আবার গানবাজনা করতে করতে তাঁকে নিয়ে আসত। কখনও কখনও তার থাকার জন্য নতুন ঘব তৈবি করে দিত। বর্ষাকালে ভিক্ষুরা যাওয়া-আসা করতে পারতেন না। তাই সেই সময়ে এসে পডলে তাঁরা আমাদের এখানেই বর্ষাবাস করতেন। প্রতি অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় বিশেষ পূজা হ'ত। লোকে সেদিন মাংস খেত না। দুপুরে একবার মাত্র আহার করে উপোসথ-ব্রত পালন করত। তারপব সন্ধ্যায় ভক্তিভরে ধর্মকথা শোনার জন্য এক জায়গায় জড়ো হ'ত।

মহাস্থবির সংঘবর্ধন এক বছর পয়ারে এসে বর্ষাবাস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাঁচজন ভিক্ষু আর জন চার-পাঁচ শ্রামণের। বর্ষাবাস শেষ হলে আশ্বিন-পূর্ণিমার দিন বিবাট এক উৎসব হয়েছিল।

সেই মহোৎসবের দিন দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা এসেছিল উপদেশ শুনতে। মহাস্থবির সেদিন তথাগতর জীবন সম্পর্কে বড় সুন্দর এবং বিস্তৃত উপদেশ দিয়েছিলেন। অবদানের গল্পগুলি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। তাঁর বলার ভঙ্গিটি ছিল অত্যন্ত সরল। তিনি যখন তথাগতর বাল্যজীবন বর্ণনা করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, তথাগত যেন আমারই সমবয়স্ক এক বন্ধু।

রাত্রি যখন এক প্রহর তখন মহাস্থবির সংঘবর্ধনের উপদেশ শেষ হ'ল আমার বয়সী যারা ছিল তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি ঘুমোই নি আমার চোখের পাতা একবারের জন্যও বুজে আসে নি।

মহাস্থবিরের উপদেশ আমার মনে চিরদিনের জন্য ছাপ রেখে গেল। আমি

আস্তে আস্তে বুঝতে লাগলাম, জীবনটাকে কেবল নিজের সুখভোগে লাগালে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায় যদি তা অন্যের সুখে লাগে। সেই পূর্ণিমার রাত্রি আমাকে প্রেরণা দিল, আমার হৃদয়ে বীজ বপন করল।

পরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আমার সারা ভবিষ্যৎ-জীবনের পথপ্রদর্শক হয়েছে। মহাস্থবিরের তখন বয়স ছিল আশি, আর আমি বার বছরের বালক। আজ আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আমাদের দুজনের চার চোখ প্রায় দেড় শতাব্দীর বিস্তৃত পৃথিবী দেখেছে। পৃথিবীর পরিবর্তন যতটা দেশে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি হয় কালে। পুরনো যা তা চোখের আড়ালে চলে যায়, স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়; আর তার আসন গ্রহণ করে নতুন। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, অপার দুঃখ—একথা সবাই স্বীকার করেন। তথাগতও করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, দুঃখেরও কোনো-না-কোনো কারণ অর্থাৎ নিদান থাকে, যেমন থাকে রোগের, আব রোগের মতোই দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। সেই মুক্তির পথ তথাগত তাঁর বাণী আর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। সে পথ হচ্ছে—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। সে পথে চলতে হলে জীবনটাকে নিজের সুখ আর স্বার্থে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলে না। জীবনটাকে যদি অন্যের সুখ আর হিতের জন্য উৎসর্গ করা যায় তাহলে এই পৃথিবীর দুঃখ অনেক কমে যায়। চারিদিকে স্বার্থের গাঢ় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারেই তথাগত বোধিপ্রদীপের আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন।

আগেই বলেছি, সেই প্রাবারণার রাত্রি আমার জীবনে এক স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। সেই উপ্ত বীজ আমার হৃদয়েব এক কোণে অজ্ঞাতে পড়ে ছিল। কয়েকদিন আমি মহাস্থবিরের উপদেশ আর তাঁর সংসর্গের অভাব বোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে অন্য ছেলেমেয়েদের মতো আবার সেই বালসুলভ খেলাধূলোয় মত্ত হয়েছিলাম। আবার সেই সকালে পশু চরাতে যাওয়া, নাচগান করা আর শিকারের পেছনে ঘোরা। এরই মধ্যে হঠাৎ এক পরিবর্তন দেখা দিল, শিকার করতে আমার হাত আর উঠছে না। তাই দেখে আমার সঙ্গীরা আমাকে বলতে লাগল, ভিক্ষু।

পয়ারের জীবন মাত্র চার-পাঁচ মাসের। কবে শুরু হ'ত, কবে শেষ হ'ত, আমরা তা টেরই পেতাম না। দেড়-দু মাস পরে এক জায়গা থেকে উঠে কয়েক ক্রোশ দূরে আর-এক জায়গায় চলে যেতাম। ঘাসের সন্ধানে নয়, অনেক

গোবর আর নাদি জমে যেত, তাই। তিন মাস পর শীতের আধিক্যই জানিয়ে দিত, পয়ারের জীবন শেষ হতে চলেছে। চতুর্থ মাসের শেষে সবুজ ঘাসে হলদে রঙ ধরতে শুরু করত, আমরা বুঝতে পারতাম, এবার আমাদের গ্রামের ঘরে ফিরে যেতে হবে। পয়ারে আমরা ছিলাম ভাই-ভাই। এক সঙ্গে শুতাম খেতাম, খেলতাম। এবার আমাদের এই বিরাট পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বর্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে পয়ারভূমি পুষ্পশ্রীতে ভরে উঠত। আমাদের আনন্দের তখন সীমা থাকত না। চতুর্থ মাস শুরু হতেই যদি সেই মনোরম ভূমি ছেড়ে যাবার ডাক আসত তাহলে বড় দুঃখ হ'ত। আমাদের প্রবাস জীবনেব অবসান হ'ত ধীরে ধীরে। পুরো পাঁচ মাস থাকা ছিল অনিশ্চিত। কারণ, ঋতু পরিবর্তনের কোনো ঠিক ছিল না—কখনও তাড়াতাড়ি ঋতু পরিবর্তিত হ'ত, আবার কখনও-বা দেরি করে। চারপাশেব তৃণ-বনস্পতি যখন বেশ হলদে হয়ে আসত তখন গৃহীরা যাবার জন্ত তৈরি হ'ত। প্রথমে গোরু-বলদ পাঠানো হ'ত, তারপর ঘোড়া ; আর সবশেষে ভেড়া-ছাগল নিয়ে সবাই যাত্রা করত। ছোটদের আর মেয়েদের আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। চতুর্থ মাসে যে রসদ আসত তাতেই বাকি সময়টা কাটাতে হ'ত। তখন শুধু ভেড়া আর ছাগলের দুধই পাওয়া যেত। অবশ্য মাখন থাকতই, আর মাংসেরও অভাব ছিল না। কিন্তু অভাব ছিল অন্তসব খাদ্যসামগ্রীর। যেসব জিনিস বেঁচে যেত তা আর পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত না। ওখানেই গর্ত করে ভূর্জবৃক্ষের ছাল বিছিয়ে পুঁতে রাখা হ'ত। সামনের বছর বর্ষারম্ভের আগে এলে তা ঠিকই পাওয়া যেত, নষ্ট হ'ত না। কিন্তু একটু দেরি করে এলে আর কয়েকদিন ক্রমাগত হিমবৃষ্টি হলে মানুষ কিংবা পশু কারও ভোগেই তা লাগত না।

প্রথম হিমপাত হতেই সবাই গ্রামের দিকে রওনা হ'ত। কখনও কখনও হিমপাত আর পশু-মানুষের নিচে নামার দৌড় লেগে যেত। যে বছর একটি প্রাণীও না হারিয়ে লোকে গ্রামে এসে পৌঁছুতে পারত সে বছর তাদের আনন্দ আর ধরত না। ঘরে ঘরে উৎসব লেগে যেত।

তিন

পয়ারের জীবন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। শৈশব বাল্যে পরিণত হ'ল, তারপর অগ্রসর হ'ল নবতারুণ্যের দিকে। সমবয়সীদের মতো আমার জীবন-প্রবাহও পরিবর্তিত হ'ল। আমার কাকা আমাকে অক্ষরজ্ঞান করিয়েছিলেন, কয়েকখানি বইও পড়িয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, আমি তাঁর শিষ্য হব। ভিক্ষুদের বেশভূষা আর তাঁদের জীবনধারা আমারও ভালো লাগত—বিশেষ করে, যখন মনে হ'ত, তথাগতও এই বেশ ধারণ করেছিলেন এবং এমনিভাবেই দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মহাস্থবির সংঘবর্ধনের উপদেশ শোনার পর ভিক্ষু-জীবন আমাকে কিছুদিন তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আকর্ষণ ক্ষীণ হয়ে গেল। তার কারণ, নবতারুণ্যের আগমনে আমার জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল তা সংঘারামে যাবার পথে এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রত্যেক দেশেরই আলাদা আলাদা সামাজিক রীতিনীতি থাকে। এই পর্যটক-জীবনে এত বিভিন্নতা আমি দেখেছি যে, উদ্যানে থাকলে তা বিশ্বাসই করতে পারতাম না। পারসীকেরা নিজের মাকে বিবাহ করতে পারে। আবার এমন দেশও আছে, যেখানে সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। ধর্মগ্রন্থে আমি পড়েছি, তথাগত-বংশের শাক্য আসলে ভাইবোনের সন্তান ছিলেন। সব ভাই মিলে এক স্ত্রীকে বিবাহ করা শুধু দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডবের গল্পেই শোনা যায় না, এমন বিবাহ বহুদেশে বহুল প্রচলিত আছে। সেসব দেশে আমি গিয়েছি। এত সব দেখার পর সামাজিক প্রথার জন্য আমার মতো মানুষের মনে কোনো দুরাগ্রহ থাকতেই পারে না।

উদ্যানের জীবন ছিল স্বচ্ছন্দ। এখানে স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের স্বচ্ছন্দ প্রেমের পথ উন্মুক্ত ছিল। আহার-নিদ্রার মতো নৃত্যগীতও ছিল আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ। আমি ভালো গাইতে পারতাম, কণ্ঠ আমার মধুর ছিল—একথা আগেই বলেছি। আমি নাচতেও পারতাম। কিন্তু একটি ত্রুটি আমার অবশ্যই ছিল। সে হ'ল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মিতভাষিতা। এই মিতভাষিতার জন্য অত্যধিক লজ্জা আর সংকোচ এসেছিল আমার মধ্যে। অবশ্য পরে আমি তথাগতর উপদেশাবলীতে পড়েছিলাম, মিতভাষিতা দোষ

নয় বরং মহৎ গুণ। তারুণ্য আর প্রেমের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, তাতে লজ্জা আর সংকোচ বাধা দিতে পারে না। মিতভাষিতাও না। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যও আমার কারও চেয়ে কম ছিল না। আমি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠতে পারতাম। শিকার না করলেও শিকারীদের সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত যেতাম। কঠিন কঠিন নাচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচতে পারতাম। তাই আমার শরীর ছিল সুপুষ্ট। পনের বছর বয়সেই আমি নবতারুণ্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে মনে হ'ত, আমি যেন কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক। বেশি কথা না বললেও অন্যের কাজে সাহায্য করার মধ্যে আমি এক ধরনের আনন্দ পেতাম। আমি সমবয়সীদের নেতা হতে পারি নি—এ কথা ঠিক, কিন্তু বরাবরই সবার স্নেহভাজন ছিলাম। কখনও কারও সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে কিনা সন্দেহ।

আমার সমবয়স্ক অনেক ছেলে শ্রামণের হয়ে সংঘারামে ছিল। তারা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য যখন-তখন বাড়ি আসত। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও তাদের দেখা হ'ত। তাদের সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আগে আমরা যেমন মিলেমিশে থাকতাম, খেলাধূলো করতাম, এখন আর তেমনটি হবার উপায় ছিল না। চীবর পরলেই তারা আমার মা-বাবার কাছেও বড় হয়ে যেত—এমন কি, আমার চেয়ে বয়সে দু-চার মাস ছোট হওয়া সত্ত্বেও। মা-বাবার দেখাদেখি আমিও হাতজোড় করে তাদের অভিবাদন করতাম, আর তারা আশি বছরের বৃদ্ধের মতো আমাকে আশীর্বাদ করত।

সংঘারামে প্রবেশ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার আরও দু'টি ভাই হয়েছিল। মা-ও ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। তাই আমার ভিক্ষু হবার পথে কোনো বাধাই ছিল না। বাবা কিংবা কাকা-কাকিমাও বাধা দিতে পারতেন না, বরং মনে মনে তাঁদের এই ইচ্ছাই ছিল। কাকা ভিক্ষু জিনবর্মা প্রতি বছরই আগ্রহ করে বলতেন, সংঘারামে গিয়ে নরেন্দ্র বেশি করে লেখাপড়া করতে পারবে। কিন্তু আমার উৎসাহ না দেখে তিনি বিশেষ জোর দিতেন না। আমার যে ভিক্ষু হবার ইচ্ছা ছিল না তা কিন্তু নয়। আসলে আমি গৃহস্থ-জীবন আর ভিক্ষু-জীবন, কোন্‌টা গ্রহণ করব তা স্থির করতে পারছিলাম না। আমি নৃত্যগীত খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু ভিক্ষু হলে যে চিরদিনের মতো তা জলাঞ্জলি দিতে হবে।

বোধহয় সেটা ছিল বর্ষার তৃতীয় মাস। আমরা পশু চরাতে চরাতে পয়ারের এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে বড় বড় ঘাসের বন। হঠাৎ এক সময় দূরে কুকুর ডেকে উঠল, তারপর ভেড়ার চিৎকার শোনা গেল। আমরা চোদ্দ-পনের বছরের ছেলেমেয়েরা তখন সেখানে গানের আসর বসিয়েছিলাম। কথোপকথনের আকারে প্রেমিক-প্রেমিকার গান ভারি সুন্দর লাগছিল। আমি আর ভদ্রা একটা পুরনো গান প্রশ্নোত্তরের আকারে পালা করে গাইছিলাম। অন্য ছেলেমেয়েরা পাশে বসে শুনছিল। কুকুরের ডাক আর ভেড়ার চিৎকারে আমাদের গান বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ছুটল ভেড়ার পালের দিকে। ভদ্রা আর আমিও ছুটলাম। এদিকে তখন বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। একটু পরেই শুরু হল ভীষণ শিলাবৃষ্টি। আমরা ছুটতে ছুটতে একটা বিরাট পাথরের নিচে এসে পৌঁছুলাম। বৃষ্টি আরও জোরে এল। বড় বড় শিলা পড়তে লাগল। সামনের জায়গাটা ভরে গেল সাদা সাদা শিলায়। আমি আর ভদ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বৃষ্টিটা বন্ধ হলে সঙ্গীদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়ব। হঠাৎ আকাশে কড় কড় করে মেঘ ডেকে উঠল। ভদ্রা ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাঁধে আর মাথায় হাত রাখলাম। সে স্পর্শে আমি এক নতুন বিচিত্র চেতনা অনুভব করলাম। হঠাৎ আগুনের ওপর হাত পড়লে যেমন হয়, এ কিন্তু তেমন নয়। কারণ, তাতে জ্বালা ছিল না, ছিল অন্য এক অনুভূতি। আমাদের গানে আর গল্পে জেনেছিলাম, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রেম হয়। সে ছিল শোনা প্রেম, তার স্বাদ আমি তখনও পাই নি। মধুর স্বাদ পেতে হলে জিভ দিয়ে মধু চাখতে হয়।

আমার হাতের স্পর্শমাত্রেই ভদ্রা প্রকৃতস্থ হ'ল, তার ভয় দূর হয়ে গেল। আমরা দুজনে নিচে বসে পড়লাম। সেই অনাস্বাদিত স্পর্শ আমাদের মুখের আগড় খুলে দিল। আমরা ক্রমশ মুখর হলাম।

উত্তানে ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত আরও অনেক জাতি ছিল। তার মধ্যে আমাদের জাতিই ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপর শকেরা। যেথায়াও ছিল অনেক, কিন্তু সামন্ত আর শাসকগোষ্ঠী ছাড়া তাদের বেশির ভাগই ছিল যাযাবর পশুপালক। তাদের বড় অহঙ্কার ছিল, কারণ মিহিরকুল আর তোরমাণ তাদেরই স্বজাতি। আর তাই তারা খস ও শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করত না। ভদ্রা ছিল শকবংশের মেয়ে। উত্তানে সবাই ছিল বৌদ্ধ। ভদ্রারাও ভগবান

তথাগতর পূজা করত। শক আর খস ভিক্ষুরা একই সংঘারামে থাকতেন। এই দুই জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। শকদের মতো আমিও মনে করতাম, শকেরা গৌতমবংশীয় শাক্য। কিন্তু সে ধারণা ভুল। তবু শকদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। ধর্মরাজ কণিষ্ক এবং অন্যান্য শক রাজার তৈরি বড় বড় সংঘারাম আর চৈত্য দেখার পর শকবংশের মহিমা আমাদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। খস আর শক ভিন্ন জাতি হলেও তারা একই ভাষায় কথা বলত, তাদের মধ্যে বিবাহও প্রচলিত ছিল। খসদের চেয়ে শকেরাই বেশি ফরসা ছিল। তাদের চুল কালো কিংবা মেটে রঙের ছিল না। ভদ্রারই মতো অধিকাংশ শককুমারী ছিল নীলাক্ষী।

ভদ্রা অসাধারণ সুন্দরী ছিল। কেবল আমাদের পয়ারে পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে আসা তরুণীদের মধ্যেই নয়, বরং আমি বলব, সারা উদ্যানের জনপদ-কল্যাণী ছিল সে। তখন তার বয়স চোদ্দ বছর। ছেলেবেলার আহ্লাদে-ভাব তখনও তার যায় নি, বরং বেশিই ছিল। আমার চেয়েও তার গলা ছিল বেশি সুরেলা। তাই রাখালরা আমাদের দুজনের জোড় পাকা করে দিয়েছিল। আমরা দুজনে এক জায়গায় থাকলেই গান গাইতে বলত। দ্বৈত কণ্ঠের গান। কত বছর ধরেই না আমরা দুজনে এমনি করে গান গেয়েছি, পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। যে গান আমরা গাইতাম তার মানে অবশ্য বুঝতাম না। তবু গাইতাম। ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে খেলা করেছি। আর সেদিন যখন সেই ভীষণ শিলাবৃষ্টির সময় বিরাট পাথরটার নিচে আমি আর ভদ্রা বসে ছিলাম তখন আমার মনের ভেতর ঝড় উঠেছিল। ভদ্রার স্পর্শ সেদিন অন্যদিনের মতো মনে হ'ল না কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম, শুধু আমারই মনে ঝড় উঠেছে। ভদ্রার রক্তিম ওষ্ঠাধরে হাল্কা হাসির রেখা ছিল, তার অরুণ কপোল ছিল আরক্ত। কিন্তু সে তো সব সময় হাসিখুশিই। তাই আমি এই বিশেষত্বের অর্থ বুঝতে পারি নি। মনটাকে আমি শান্ত করতে চাইলাম। ভদ্রার মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছিল, আমি হাত দিয়ে মুছে দিলাম। আবার সেই উত্তেজনা বাড়তে লাগল। মনটাকে কোনোরকমেই শান্ত করতে পারলাম না। আমি তখন বললাম: ভদ্রা, আজ এ কী হ'ল বলো তো। তোমার কাঁধের আর চুলের ছোঁয়া আগের মতো মনে হচ্ছে না কেন?

ভদ্রা বলল: নরেন্দ্র, তোমারও কি অমন হচ্ছে? আমারও মন আজ বড়

চঞ্চল হয়েছে। এমন চঞ্চল আগে কখনও হয় নি। জানি না, যাঁর প্রেমের গান আমরা গাইছিলাম তিনি আমাদের ভেতর প্রবিষ্ট হয়েছেন কিনা।

আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষেব ওপর ভূত আর দেবতার আবেশ হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। বৈশ্রবণ (কুবের) কিংবা তার পত্নী হারীতি দেবী যেমন ওঝাদের মাথার ওপর এসে কথা বলেন তেমনি যদি আমাদের গানের নায়ক-নায়িকা গাযক-গায়িকাদেব ওপর ভর কবে তাহলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে ?

আমরা মনের চঞ্চলতা আর তার বেগ পরীক্ষা করাব জন্য অনেকবার পরস্পরকে স্পর্শ কবলাম। দেখলাম, তা বেড়েই চলেছে। একটু পবে ভদ্রার গালের সঙ্গে আমাব গাল লেগে গেল। তারপব জানি না কখন আমাদেব ঠোঁটের মিলন হ'ল। তখন আমাদেব মনেব কোথাও কোনো সংকোচ ছিল না। গানেব আর গল্পের নায়ক-নায়িকাব মতো আমবাও তখন পবস্পরেব কাছে প্রেম নিবেদন করলাম।

আমাদেব দেশে কদাচিৎ কুড়ি বছবের আগে ছেলেমেয়েদেব বিবাহ হয়। তাই বাড়িতে আমাব বিবাহেব কথা তখনও শুনি নি। আমার বিবাহেব কথা তোলার কোনো প্রয়োজনই কেউ বোধ করে নি। কারণ, কাকা ভিক্ষু জিনবর্মাব আগ্রহ আর বাবাব ইচ্ছা আমাকে সংঘারামের দিকে টানছিল। আমার নিজেবও ওদিকে আকর্ষণ ছিল বেশি। সেই বছরই আমাব শ্রামণেব হবাব কথা চলছিল। তবু আমি ভাবলাম, সংঘাবামে গেলে তো ভদ্রার সঙ্গে থাকতে পারব না। আগে হলে ভদ্রার সঙ্গে গাইবার কিংবা নাচবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবাব কথাটাই শুধু মনে আসত, কিন্তু এখন ভদ্রাব স্পর্শও আলিঙ্গন যে আমাকে আনন্দ দিয়েছে তা আমি ভুলব কেমন করে ? মাঝে মাঝে আমি ভদ্রার স্পর্শসুখ অনুভব করতাম, তার কথা শুনতাম—আর অন্য সময় সংঘাবামেব জীবনেব কথা ভাবতাম।

ভিক্ষু জিনবর্মার আশা কিন্তু তখনও ভঙ্গ হয নি। সেবার তিনি সারাটা শীতকাল আমাদেব গ্রামের সংঘারামে ছিলেন। আমি তো সংঘারামে যেতে অস্বীকার কবি নি, শুধু টালবাহানা করছিলাম। সেকথা সবাই জানত।

বড় আগ্রহ নিয়ে আমি বর্ষার আগমনের প্রতীক্ষা করতাম। সময় হবার আগেই রওনা হতাম পর্বতপৃষ্ঠের সেই আবাসে। আমি যখন সেখানে

পৌঁছুতাম তখন অনেক জায়গায় বরফ দেখা যেত। তখন সেখানে শুধু তারাই আসত, যাদের নতুন করে কুটির তৈরি করতে হ'ত কিংবা জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে হ'ত। ভদ্রার পরিবার প্রত্যেকবারই এক মাস পরে পৌঁছুত। ভদ্রার জন্য আমি নিচে প্রতীক্ষা না করে পয়ারে এসে প্রতীক্ষা করতাম। সেইটেই আমার ভালো লাগত। সেই শিলাবৃষ্টির সময় প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, এখন তা দৃঢ় হয়েছে। গ্রামের এবং পরিবারের সকলেই আমাদের দুজনের প্রেমের কথা জানত। এ তো কোনো নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল না, অস্বাভাবিকও না। উদ্যানের প্রত্যেক কুমার আর কুমারীর জীবনে একবার এরকম হ'তই। যদিও কখনও কখনও সঙ্গী নির্বাচনে মা-বাবার হাত থাকত, তবু প্রেম-বিবাহ (স্বয়ম্বর)-ও আমাদের এখানে বহুলপ্রচলিত ছিল।

ভদ্রা আর আমি তখনও আমাদের সেই দুটি গান গেয়ে বন্ধুদের মনোরঞ্জন করতাম। কিন্তু প্রণয়সূত্র দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের সামনে আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারে সংকোচ দেখা দিতে লাগল। আমরা তখন বেশির ভাগ নির্জনে দেখা করতাম, মনের ভাব আরও ভালো করে প্রকাশ করতাম, আর ভবিষ্যতের জন্য নানারকম কল্পনার জাল বুনতাম। ভদ্রা জানত, আমার বাবা আর কাকা ভদন্ত জিনবর্মার বড় ইচ্ছা, আমি ভিক্ষু হই। শ্রামণের হবার আশা তখন কমই ছিল। কুড়ি বছর বয়স হবার পর আমি শ্রামণের না হয়ে সরাসরি ভিক্ষুই হতে পারতাম। আমি নিজে যে শিক্ষালাভ করেছিলাম তা কোনো যোগ্যতর শ্রামণের চেয়ে কম ছিল না। আমি আমার মনকে ভালো করেই জানতাম, চীবর বস্ত্র এখন আর আমার জন্য নয়, কেননা আমার এ জীবন ভদ্রার। তবু ভদ্রা যখন-তখন শঙ্কিত হয়ে উঠত।

আমার বয়স তখন সতের বছর। সেবারের বর্ষাটা পয়ারেই কাটাচ্ছিলাম। তখন কি আমি জানতাম যে, এই আমার শেষ পয়ার-বাস। একদিন আমরা কাঠ কাটতে চার ক্রোশ দূরের জঙ্গলে চলে গিয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম সকালে, ফিরব সেই সন্ধ্যায়। ভদ্রাও গিয়েছিল তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। কাঠ কেটে বোঝা বেঁধে ফেরবার আগে বিশ্রামের জন্য আমরা সবাই দেবদারু বনে খানিকক্ষণ বসলাম। ভদ্রা আর আমি বসলাম এক বুড়ো দেবদারুর ঘন ছায়ায়—অন্য সবার থেকে দূরে। ভদ্রাই বিশেষ করে বলেছিল সেখানে বসতে। হয়তো সে কোনো কথা বলতে চায়, এই মনে করে আমিও রাজী হয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভদ্রা আমার মাংসল বাহু আয়

বিশাল বক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল। আমিও তার সুন্দর মুখ আর সুডৌল দেহখানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আগে তার দেহ ছিল ঠিক ফোটা পদ্ম-ফুলের মতো। কিন্তু হঠাৎ শরতের মেঘের মতো হাল্কা পাণ্ডুর ছায়া নেমে এল তার দেহে; তার অর্ধস্ফুট ঠোঁটের মৃদু হাসি বিলীন হয়ে গেল; গালের রক্তিমাভা বিষণ্ণতার স্পর্শে নিভে গেল; স্ফীত সুন্দর চোখের নীল মণি দুটি ছোট হয়ে এল। পরিবর্তনটা হ'ল বড তাড়াতাড়ি। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ভদ্রাই বলে উঠল: শুনলাম, তুমি ভিক্ষু হতে চাইছ!

বড করুণ স্বরে ধীবে ধীরে সে কথাগুলি বলল।

এমন প্রশ্ন আমি আশা করি নি। তবে চেহারা দেখে বুঝেছিলাম, তার মনের মধ্যে কোনো অপ্রিয় স্মৃতি কাজ করছে। লোকে যতই আলোচনা করুক, নরেন্দ্র ভিক্ষু হবে,—নবেন্দ্র সে আশা এক বছর হল ত্যাগ করেছে। আমি আমার ডান হাতখানা ভদ্রার কাঁধের ওপর রেখে তার দুটি নীল চোখের মণির দিকে তাকিযে বললাম: কে বলেছে? সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এক সময় ইচ্ছে ছিল, ভিক্ষু হব, কিন্তু যেদিন আমার এই হৃদয়ের স্বামিনী হ'ল ভদ্রা সেদিন থেকে জানি না, সে ইচ্ছে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

ভদ্রার চেহারায় এবার বিপবীত দিকে বর্ণপরিবর্তন হতে লাগল। দৃঢ় বিশ্বাসে বুক বাঁধার জন্য সে আমার বুকে মাথা রেখে বলল: আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো ভদ্রা। আমি আমার প্রভু নই, আমার এ জীবন আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমাব নিজের মন দিয়ে আমার মনের অবস্থা বুঝে না'ও।

—তুমি ভিক্ষু হবে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু সবাই বলছিল, সামনের বছরই নরেন্দ্রের কাকা তাকে সংঘারামে নিয়ে যাবে। সবার মুখে একই কথা শুনে আমার বড চিন্তা হয়েছিল।

—ভদ্রা, শুনে তোমার আনন্দ হবে, আমার আত্মীয়-পরিজনেরা তোমাকে বধূ হিসেবে দেখতে চান। বাবা এখন তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। কাকা ভদন্ত জিনবর্মা যদিও মনে করেন, যাকে তিনি এত বছর ধরে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন তার স্থান বাড়িতে নয়, সংঘারামে, তবু আমার ওপর এখন আর তিনি বেশি আশা করেন না। এখন তিনি আমার বদলে আমার ছোট ভাইকে নেবার কথা চিন্তা করছেন।

ভদ্রা আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিকশিত হ'ল তার রূপ। আমাদের কথার ধারা বদলে গেল। আমরা ভাবী জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা যখন স্বামী-স্ত্রী হব তখন নতুন করে ঘর বাঁধব। বাবার ঘর আমার কাছে অপর্যাপ্ত মনে হ'ল। যদিও আমার সৎমার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাতে সৎমায়ের বদনাম হয়, তবু সৎশাশুড়ীর সঙ্গে তো বনবে না। তাই ঠিক করলাম, গ্রামে আমাদের দুজনের জন্য আলাদা একটা ঘর বাঁধব।

আমি বললাম: ভদ্রা, আমি শুধু কুড়ুল চালাতেই শিখি নি, কুশলী ছুতোর মিস্ত্রীর মতো কাঠের ওপর নানারকম ফুল-পাতা আর ছবি খোদাই করতেও পারি।

ভদ্রা বলল: তবে তো আমরা উদ্যানপুরী গেলে সেখানেও ভালো রকম জীবিকা অর্জন করতে পারব।

উদ্যানপুরীর নাম শুনে আমার শঙ্কিত হয়ে উঠল। ভদ্রা ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। উদ্যানপুরীতে গেলে যদি কারও নজর পড়ে তার ওপর। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য আমি বললাম: না, উদ্যানপুরী আমার ভালো লাগে না। সেখান থেকে জঙ্গল অনেক দূর। গরমও খুব বেশি। তাছাড়া প্রতি বর্ষায় আমরা পয়ারে আসব কী করে?

আমার মতো ভদ্রারও পয়ার-জীবন ভালো লাগত। তাই আমার কথায় রাজী হয়ে সে বলল: হ্যাঁ, নরেন্দ্র, পয়ার দেবভূমির কাছে। দেখতে পাচ্ছ না, ঐ যে সাদা হিমশিখর দেখা যাচ্ছে, ওখানেই তো দেবতাদের নিবাস।

—ভদ্রা, দেবতাদের এই নিবাসের জন্যই তুমি এত সুন্দরী। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন যদি কোনো আকাশচারিণী দেবী কিংবা দেবতার ছায়া মা'র ওপর পড়ে তাহলে সেই শিশু অতি সুন্দর হয়।

—তাহলে তো তোমার মা'র ওপরও কোনো দেবীর ছায়া পড়েছিল।

কথা বলতে বলতে ভদ্রা হঠাৎ থেমে গেল।

ছেলেবেলায় আমার নিজের মা'র কথা আমি অনেকবার বলেছি। আজও মা'র কথা উঠলে আমার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। ভদ্রার সে কথা মনে পড়েছে। তার খেদ দূর করার জন্য আমি বললাম: হ্যাঁ, ভদ্রা, তা ঠিক। কিন্তু তখন যে দেবতার ছায়া আমার মা'র ওপর পড়েছিল তিনি তত সুন্দর ছিলেন না, যত ছিলেন তোমার বেলাকার দেবী।

ভদ্রা আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল: শুনেছি স্বর্গে গিয়েও

আমাদের স্বজন-পরিজনেরা তাঁদের সন্তানসন্ততির কথা ভুলতে পারেন না। তোমার মা-ও বোধ হয় এখন আকাশে অথবা ঐ শ্বেত শিখরমণ্ডলীর কোণে বসে আমাদেব দুজনকে কথা বলতে দেখছেন। হয়তো তাঁর বড় আনন্দ হচ্ছে।

—বেঁচে থেকে মা তোমাব মতো বউয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, কিংবা সেবাও পেলেন না, কিন্তু মৃত্যুব পব আমাদেব আনন্দের ভাগী তিনি নিশ্চয়ই হবেন।

মানুষের জীবনেব মোড কখনও কখনও ভীষণভাবে ঘুরে যায়। আমার জীবনেব মোডও তেমনি ঘুবে গেল। আমি যখন আঠাবোয পডলাম তখন ভদন্ত জিনবর্মা আমার দিক থেকে নিবাশ হযে আমাব ছোট ভাইযেব দিকে ঝুঁকেছিলেন। এখন তাঁব নিরাশা আশায় পরিবর্তিত হ'ল, আব আমার জীবনপ্রবাহ হঠাৎ শুকিয়ে গেল। তাবপব তা অন্তঃসলিলা নদীর মতো যখন অন্য জাযগায় প্রবাহিত হ'ল তখন দেখা গেল, তাব গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে।

ভদ্রা অসাধাবণ সুন্দবী ছিল। উদ্যানে এমন সুন্দবী তরুণী আমি আর দেখি নি। কিন্তু এ কথা কে জানত যে, তাব সৌন্দর্যের প্রসিদ্ধি উদ্যানেব সীমা ছাডিযে বাইরে চলে গেছে। কাশ্মীবেব বাজা মিহিরকুলেব বাজ-অন্তঃপুবে কি সুন্দবীব অভাব? দেশদেশান্তর থেকে তাঁর জন্য সুন্দবী নাবী আনা হয়। তাতেও তাঁব তৃপ্তি নেই?

তোবমাণ মহান্ সম্রাট ছিলেন। তাঁর বাজ্যেব সীমা মধ্যমণ্ডলেব অনেক দূব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতাপশালী গুপ্তদেব কযেকবাব তিনি পবাস্ত কবেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁব পুত্র মিহিবকুলের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। আমাব বয়স যখন ন'বছর তখন মিহিরকুলকে ভীষণভাবে পরাস্ত হতে হযেছিল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাশ্মীরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে সেই পরাজযের পর তাঁব দিগ্বিজযেব সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর তার স্থান নিযেছিল কামুকতা ও বিলাসিতা। মিহিরকুলের গুপ্তচর তখন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহের বদলে সুন্দরী নারী সংগ্রহ করে বেড়াত। যে যত বেশি সুন্দরী ধরে আনতে পারত সে তত বেশি পুরস্কার পেত। সুন্দরী নারীর জন্য উদ্যানের খ্যাতি আগে থেকেই ছিল। তাই

মিহিরকুলের নজর এদিকেই পড়েছিল বেশি। উদ্যানপুরীতে তাঁর প্রতিনিধি আর প্রদেশপাল সেনাপতি সব সময়ই সুন্দরী নারীর খোঁজে থাকত। সুতরাং ভদ্রার সৌন্দর্য তাদের কাছে গোপন থাকতে পারে নি, কেননা তার সৌন্দর্যের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সেটা ছিল শীতকাল। ভদ্রার পরিবার গ্রামে ফিরে এসেছে। আমি তখন আমার গ্রামবাসীদের সঙ্গে হেমন্ত-আবাসে ছিলাম। আসল ঘটনা আমি জানতে পারলাম, যখন পরের বছর শীতের শেষে গ্রামে ফিরে এলাম। রাজধানীর রাজপ্রতিনিধি ভদ্রার কথা জানতে পেরেই ভদ্রার বাবাকে ডেকে পাঠাল। তারপর সরাসরি প্রস্তাব করল—ভদ্রা রাজাধিরাজ মিহিরকুলের।

ভদ্রার বাবার কাছে তো সে এক আনন্দের ব্যাপার। তাঁর মেয়ে মহারানী হবে। কিন্তু ভদ্রা? সে কী করতে পারে? ভদ্রা অনেক কাঁদল, মিহিরকুলের রাজঅন্তঃপুরে যেতে অস্বীকার করল। কিন্তু তার পক্ষ হয়ে কথা বলার একজনও ছিল না। যদি এ ঘটনা বর্ষাকালে পয়াবে ঘটত আর আমি উপস্থিত থাকতাম তাহলে আমার জীবন থাকতে কেউ ভদ্রাকে নিয়ে যেতে পারত না।

ভদ্রা মিহিরকুলের অন্তঃপুরে চলে গেল। বহুদিন পর্যন্ত আমি উদাস মনে ঘুরে বেড়ালাম। মিহিরকুলের রাজঅন্তঃপুর থেকে ভদ্রাকে বার করে আনা কোনো রকমেই সম্ভব ছিল না। আমার প্রেম আমাকে অধীর করে তুলল। জীবন দুঃসহ মনে হল। পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। আত্মহত্যা কাপুরুষতার পরিচায়ক—এ কথা আমি অনেকবার পড়েছি, শুনেওছি। আস্তে আস্তে আমার মনে হ'ল, যে পথে আমি অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার তখন মনে পড়ল মহাপ্রাবারণার দিন মহাস্থবির সংঘবর্ধনের সেই উপদেশের কথা।

এমনি করে কয়েক মাস কেটে গেল। শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, একদিন যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, আজ তাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

চার

ভদ্রাকে জোর করে অন্তঃপুরে পাঠানোর কথা শুনে আমার মন একবারের জন্য বিচলিত হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমার জীবনে সে এসেছিল ক্ষণপ্রভার মতো। একবার মাত্র চমক দিয়ে মিলিয়ে গেল। তার মনে আমার কোনো স্মৃতি রইল না, আমার মনেও তার কোনো স্মৃতি রইল না—এ কথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। কাশ্মীরের রাজধানীতে গিয়েও আমি তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করি নি, করলে পেতামও না।

শেষ পয়ার-বাসের পর আমি আমাদের পরিবারের সঙ্গে শৈত্যাবাসে না গিয়ে আমাদের সেই বরাবরের গ্রাম থেকে কিছুটা নিচে নেমে সুবাস্তু নদীর মুখ্য ধারা ধরে ওপরের দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের গ্রামের পূর্বদিকে যে উত্তুঙ্গ হিমশিখরমালা দেখা যেত তার অপরদিকে ছিল এক সংঘারাম। সেই সংঘারামেই থাকতেন আমার কাকা জিনবর্মা। আমার বাবাও আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনদিন পরে আমরা সংঘারামে পৌঁছুলাম। কাকাকে আমরা খবর দিয়ে আসি নি। তাই যখন তিনি জানতে পারলেন, আমি সংঘারামে এসেছি প্রব্রজ্যার (ভিক্ষু হবার) জন্য তখন তিনি যেমন আশ্চর্য হলেন, তেমনই খুশি হলেন।

উদ্যানের যে জায়গায় এই সংঘারাম, সে জায়গাটি ভারি সুন্দর। জায়গাটার নাম সুভূমি। লোকে বলে, এই সুভূমি দেবতারা নিজেদের হাতে সমতল করেছেন। সুবাস্তু নদীর উৎস এখান থেকে প্রায় এক দিনের পথ। পয়ারে এমন ভূমি খুব দুর্লভ নয়, কিন্তু সুবাস্তুর উৎসর কাছে এ রকম ভূমি সত্যিই দেখা যায় না। সুভূমি বিহারে শীতের সময় ভিক্ষুদের সংখ্যা কমত না, বরং বেড়েই যেত। শীত থাকলেও তা নিবারণের ব্যবস্থাও ছিল। ভিক্ষুরা তখন মোটা পশমের চীবর পরতেন, গায়ে দিতেন চামড়ার পোশাক। পায়ে থাকত চামড়ার মোজা আর চপ্পল। বাইরে বেরুনোর সময় মাথায় দিতেন পোস্তীনের কণ্টোপ (কান-ঢাকা টুপি)। খাদ্যের জন্য অবশ্য সঞ্চিত সামগ্রীর ওপরই নির্ভর করতে হ'ত—শুকনো শাক আর মাংস। সংঘারামের উত্তরে আর দক্ষিণে ছিল অনেক ফলের বাগান। এই ফলের বাগানের জন্য বর্ষাকালে সুভূমিকে দ্রাক্ষাভূমিও বলা হ'ত। এখানকার সোনালী দ্রাক্ষা কপিশার দ্রাক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। লোকে বলে, ধর্মরাজ অশোকের সময় সংঘ

যখন মহাকাশ্যপ স্থবিরকে হেমবতে ধর্মপ্রচারের জন্ত পাঠিয়েছিলেন সেই সময় সুভূমিতে তিনি দ্রাক্ষা খেয়ে তার বীজ পুঁতে দিয়েছিলেন। তারই সন্তান-সন্ততিরা আজ উদ্যানভূমি ছেয়ে আছে।

সুভূমি বিহারের সৌন্দর্য ছিল অদ্বিতীয়। আমার এই সত্তর বছর বয়সে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর বিহার দেখেছি, কিন্তু সুভূমির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর জলবায়ু কোথাও দেখি নি। শীতকালে সেখানে কোনো প্রাণীর চিহ্ন দেখা যেত না, তাদের শব্দও শোনা যেত না। সংঘারামনিবাসী ভিক্ষুরা কেবল নিজেদের গলার আওয়াজই শুনতে পেতেন। রোদ্দুর অবশ্য হ'ত, কিন্তু এত নয় যে, সত্ত-পড়া বরফ গলাতে পারে। রোদ্দুর পোহাবার জন্ত আমরা বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতাম। সাদা চাদরের মতো বরফের ওপব কখনও হেঁটে বেড়াতাম, কখনও বা বসতাম। বরফের ওপব রোদ্দুর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিত। তাই আমরা চোখের সামনে কণ্টোপের ভেতব থেকে দেবদারুর পাতা ঝুলিয়ে দিতাম। আমাদের অনধ্যায়ের দিনগুলি এমনি করে একদিক থেকে আর-একদিকের পাহাড়ের মধ্যে শেষ হয়ে যেত। নবতরুণ ভিক্ষু আর শ্রামণেরদের এমনি করেই ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া হ'ত।

আমাদের সংঘারামে সব সময়ই তিন শ ভিক্ষু থাকতেন। শীতকালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াত চার শ'য়ে। আমার কাকা ভদন্ত জিনবর্মা মস্ত বড় বিদ্বান্ ছিলেন। কিন্তু মহাস্থবির সংঘবর্ধনের পর এই বিহারের মহাস্থবির হয়েছিলেন গুণবর্ধন। গুণবর্ধনের বিদ্যার খ্যাতি উদ্যানেব সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও গিয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল কম্বোজে। বিদ্যাধ্যয়নের জন্য তিনি এসেছিলেন মহাস্থবির সংঘবর্ধনের কাছে। অধ্যয়নের পর তিনি মধ্যমণ্ডলের পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করার জন্য যাত্রা করেছিলেন এবং কলিঙ্গের দন্তপুরে গিয়ে তথাগতর দন্তধাতু দর্শন করেছিলেন। তারপর কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন সিংহলের মহাবিহারে। বস্তুত, তথাগতর ধর্মের সকল নিকায় (সম্প্রদায়)-এ দর্শনশাস্ত্রের এত বড় বিদ্বান্ দুর্লভ ছিল। লোকে তাঁকে বলত অর্হৎ (মুক্ত পুরুষ)। মহাস্থবির গুণবর্ধন ছিলেন শীল, সমাধি আর প্রজ্ঞা—এই ত্রিগুণসম্পন্ন। ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো কঠোর বাক্য বলা দূরের কথা, তাঁর ললাটে কখনও আমি সামান্ত কুঞ্চন-রেখাও দেখি নি। সব সময় তাঁর মুখে স্মিত হাসি লেগেই থাকত।

সুভূমি বিহার অনেক পুরনো। সাত-আট শ বছরের পুরনো হওয়াও অসম্ভব নয়। অন্যান্ত বিহারের চেয়ে এর গঠনও আলাদা। নায়ক-মহাস্থবির

আর অনেক বিদ্যাবয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু এই মূল বিহারে থাকতেন। আমার কাকাও থাকতেন এই বিহারে। আমি তাঁর অন্তবাসী (শিষ্য), তাই আমিও তাঁর পাশে স্থান পেলাম।

আমি যেদিন সুভূমি বিহারে এসে পেঁছুলাম সেইদিনই প্রথম বরফ পড়ল। ছদিন পরেই আমার প্রব্রজ্যার দিন ঠিক হ'ল। প্রব্রজ্যাব দিন সকালে এক ভিক্ষু এসে আমার সোনালী রঙের লম্বা চুলগুলি মুণ্ডন করে দিয়ে গেলেন, ভ্রূও বাদ দিলেন না। গালে দাড়িগোঁফের হাল্কা চিহ্ন দেখা দিয়েছিল, তা-ও পরিষ্কাব করে দিলেন। আমার মা আমার জন্য নিজের হাতে পশমেব জামা তৈরি করে দিয়েছিলেন, বিহারে পেঁছুতেই কয়েকজন ভিক্ষু মিলে সেই জামাটি কেটে টুকরো টুকবো করে ফেললেন। তারপব কী একটা গাছেব ছালের অরুণ-রঙে রাঙিয়ে ধানের কেয়ারির মতো সেটা সেলাই করে নিলেন। নিচে অপেক্ষাকৃত কম বহবের অন্তর্বাস, তার ওপর ডান হাত উন্মুক্ত রেখে ফতুয়ার মতো অংসকূট এবং তার ওপর অনেক লম্বা-চওড়া চীবব পবালেন। বাঁ কাঁধের ওপর দু ভাঁজ করে চীবর বা সংঘাটী দিলেন, কোমরে বাঁধলেন কোমরবন্ধ। আমার লোহার ভিক্ষাপাত্রটি ভদন্ত জিনবর্মা আগেই তৈবি কবিয়ে রেখেছিলেন।

আমি মহাচৈত্যেব ছায়ায় প্রবেশ কবলাম। ডান দিকে মহাস্থবির গুণবর্ধন আর বাঁ দিকে একটু নিচে ভদন্ত জিনবর্মা বসে আছেন। ভদন্ত জিনবর্মার সামনে আমি পঞ্চাঙ্গে অভিবাদন কবে হাঁটু গেড়ে বসলাম। প্রার্থনা করলাম প্রব্রজ্যা। তিনি বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ—এই তিনের শবণবাক্য বলে আমাকে শরণাগত করলেন। তাবপব প্রাণিহিংসাদি দশটি নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত হবার ব্রত দিলেন। উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলী আর উপাসকেরা বলে উঠলেন—সাধু, সাধু। তাদেব মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন। এমনি করে শুরু হ'ল আমার নতুন জীবন।

এখন আমাব নতুন নাম হ'ল শ্রামণের নরেন্দ্রযশ। কুড়ি বছর বয়স হতে তখনও আমাব দু বছর বাকি, তাই আমি উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু হতে পারলাম না। আমার শৈশবের বন্ধুরা সাত-আট বছর বয়স থেকেই শ্রামণের হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজন ছিল সুভূমি বিহারে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তারা সব সময় বিহারের বিদ্বান্ ভিক্ষুদের সঙ্গে সঙ্গে

থাকত। যদিও ব্যাকরণ, কোষ আর কাব্যশাস্ত্রে আমি তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলাম না, সূত্র আর বিনয়ে তারা আমার থেকে এগিয়ে ছিল। প্রথম দিনই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, সমবয়স্কদের মধ্যে কোনো বিষয়ে আমি পেছনে থাকব না।

সত্যিই কি আমি নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম? নতুন সমাজে গিয়ে সবাই তো নতুন মানুষই হয়। ভদন্ত জিনবর্মা গত দশ বছর ধরে আমাকে শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। একমাত্র তাঁরই কৃপায় এক অক্ষর জ্ঞানহীন গেঁয়ো হয়ে আমি এই সুভূমি বিহারে আসি নি। যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করেই আমি এই বিহারে এসেছি। আগে আমি বছরে চার-পাঁচ মাস মাত্র পড়াশোনা করতাম, এখন বারো মাসই বিদ্যার নদীতে ডুবে থাকতে হয়। পরে আমি দেখেছিলাম, বিহারবাসী অনেক ভিক্ষু কোন বিষয়ে বেশি পরিশ্রম করতে চাইতেন না। তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের তো সারা জীবনটাই পড়ে আছে, সুতরাং তাড়াতাড়ির কী দরকার? অন্য বিদ্যার্থীরা পূর্বাহ্ণে কিংবা উত্তরাহ্ণে একবারই মাত্র পাঠ নিতেন। কিন্তু শ্রামণের হবার কয়েক সপ্তাহ পরে দুবেলাই আমি পাঠ নিতে শুরু করলাম। কেবল সূত্র আর বিনয়শাস্ত্র অধ্যয়নই চলল ছ মাস পর্যন্ত। তারপর প্রমাণশাস্ত্রের মহিমা শুনে সেই শাস্ত্র অধ্যয়নেও আমার ইচ্ছা হ'ল। আমাদের গান্ধারের বসুবন্ধু এবং তাঁর শিষ্য দক্ষিণাপথজন্মা দিগ্‌নাগের গ্রন্থাবলীর তখন খুব খ্যাতি ছিল। দিগ্‌নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়'এর প্রায় এক শ শ্লোক কয়েক সপ্তাহেরই মধ্যেই মুখস্থ করে ফেললাম। মাতৃচেটের 'অধ্যর্ধশতক' ছিল শ্রামণেরদের পাঠ্য পুস্তিকা। গ্রন্থটিতে তথাগতর প্রশস্তির আকারে কবি মাতৃচেট দেড় শ শ্লোকে সমগ্র বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তগুলির সার লিপিবদ্ধ করেছেন। এটিকে তথাগতর দেশনা কিংবা ত্রিপিটকের সার বলা হয়। মাতৃচেটের এই গ্রন্থ আমার কয়েক বছর আগে থেকেই মুখস্থ ছিল, সেজন্য প্রমাণশাস্ত্রে প্রবেশ করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল।

দু বছর সময় কত তাড়াতাড়িই না চলে গেল। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায় তা বোঝা যায় না। এই দু বছরের চব্বিশটি মাসের প্রতিটি দিনকে আমি কাজের মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। আচার্যের কাছ থেকে যখন আমি জানতে পারলাম যে, আঠার-কুড়ি বছর বয়েসেই দিগ্‌নাগ এবং অন্য বিদ্বানেরা অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন তখন নিজের জন্যে আমার ভারি গ্লানি বোধ হতে লাগল। সাত-আট বছর বয়েসে শ্রামণের না হবার

ফল আমার পক্ষে মোটেই ভালো হয় নি। আমি তো শুধু সহপাঠীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে চাই নি, আমি চেয়েছিলাম বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ এবং অন্যান্য আচার্যের সমান জ্ঞানী হতে। সে খেদ আজও আমার রয়ে গেছে। ভিত যদি শক্ত হ'ত তাহলে যে স্মরণশক্তি আর বুদ্ধি আমি লাভ করেছিলাম তা দিয়েই আরও এগিয়ে যেতে পারতাম।

৫৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। আমার বয়স তখন কুড়ি বছব হয়ে গিয়েছে। বর্ষাব প্রথম মাস। বর্ষাকালে ভিক্ষুদের যাত্রা কবা নিষেধ। শাস্ত্রে এই তিন মাস তাঁদের এক জায়গায় সাংঘিক জীবন যাপন করে পরস্পবকে সাহায্য করে নিজেদের শীল, সমাধি আর প্রজ্ঞার বল বৃদ্ধি কবতে বলা হয়েছে। বর্ষোপনায়িকা (আষাঢ় পূর্ণিমা)-র মহিমা আমাদের উদ্যানের সেই মহাপ্রাবারণা (আশ্বিন পূর্ণিমা)-রই মতো। সেদিন থেকে ভিক্ষুসংঘেব বর্ষাবাস শুরু হয়।

শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষের প্রথম তিথি এল। সেদিন অনেক শ্রামণেরকে উপসম্পন্ন করা হ'ল। আমিও তাদেব মধ্যে ছিলাম। সকালে উঠেই আমাদের কাষায়বস্ত্র খুলে উদ্যানের রাজকুমারের মতো পোশাক পবানো হ'ল। সেইরকম চোগা আর সুথন আগে থেকেই তৈরি ছিল। সেগুলি আমাদের প্রত্যেককে পরানো হ'ল। মাথায় দেওয়া হ'ল স্বর্ণখচিত এক-একটা মুকুট। কোমরেব পাশে ঝোলানো হ'ল তলোয়ার। তাবপব উদ্যানের ভালো ভালো সাদা রঙের ঘোড়ায় বসিয়ে আমাদের নিয়ে শোভাযাত্রা বাব করে সাবা সুভূমি প্রদেশ প্রদক্ষিণ কবা হ'ল। শোভাযাত্রার পুবোভাগে বেণু, পটহ (ঢাক) আর অন্যান্য সব বাজনা ছিল। মাঝে মাঝে শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে পড়ছিল আর সমস্ত নরনারী আনন্দে আত্মহারা হযে নাচছিল। লোকেরা আমাদের ওপর মরসুমী ফুলেব বৃষ্টি করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, রাজকুমাররা বিয়ে করতে চলেছে। চিরদিনের জন্য গার্হস্থ্যজীবন ছাডতে হবে, তাই বোধহয় শেষবারের মতো তার পুরো ঝলক দেখানো আব তার আনন্দ নেবার জন্যে এমন শোভাযাত্রার ব্যবস্থা!

মূল বিহারের মহাচৈত্যের সামনে এসে আমরা ঘোডা থেকে নেমে পডলাম। তলোয়ারগুলি আগেই খুলে নেওয়া হয়েছিল। তারপব বিহারে প্রবেশ করার পর আমাদের একটা প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আমাদের ভিক্ষুর চীবর পরতে দেওয়া হ'ল।

মূল বিহারের উপোসথাগার ছিল বিশাল। সেখানে পাঁচ শ ভিক্ষু অনায়াসে পাঁচ পংক্তিতে বসতে পারতেন। সেই উপোসথশালায় আমাদের একে একে আনা হ'ল। আমিই ছিলাম সবার প্রথম। ওপরের দিকে ছিল বিশিষ্ট আসন —ধর্মাসন। আমি যাবার আগে থেকেই এই ধর্মাসনে বসেছিলেন মহাস্থবির গুণবর্ধন। আর উপস্থিত ছিলেন তিনটি পংক্তিতে প্রায় তিন শ ভিক্ষু। তাঁরা বসেছিলেন তাঁদের ভিক্ষু-আয়ু অনুসারে।

নিস্তব্ধ উপোসথশালা। বাইরে উপোসথশালার দ্বারে শত শত নরনারী নীরবে দাঁড়িয়ে। এমন নীরবতা এখানে কেবল শীতের সময়েই দেখা যায়। দুজন ভিক্ষু আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কী করতে হবে তা আমাকে আগেই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু যাতে কোনো বিষয়ে ব্যতিক্রম না হয় তাই তাঁরা আমাকে সব আবার বলে দিলেন। ধর্মাসনে উপবিষ্ট স্থবির গুণবর্ধনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পঞ্চাঙ্গে অভিবাদন করে আমি সংঘের কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করলাম।

প্রশ্ন হ'ল: কুড়ি বছর বয়েস তোমার পূর্ণ হয়েছে? মা-বাবা ভিক্ষু হবার, জন্যে তোমাকে অনুজ্ঞা দিয়েছেন? কোনো সাংঘাতিক কিংবা পৈতৃক মহারোগ তো তোমার নেই?

এমনই সব প্রশ্ন করা হ'ল, যেমন অন্য দেশের ভিক্ষু সংঘে উপসম্পদা দেবার সময় করা হয়। আমার উপাধ্যায় হলেন মহাস্থবির গুণবর্ধন আর আচার্য ভদন্ত জিনবর্মা। উপসম্পন্ন হয়ে এখন আমি ভিক্ষুসংঘের এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গেলাম। শ্রামণেরদের মতো অপেক্ষার্থী নয়, পুরোহিত ভিক্ষু।

শ্রামণের হবার পর আমার নব জীবন শুরু হয়েছিল, একথা আমি স্বীকার করব, কিন্তু ভিক্ষু হবার পর যে সম্পূর্ণ নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছিল তা আমার মোটেই মনে হয় নি। তফাত শুধু এই যে, এখন আমি ভিক্ষু আর স্থবিরদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারব, একসঙ্গে আহার করতে পারব। উপোসথশালায় প্রতিপক্ষের উপোসথকর্মের সময় একত্র হয়ে ভিক্ষুমণ্ডলীতে যোগ দিতেও পারব। কোনো ক্ষুদ্র অপরাধ কিংবা সাংঘিক সম্পত্তির ব্যাপারে সংঘ যখন নির্ণয় (বিচার) করবে তখন আমারও ছন্দ (রায়) দেবার অধিকার হ'ল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এখন আমি তথাগতর দ্বারা সংস্থাপিত হাজার বছর থেকে চলে আসা এই পবিত্র ভিক্ষু-সংঘের একজন সদস্য। তাই এখন আমার মূল্য এবং মান আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে।

সুভূমি বিহারের অনুশাসন খুব কড়া। কঠিন অনুশাসন পালন করতে অসমর্থ ভিক্ষুরা এখানে আসতে সাহসই করতেন না। বিনয়ের নিয়মাবলী এখানে কঠোরভাবে পালন করা হ'ত, ঠিক যেমনটি তথাগত তাঁর বিনযপিটকে বলেছেন। এখানকার ভিক্ষুরা সোনারূপা স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। মূল বিহারে এমন ভিক্ষুও ছিলেন, যাঁরা নতুন চীবর পরতেন না। তাঁদের দেখে আমারও ইচ্ছে হ'ত, আমি এমনই জীবনই যাপন করব। নিমন্ত্রণ স্বীকার না করে সর্বদা ভিক্ষাপাত্র সম্বল করব, পয়সাকড়ি স্পর্শ করব না। কিন্তু যখন অবাধ গতিতে আমার পর্যটক-জীবন আরম্ভ হ'ল তখন মনে হ'ল, সব নিয়ম পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আমি যথাশক্তি সব পালন করতে চেষ্টা করতাম। ভিক্ষু হবার পরেও আমার অধ্যয়ন অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলতে লাগল। কেননা, ভিক্ষু হবার পর চার বছর পর্যন্ত উপাধ্যায় আর আচার্যের আশ্রয়ে থাকার নিয়ম। কিন্তু বাইশ বছর বয়সের পর আমার পা দুটোকে আটকে রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। তথাগতর জন্মভূমি দেখার জন্যে সে সময় অন্যান্য সব ভক্তের মতো আমারও ইচ্ছা তীব্র হ'ল।

মহাস্থবির গুণবর্ধন তথাগতর জন্মভূমিতে গরমের সময়ও থেকেছেন। তাঁর কষ্টও হয়েছে খুব। তখন তিনি বিহারের ভেতর জানালা-দরজা বন্ধ করে সারাটা দিন থাকতেন। তবু তাঁর সারা শরীরে ফোস্কা পড়েছিল। দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেখানে ফুল থাকে, সেখানে কাঁটাও থাকে।

কেউ যখন প্রথম যাত্রা করার জন্যে পা বাড়ায় তখন কি সে জানতে পারে, কোথায় সেই যাত্রার শেষ হবে। সুভূমি বিহারের শেষ বছরে আমি জানতাম, আমাকে তথাগতর জন্মভূমি দর্শন করতে হবে। অবদান আর জাতকের প্রভাব আমাকে এই প্রেরণাও দিয়েছিল যে, বোধিসত্ত্বর মতো আমিও আমার জীবনকে অন্য প্রাণীর দুঃখ লাঘব করার জন্য লাগাব। মানুষের বড় বড় কষ্টের মধ্যে রোগকষ্ট হ'ল একটি। শুধু মুখের কথায় রোগ-পীড়িত মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। ওষুধপত্রেরও প্রয়োজন হয়। 'বিনয়পিটক'এর ভৈষজ্য-স্কন্ধক পড়ার সময় আমি দেখেছি, তথাগত শুধু মনের চিকিৎসার নয়, শারীরিক চিকিৎসারও ভিষক্‌ ছিলেন। আমাদের এক বিহারের প্রতিমাগৃহে ভৈষজ্যগুরুরূপে তথাগতর প্রতিমা স্থাপিত ছিল এবং মূর্তিটির হাতে ঔষধির প্রতীক হিসাবে ছিল হরীতকী। অন্যদেশের ভিক্ষুদের কাছ থেকে আমি জেনেছিলাম যে, সব দেশের ভিক্ষুরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পথে-

প্রবাসে চিকিৎসাবিদ্যা সবচেয়ে বড় সম্বল। ভাষা কিংবা রীতিনীতি না-জানা কোনো দেশে গেলে চিকিৎসার জ্ঞান পাথেয়র কাজ করে। সেজন্য আমাদের বিহারে বহু ভিক্ষু বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসাগ্রন্থ পড়তেন, নিজেদের হাতে ঔষধি তৈরি করার বিধিপত্র শিখতেন।

সুভূমিতে চার বছরের বাস আমার শেষ হয়ে আসছিল। তৃতীয় বছরের মধ্যভাগে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি আমার স্পষ্ট মনে হতে লাগল, বর্তমান বিহারে এই আমার শেষ হেমন্তবাস। তাই শেষের ছ মাস আমি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে মূল বিহার থেকে সুভূমির অন্য এক বিহারে যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। সে বিহারে থাকতেন উদ্যানের এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যভিক্ষু। তাঁকে আমি বললাম, নিয়মমতো সারা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চারিকা-করা (পরিব্রাজক) ভিক্ষুর পক্ষে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে চাই আমি। আর তা-ও আমার আচার্য আর উপাধ্যায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে। কারণ, তাঁরা মোটেই চান না যে, আমি অধ্যয়নের সময় চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে লাগাই।

বৈদ্যভিক্ষু দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছেন। এখন বয়োবৃদ্ধির জন্যে চারিকা করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আমার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন। আর তাই যেসব রোগ সাধারণত বেশি হয় সেইসব রোগ চেনার লক্ষণগুলি বলে দিলেন, উপচার আর ঔষধিও শেখালেন। সব জায়গায় তো আর সবরকম গাছগাছড়া পাওয়া যায় না, তাই তিনি উদ্যানের গাছগাছড়ার সঙ্গে পরিচয় করানোর সময় জম্বুদ্বীপ আর কাংসদেশের নানা রকম ঔষধি সম্বন্ধেও আমায় বলে দিলেন। এইভাবে শেষ বছরের শেষ সময়ে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছিলাম তা বড় কম ছিল না।

পাঁচ

আমার তখন তেইশ বছর বয়েস হয়ে গিয়েছে। আমার শিক্ষার জন্য উত্থানে কোনো যোগ্য গুরু ছিলেন না, একথা আমি বলব না, কিন্তু সরোবর যতই বড় হোক, তার কি সমুদ্রের মত আকর্ষণ থাকে? আমাদের উত্থানে যেসব বড় বড বিদ্বান ছিলেন, তাঁদেব সকলেই বিদ্যাধ্যয়নের জন্যে বহুকাল মধ্যমণ্ডলে কাটিয়েছেন। কিংবদন্তী আছে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ কপিশা, গান্ধাব আর কাশ্মীর তথাগতর চরণধূলির স্পর্শে পুণ্য হয়েছে। কিন্তু বিনয় আব সুত্রপিটকে এমন কোনো কথা নেই, যাতে মনে হয় ভগবান তথাগত মধ্যমণ্ডলেব বাইরে কখনও বিহাব করেছেন। যাই হোক, আমাদের উত্থানের ভিক্ষুদের কাছে মহাপণ্ডিত বিনয়ধর আর লক্ষণশাস্ত্রীর জন্য প্রসিদ্ধ গান্ধাব-কাশ্মীর নিজেদের ঘরবাড়ির মতোই মনে হ'ত। ছেলেবেলায় মা'র সঙ্গে একবার আমি গান্ধার-রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) গিয়েছিলাম। সেটা ছেলেবেলাকারই কথা, সে সময় আমার জ্ঞান ছিল পবিমিত। তাই পুণ্য-নগবী দর্শনে যে আনন্দ সাধারণত পাওয়া যায় তা আমি পাই নি। এখন আবাব আমার নতুন কবে গান্ধার দেখার ইচ্ছে হ'ল। গান্ধারের আগে কপিশা যাব ঠিক কবলাম।

আমবা অতি-শীতেব দেশের লোক। গরম দেশের কথা শুনলেই আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। সেখানে কালো কালো অনেক সাপ আছে। তাদেব ছোঁয়া লাগলেই নাকি প্রাণ বেরিয়ে যায়। তাছাড়া সেখানে মশা, বিছা আব ভয়ানক ভয়ানক সব জন্তু আছে। গরমের সময় সেখানে গেলে খুব কম লোকই ফিরে আসতে পারে।—এমনই অনেক কথাই আমি শুনেছিলাম। কিন্তু আমাব আচার্য বছরের পর বছর মধ্যমণ্ডলের অত্যন্ত গরম জায়গায় থেকে এসেছেন। তাই আমি ভাবলাম, তিনি যখন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন তখন আমি তাঁর শিষ্য হয়ে পদে পদে মৃত্যুর ছায়া দেখব কেন?

এটা বসন্তকাল। এর পরই আসবে গ্রীষ্ম। মধ্যমণ্ডলের দিকে গেলে শীতকালেই যাত্রা করতাম। কিন্তু কপিশা ঠাণ্ডা আর পাহাড়ী জায়গা। অবশ্য আমাদের গ্রামের মতো ঠাণ্ডা নয়। তবু ঠাণ্ডাই বলতে হবে। বিহার থেকে বেরিয়ে একটা বড় আর দুটো ছোট ছোট মাঠ পেরিয়ে আমবা চলে এলাম সুবাস্তনদীর সহোদরা কুনারনদীব তীবে। কুনার বেশ বড নদী। তার উপত্যকা সবুজে ভরা। আমাদের সঙ্গে ছিল তীর্থযাত্রীদের এক মণ্ডলী।

আমার কিন্তু চার-পাঁচজনের বেশি সহযাত্রী পছন্দ ছিল না—আর তা-ও গৃহস্থ উপাসকদের নয়। উপাসকদের ঘরবাড়ি থাকে, পুত্রপৌত্র থাকে। তাদের সব কাজেই তাড়াতাড়ি। তারা তাডাতাড়ি তীর্থ সেরে বাড়ি ফিরতে চায়। আমরা ভিক্ষুরা হলাম নির্দ্বন্দ্ব, আমাদের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। যেখানে ইচ্ছে দু-চার দিন কিংবা দু-চার মাসই থেকে গেলাম। বস্তী কিংবা নগরেই শুধু নয়, পশুপালদের আস্তানায় কিংবা মহাবনেও আমরা থাকতে পারি। জন্মভূমি আমার মনে নদনদী, দেবদারু আর চিরহরিৎ গাছে ঢাকা গিরিমালার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

মানুষের বাল্যস্মৃতি সবচেয়ে মধুর। তার শিশু-চোখ সে সময় যে সৌন্দর্য ও সুষমার প্রতি আকৃষ্ট হয় তা সারা জীবনের জন্য থেকে যায়। পুরনো স্মৃতি তাকে সেই পুরনো দিনেই নিয়ে যেতে চায়। কুনারের তট, বিশেষ করে তার ওপরের দিকটা আমার চোখে বড় রমণীয় মনে হ'ল। দু-তিন দিন পর আমরা এই কুনারের তীরবর্তী এক নগরে এসে পৌঁছুলাম। কোন একটা বড় গ্রাম, যেখানে পাঁচ-দশটা দোকান আছে, ভালো একটা বিহার আছে আর আছে ছোটখাটো একজন রাজা, তাকেই আমাদের এখানকার লোকেরা নগর বলে। নগরহারের কাছে এ নগর কিছুই নয়। কিন্তু আমি তো এখনও পর্যন্ত বড় নগর দেখিই নি। আমাদের সহযাত্রীরা, বিশেষ করে উপাসিকারা তো নগরটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। উপাসক আর উপাসিকাদের সঙ্গে যাওয়ার একটা লাভ অবশ্যই ছিল—ভিক্ষার জন্যে আমাদের কষ্ট করতে হ'ত না। সূর্যোদয় হলেই লঘু আহার, যা আমাদের একাহারী ভিক্ষুদের পক্ষে পূর্ণ আহার, তা পাওয়া যেত। তারপরেই আমাদের মণ্ডলী রওনা হ'ত। নদীর নিচের দিকে যতই এগিয়ে চলেছি ততই গরম লাগছে। এখানকার এই বসন্তের গরম সহ্য করা গেলেও আমরা কেবল সকালে আর সন্ধ্যায় পথ চলতাম। অশ্মরের সুন্দর এক গ্রাম নদীর বাঁ তীরে অবস্থিত। সেখান থেকে আগে গিয়ে আরও গরম লাগতে লাগল। কুনারও এক বেশ সুন্দর গ্রাম। নদী আর গ্রাম, দুইয়ের নাম কুনার। হয়তো গ্রামের নাম থেকেই নদীর নাম হয়েছে। সুবাস্তুও নদী আর প্রদেশ দুইয়েরই নাম। নগরহার পর্যন্ত আমরা এমনি করে গরমের মধ্যে দিয়ে আর-এক গরমের দেশে গিয়ে পড়লাম। নগরহার পৌঁছুনোর অনেক আগেই পাহাড় খালি হয়ে গেছে, তার শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। বৃক্ষ-বনস্পতি ছাড়া যে কোনো পাহাড় হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমার সঙ্গীরা নগরহারে নগরের

বিশালতা, তার বিভিন্ন রকমের পণ্যে সুসজ্জিত দোকান আর সোনা দিয়ে মোড়া বিহার আর প্রতিমাগৃহের ছাদ দেখে কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে গেল। আর আমি ক্ষুণ্ণ হলাম পাহাড়ের নগ্নরূপ দেখে। তবে পাহাড়টির গায়ে নালা কেটে চাষ-আবাদ আর বাগান করা হয়েছে অনেক। আমাদের ওখানকার চেয়েও ভালো ফল হয় এখানে। খুব ভালো জাতের ধানও হয়। আমরা যদি অতি-শীতের দেশের লোক না হতাম তাহলে এখানকার জলবায়ুকে সুখদ বলতে পারতাম। এখানকার লোকেরা শান্ত স্বভাবের। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, দরকার হলে তারা জীবন পণ করতে প্রস্তুত নয়। বিদ্যা আর শিল্পের প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মান কাকে বলে তা আমি প্রথম এখানেই দেখলাম।

নগরহার (জালালাবাদ) পুরুষপুরের মতো পুণ্যস্থান। এখানকার বিহার, চৈত্য আর প্রতিমাগৃহ পুরুষপুরের মতো বিশাল আর সম্পদশালী না হলেও তথাগতের ব্যবহৃত কত পবিত্র জিনিসই না এখানে আছে। সেই পুরুষোত্তম যখন তাঁর উপদেশাবলী দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে কৃতার্থ করে বিচরণ করছিলেন তখন কোটি কোটি লোক তাঁকে দর্শন করেছে, তাঁর মধুর বাণী শুনে তৃপ্তিলাভ করেছে। কিন্তু সে তো হাজার বছর আগেকার কথা। তবু সেই মহাপুরুষকে দর্শন করার জন্য আমার দুটি চোখ আজও তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে, তাঁর জীবন-দায়িনী দেশনা শোনার জন্যে আজও আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি। দেশনার যে আনন্দ তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তথাগতের সূক্তিগুলি পড়ে। নগরহারে ভগবান তথাগতের গ্রীবা-অস্থি রক্ষিত আছে। তিন আঙুল লম্বা, আড়াই আঙুল মোটা, পীতাভ—দেখতে মধুচ্ছত্রের মতো। এই সেই পুণ্যাস্থি, যা একসময় তথাগতর শরীরের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। যে বিহারে ভগবানের সংঘাটি আছে সেই বিহারও আমরা দেখেছি। গৃহস্থদের ওপর ভগবান কোনো ভার চাপাতে চান নি। তাই তিনি বলেছিলেন, ভিক্ষুরা শুধু নতুন বসনই পরবেন না, রাস্তায় ফেলে দেওয়া ন্যাকড়া দিয়েও লজ্জা নিবারণ করবেন। ছেঁড়া ন্যাকড়া আর নতুন কাপড়ের সংঘাটিতে যাতে সমতা থাকে সেজন্যে তিনি যেমন সেগুলিকে কষায় দিয়ে রাঙানোর বিধান দিয়েছেন তেমনি ধানের কেয়ারি দেখিয়ে বলেছেন, তোমাদের চীবর এমন হওয়া উচিত। তাই নতুন কাপড় কেটে টুকরো টুকরো করে কেয়ারির মতো করে চীবর তৈরি করা হয়। তথাগতর এই সংঘাটিও তেরো খণ্ড কাপড় জুড়ে তৈরি, চারদিকে দশা (ফিতা) লাগানো। সংঘাটি ছাড়া ভগবানের খক্করদণ্ডও আছে এখানে। একদিন এই দণ্ড তাঁর

হাতে থাকত, তাঁকে চলে বেড়াতে সাহায্য করত। আর আজ তা নিরাশ্রয় হয়ে এখানে পড়ে আছে। এ রকম পবিত্র জিনিসের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অতিরঞ্জিত হয়েই দেখা দেয়। এখানেও তাই হয়েছে। দণ্ডটি একটি স্বর্ণমণ্ডিত কাষ্ঠাধারে রাখা আছে। শোনা যায়, শত শত লোক মিলে চেষ্টা করেও এই দণ্ডটি ওঠাতে পারে না, আবার এক-এক সময় সাধারণ বালকও নাকি ওঠাতে পারে। এক বিহারে ভগবানের দাঁত আর চুলও রক্ষিত আছে। সকাল-সন্ধ্যায় এই সব পবিত্র ধাতুর (অস্থি, দন্ত ইত্যাদি) পূজো হয়। কেবল পূজোর সময়ই লোকে সেগুলি দর্শন করতে পারে। ধর্মের ব্যাপারী যারা, তারা লোকের এই শ্রদ্ধার সুযোগ নেয় এবং তাদের ঠকায়। আর তাই সব শোনা-কথায় বিশ্বাস করা আমার মতো শ্রদ্ধাবান্ লোকের পক্ষেও কঠিন। বিশেষ করে চুলের ব্যাপারে তো আমার সন্দেহ আছেই। কারণ, আমার দীর্ঘকালের অধ্যয়নে আমি কখনও কোথাও দেখি নি যে, ভগবান তথাগত তাঁর চুল কাটিয়েছেন। ভিক্ষুবেশ ধারণ করার সময়ই তিনি তাঁর তলোয়ার দিয়ে নিজের চুল কেটেছিলেন। দেবেন্দ্র শক্র (ইন্দ্র) সেই চুল দেবলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুশীনারায় যখন ভগবান তথাগতের দেহ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁর দেহভস্ম আর অস্থির অবশেষ একত্র করে ভাগ করা হয়েছিল। তাই কোথাও চুলের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। মাথার চুল সেই আগুনে পুড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, চারদিকে যখন শ্রদ্ধাবান্‌দের মূঢ়মণ্ডলী দাঁড়িয়ে আছে তখন এই সব বুদ্ধিবাক্য বলা বৃথা।

আমাদের মণ্ডলী তিন-চারদিন নগরহারে থাকবে শুনে আমি খুশি হলাম। কোথাও বিহার থাকলে ভিক্ষুরা উপাসকদের উপাশ্রয়, অতিথিগৃহ কিংবা অন্য কোনো জায়গায় রেখে বিহারে চলে যেতেন। আমাদের এখানে এই-ই ছিল শিষ্টাচার। নগরহারের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ আছেন দেখে আমার ইচ্ছে হ'ল এই সুযোগে তাঁদের কাছ থেকে কিছু শিখে নিই। কেননা, নগরহার তো উদ্যানের আঙিনার মতো, যখন ইচ্ছে আসা যায়। আমার অবশ্য এখনও অনেক দেশ দেখা বাকি। আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে নগরহারের নায়ক স্থবির আমার প্রতি প্রসন্ন হতেন। আমি যদি তাঁর কাছে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতাম তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আহ্বান জানাতেন। দু-একদিন আমি মনে মনে দোলায়মান অবস্থায় রইলাম। তারপর স্থির করে ফেললাম যে, না, মধ্যমণ্ডল ছাড়া অন্য কোথাও থাকা হবে না।

নগরহারের আশেপাশে আরও অনেক বিহার আছে। পাহাড়ের গায়ে আর তার গুহার মধ্যেও আছে কয়েকটা। এখানকার গোপগুহা দর্শন করার জন্য বহু লোক আসে। সুতরাং আমিও গেলাম। লোক বলে, তথাগত মনুষ্যলোকে বিহার করার সময় এখানে তাঁর ছায়া রেখে গেছেন। সে ছায়া নাকি আজও দেখা যায়। নগব থেকে প্রায় অর্ধেক যোজন দক্ষিণে এই গুহা। গুহার মুখ পশ্চিম দিকে। গুহা থেকে কিছু দূরে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তথাগতর কাঞ্চনবর্ণ রূপ। গুহার যত কাছে যাওয়া যায় ততই ছায়া স্পষ্ট হয়। শোনা যায়, বহু কুশলী চিত্রকার এই ছায়াব প্রতিচ্ছবি নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হন নি।

তথাগতর চন্দনের খক্করদণ্ড রক্ষিত আছে যে বিহারে সেই বিহার নগব থেকে এক যোজন উত্তর-পূর্বে উপত্যকাব মুখে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোশীর্ষ-চন্দনের তৈরি এই যষ্টি ষোল-সতেরো হাত লম্বা এক কাঠেব আধারে রাখা আছে। ভগবানের সংঘাটি আছে পশ্চিম দিকেব এক বিহারে। লোকের বিশ্বাস, অনাবৃষ্টির সময় যদি এই সংঘাটিকে শোভাযাত্রা কবে পুজো করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। ছায়া বিহার থেকে চার শ হাত পশ্চিমে গেলে সেই জায়গাটি দেখা যাবে, যেখানে তথাগত তাঁর কেশ আর নখ ছেদন করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেখানে তিনি ভবিষ্যতেব সংকেত দিয়ে সত্তর-আশী হাত উঁচু একটি স্তূপও তৈরি করিয়েছিলেন। সে স্তূপ আজও আছে। পাশে আছে হাজার হাজার ছোটবড় চৈত্য। এইসব চৈত্যে বহু অর্হতের ধাতু (অস্থি) রক্ষিত আছে।

যাই হোক, তিন-চাব দিনের মধ্যে আমরা নগরহার আর তাব আশপাশের পবিত্র স্থানগুলি সব দেখে নিলাম।

তারপরে এক যোজন দক্ষিণ-পূর্বে অস্থি নামক এক নগরে আমরা গিয়ে পৌছুলাম। এই নগরটি পাহাডের উপরিভাগে অবস্থিত। পাহাডের গায়ে দ্রাক্ষা আর উদুম্বরেব মতো মধুর ফলোদ্যান আর পুষ্করিণী থাকায় স্থানটি বড রমণীয়। উদ্যানেব মধ্যে দু-তলা উঁচু একটি ভবন আছে। সেখানে রক্ষিত আছে তথাগতর উষ্ণীষ-অস্থি। তাঁর মাথার খুলি, একটি চোখ, খক্করদণ্ড আর সংঘাটি। ধাতুগৃহের উত্তরে এক অদ্ভুত পাষাণ-স্তূপ আছে। আঙুল দিয়ে সামান্য ধাক্কা দিলেই তা নডতে থাকে।

নগরহারের আশপাশের পবিত্রস্থানগুলি দর্শন করে আমরা পশ্চিম দিকে

অগ্রসর হলাম। পাশেই কুভানদী। আমরা আগে থাকতেই জানতাম, কুভা এসেছে কপিশা থেকে। এই নদীপথের সবটা সুগম নয়। তাই আমরা ছোটবড় পাহাড়ের উপর দিয়ে কিংবা ধারে ধারে চলছিলাম। এখন যাত্রা করেছি গরমের দেশ থেকে শীতের দেশে। আশেপাশের পাহাড় সেই রকমই নগ্ন। কোথাও কোথাও ফসলের ক্ষেত আর বাগান আছে। আবার কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে মুঞ্জঘাসের বন।

ক্রমে আমরা কপিশার রাজধানী এসে পৌছুলাম। কপিশার দ্রাক্ষা স্বাদে ও সৌন্দর্যে অপূর্ব। এখানকার শুকনো দ্রাক্ষা আমি আগেই খেয়েছিলাম, কিন্তু তাজা দ্রাক্ষাফল দেখার সুযোগ এখানে এসেই পেলাম। এখন দ্রাক্ষালতার পাতা সবে বার হচ্ছে। ফলের মরশুম এটা নয়। কিন্তু কপিশার লোকেরা দ্রাক্ষা সংরক্ষণ করতে জানে। পাকা দ্রাক্ষা গাছ থেকে ছিঁড়ে খুব সাবধানে কাঁচা মাটির পাত্রে রেখে ঢাকনি চাপা দিয়ে তার চারদিকে মাটি লেপে দেয়। এক বছর পরে ঢাকনি খুললেও ঠিক সেইরকম তাজা পাওয়া যায়। দু আঙুল আড়াই আঙুল লম্বা এই পাণ্ডুবর্ণ দ্রাক্ষাফল দেখতেই শুধু সুন্দর নয়, খেতেও খুব মধুর।

নগরহার কপিশার রাজার অধীন। কপিশার উত্তরে হিমাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী। এই পর্বতশ্রেণী পার হলেই বিখ্যাত বহ্লীক ভূমি। আমার কেবলই মনে হ'ত, এইস্থানের নাম কপিশা হল কেন? পরে কপিশবাসী নরনারীদের পিঙ্গল বর্ণ আর পিঙ্গল কেশ দেখে মনে হ'ল, হয়তো এই জন্যই তাদের কপি আর তাদের দেশকে কপিশা বলা হয়। আমাদের বিহারের মতো ঠাণ্ডা না হলেও কপিশা বেশ ঠাণ্ডা দেশ। একটা প্রশান্ত উপত্যকা। কপিশার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে কুভা নদী। চারদিকে তার পাহাড়। রাজধানীটি কিন্তু খুব বড় নয়, পরিধি সম্ভবত অর্ধেক যোজন। এখানকার বাড়িগুলো ভারি সুন্দর। এইসব বাড়ি তৈরি করতে কাঠ লেগেছে অনেক। আশপাশে পাহাড় জঙ্গলে ভরা। কপিশা দ্রাক্ষালতার ভূমি। এখানে যব, গম, আর অন্যসব ফসলও হয়। এখানকার কেশর আর ঘোড়া প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা কিছুটা উদ্দণ্ড প্রকৃতির বলে মনে হয়। এদের পোশাক বিশেষ ধরনের সুথন (শাঁলোয়ার) আর জামা। মাথায় থাকে পাগড়ি। এদের শাসকসম্প্রদায় যেথাদের পোশাক কিন্তু অন্যরকম। কপিশার কম্বল খুব কোমল আর সুন্দর। দূরদূরান্তেও তার নাম-ডাক আছে। কপিশার বেশ কয়েক শ বিহার আছে। গ্রামে গ্রামে

সুন্দর অলঙ্কার-করা চৈত্যগুলি দেখে মনে হয়, তথাগতর ধর্ম এখানে সর্বত্র সম্মান পেয়েছে। এখানে যে পাশুপত আর অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরাও আছে তার একমাত্র প্রমাণ তাদের উপাসনার মন্দিরগুলি।

কপিশার রাজধানী এখনও ছোট এক রাজ্যের রাজধানী। অবশ্য আশেপাশের বিধ্বস্ত বাড়ি আর বীথিগুলি দেখে মনে হয়, কোনো এক সময় এই নগরী অনেক বড় ছিল। এখনও বহু দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালগুলি দেখে মনে হয়, তাদের এরকম অবস্থা খুব বেশি দিন আগে হয় নি। হেথা (শ্বেতহূণ)-দের আক্রমণের সময় কপিশার রাজধানী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কথা আজও মনে রেখেছেন স্থানীয় প্রাচীনেরা। মহারাজ মিহিরকুলের শাসন এখানেও আছে। কিন্তু প্রতাপ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় তাঁর সম্মান তত নেই।

মহারাজা কণিষ্কের অনেকগুলি রাজধানীর মধ্যে কপিশা একটি। রাজবিহারটি হয়তো তিনিই শুরু করেছিলেন। এখানকার রাজবিহার সম্পর্কে সুন্দর একটি গল্প আছে। কণিষ্ক কেবল আমাদের দেশেরই রাজা ছিলেন না, তাঁর রাজ্য সাতাতট থেকে শুরু করে পীতনদীর ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক সময় চীনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে চীনের সম্রাট তাঁর এক কুমারকে প্রতিভূ হিসেবে কণিষ্কের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। রাজকুমারের প্রতি কণিষ্ক অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। ঋতু অনুসারে গ্রীষ্মে কপিশা, শরতে গান্ধার, আর শীতে ভারতবর্ষে রাজকুমারের বাস করার জন্য অনেকগুলি মহল তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রদেশ তাই আজও চীনমুক্তি নামে বিখ্যাত। লোকে বলে, কপিশার রাজবিহার সেই রাজকুমারের জন্যই তৈরি হয়েছিল। রাজকুমার তাঁর প্রত্যেক আবাসে একটা করে বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। কপিশার রাজবিহারের দেওয়ালে যে সব মানুষের চিত্র আছে তার মধ্যে কয়েকটি চীনা রাজকুমারদের মতো দেখতে। এগুলি দেখেও মনে হয়, কপিশার রাজবিহার সেই চীনা রাজকুমারই তৈরি করিয়েছিলেন। রাজকুমার বিহারের জন্য অনেকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছিলেন। আজও বর্ষোপনায়িকা আর মহাপ্রাবারণার মহাপর্বের সময় রাজকুমারের পক্ষ থেকে ভিক্ষুসংঘে দানধ্যান করা হয়। তাছাড়া উপোসথাগারের পূর্বদ্বারের দক্ষিণ দিকে একটি গর্ত করে রাজকুমার নাকি বহু ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিলেন। এবং লিখে রেখেছিলেন, খণ্ডমুণ্ড পরিষ্কার আর সংস্কারের জন্যে এই ধনরত্ন ব্যবহৃত হবে।

গল্পটি যিনি বলেছিলেন তিনি একজন স্থানীয় ভিক্ষু। নাম বুদ্ধিল। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, কিছুদিন আগে সীমান্তের এক রাজা এই গুপ্তধনের দিকে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি ফেলেছিলেন এবং লুঠ করতে চেয়েছিলেন এইসব ধনরত্ন। ঠিক তখনই নাকি রক্ষকদেবতার মুকুটের সেই টিয়াপাখির মূর্তি ডানা ঝটপটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছিল। সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। আক্রমণকারী রাজা আর তাঁর সৈন্যরা সীমান্তদেশেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছিল।

তারপর বুদ্ধিল একটু হেসে বলেছিলেন রক্ষকদেবতা: সেই রাজা আর তাঁর সৈন্যদের ক্ষমা করে ফিরে যেতে দিলেন কেন? টিয়াপাখিটা যদি তাদের মেরে ফেলত তাহলে খুব ভালো হ'ত।

বুদ্ধিলের উজ্জ্বল দুটি চোখ আর তেজস্বী চেহারা দেখলে মনে হ'ত, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তিনি। কথা বলার ভঙ্গিটি ছিল তাঁর ভারি সুন্দর। তিনি আমার চেয়ে বয়েসে তিন-চার বছরের বড়ই ছিলেন। কিন্তু এমনি দেখলে ছোট মনে হ'ত। আমরা পরস্পরের পরিচয় নিলাম এবং সেই পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। জীবনে আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি। কিন্তু বুদ্ধিলের মতো বন্ধু একটিও পাই নি। বুদ্ধিল ছিলেন উদার, স্নেহপ্রবণ। যথার্থই, নামের মতোই তাঁর বুদ্ধি। আমাদের মধ্যে যে এত ভালোবাসা হতে পারে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না, যদি না বুদ্ধিলের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। আমরা একে অন্যের ছায়ার মতো ছিলাম। আমরা দুজনেই থাকতাম রাজবিহারে।

রাজবিহারের উত্তরে যে সব পাহাড় তাতে অনেক গুহা আছে। সেসব গুহায় বসে সেই চীনা রাজকুমার নাকি ধ্যান করতেন। সেখানেও তিনি এক যক্ষের প্রহরায় ধনরত্ন পুঁতে রেখে গেছেন।

বুদ্ধিল আরও বলেছিলেন: তথাগতর পরিগ্রহ-রহিত ভিক্ষুরা ধনরত্নের পেছনে ছুটে বেড়ান, স্বপ্নে আর কিংবদন্তীতেও তাঁদের গুপ্তধনের কথা মনে হয়। সিংহল থেকে তুখার পর্যন্ত আমি ঘুরেছি। সব স্থানেই সেই একই কথা এখানে অমুক রাজা ধনরত্ন পুঁতে দেবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, ওখানে অমুক শ্রেষ্ঠী এক কোটি নিধি রেখে এক রাক্ষসকে প্রহরায় রেখেছেন। গল্পগুলি মোটামুটি এক, শুধু স্থান আর পাত্র আলাদা।

বুদ্ধিল যখন তাঁর বয়েস ছাব্বিশ বছর বলেছিলেন তখন আমার বড় আশ্চর্য লেগেছিল। এই অল্প বয়সে এত ভ্রমণ তিনি করলেন কী করে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: আমার গুরু ধর্মলাভ সর্বদাই ভ্রমণ করতেন। তিনি মস্ত বিদ্বান্ ছিলেন। কিন্তু ছ মাসের বেশি কোথাও থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার খুবই সৌভাগ্য যে, বারো বছর বয়স থেকেই ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তুমি হয়তো ভাবছ, এতে আমার পড়াশোনায় বাধা হয়েছে। না, সেদিকে আমার উপাধ্যায়ের বরাবরই নজর ছিল। তাঁর কাছে যে অপার বিদ্যানিধি ছিল, তার সবটা গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। আমি যে আজ দু অক্ষর পড়তে শিখেছি, সে তাঁরই কৃপায়।

বিদ্যাভিমান বুদ্ধিলকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথায় লক্ষ শ্লোকের জ্ঞান ছিল। সাত বছর আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এই সাত বছর অন্যান্য আচার্যের কাছেও পড়াশোনা করেছি। কিন্তু বুদ্ধিলই আমার আসল আচার্য ছিলেন। বুদ্ধিল যখন কোনো বড় বিহারে যেতেন, যেখানে দুর্লভ গ্রন্থাবলী রয়েছে, সেখানে তিনি মাসের পর মাস থাকতেন, সমস্ত গ্রন্থ পড়া না হওয়া পর্যন্ত নড়বার নাম করতেন না। তাঁর মধ্যে লোক-দেখানো কিছু ছিল না। বিদ্যারও না, বুদ্ধিরও না। আমি বহুবার দেখেছি, বড় বড় তার্কিককে তিনি অতি সহজেই তর্কে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু তার পরেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এমন নম্রভাবে, বিনয়াবনত স্বরে কথা বলেছেন যে, মনে হয়েছে, তিনি তাঁর শিষ্য। এমনি করে তিনি পরাজিতকে গভীর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করতেন।

বর্ষাবাসের জন্য আমরা কপিশায় রয়ে গেলাম। আমাদের উদ্যানের তীর্থযাত্রী উপাসক-উপাসিকারা আগেই ফিরে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে যেসব ভিক্ষু এসেছিলেন তাঁরাও সব চলে গেছেন।

একদিন আমরা রাজকুমারের ধ্যান-গুহা থেকে আধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দর্শনে গেলাম। ভারি সুন্দর মূর্তিটি। রাজধানী থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে রাহুল নামে মস্ত বড় এক বিহার আছে। বিহারটি কিন্তু বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের নামানুসারে হয় নি। এর নির্মাণকর্তা রাহুল এক রাজ-অমাত্য ছিলেন। রাজধানীর ছক্রোশ দক্ষিণে এক নগর আছে। তার নাম শ্বেতফল। লোকের বিশ্বাস, সব জায়গায় যখন ভূমিকম্প হয়, মাটি ধসে যায়, তখন সেখানকার মাটি এতটুকু কাঁপে না।

-কীতফল নগরের দক্ষিণে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে অরুণ পর্বত। অনেক উঁচু। অনেক গভীর খাদ আছে তাতে। এই পর্বত সম্বন্ধেও কিংবদন্তী আছে। একবার সুনাসীর (ইন্দ্র) কোথা থেকে যেন আসছিলেন। পথে এই পাহাড়ে তিনি বিশ্রাম করতে চাইলেন। তাঁকে দেখে পাহাড়ের দেবতার সন্দেহ হল, যদি এই আগন্তুক তাঁকে হত্যা করে। তাই তিনি তাঁর দেহ নাড়াতে লাগলেন। সুনাসীর বললেন: তুমি এরকম করছ কেন? আমি যাতে এখানে বিশ্রাম করতে না পারি তার জন্যই কি? যদি তুমি আমার প্রতি এতটুকু আতিথ্য দেখাতে তাহলে তোমাকে আমি প্রচুর ধনরত্ন দিতাম। যাই হোক, এখন আমি চললাম চৌকূট দেশে সুনাশীলা পর্বতে। সেখানকার রাজা আর রাজ-অমাত্য প্রতি বছর আমার পূজো করবেন। আর তুমি তখন আমার অধীন হয়ে দর্শকরূপে সেখানে থাকবে।

সেই থেকে প্রতি বছর সুনাসীর দেবতার পূজোর সময় অরুণ পর্বত কয়েক শ হাত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সুনাসীর পর্বতের দিকে চেয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ বসে যায়।

বুদ্ধিল এই ধরনের গল্প বড় আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। মনে হ'ত, সবই যেন তিনি বিশ্বাস করছেন। কিন্তু আসলে তিনি এতটুকুও বিশ্বাস করতেন না। পাহাড় পাহাড়ই, তাতে কোনো দেবতা থাকতে পারে না। তার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতাও নেই। কিন্তু লোকে এইসব গল্পই পছন্দ করে। তাই এমন সব গল্প বলার লোকের অভাব হয় না। আমরা যাঁদের নির্লোভ ভিক্ষু বলি তাঁরা সরল উপাসক আর উপাসিকাদের কাছে এইসব গল্প বলে তাদের কাছ থেকে কিছু, নেবার চেষ্টা করেন। তাই বুদ্ধিলের যত রাগ ভিক্ষু আর পুরোহিতদের ওপর।

কপিশার উত্তর-পশ্চিম দিকে সেই মহান্ হিমবান্ (হিমালয়) দাঁড়িয়ে আছে যাকে আমাদের উদ্যানের উত্তরে দেখা যায়। তথাগতর জন্মনগরী কপিলাবস্তুর উত্তরে তাকে দেখেছিলাম। কপিশার উত্তরে আছে এক বিরাট সরোবর। লোকে বলে, এই সরোবরে আছে এক নাগরাজ। কণিষ্করাজার সময় এই নাগ-রাজ বড় উপদ্রব করত। অবশ্য প্রথমে নাকি সে খুবই ভালোমানুষ ছিল।

গান্ধারদেশে এক অর্হৎ ভিক্ষুর একবার ইচ্ছে হয়েছিল, মৃত্যুর পর তিনি যেন নাগরাজ হন। তিনি ছিলেন বড় রাগী। মৃত্যুর পর নাগযোনিতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পূর্বস্বভাব তাঁর যায় নি। রাগ ছিল তাঁর সঙ্গী হয়ে। তাঁর জন্ম হয়েছিল এই সরোবরে। আগের নাগরাজ তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন।

কিন্তু তিনি তাঁকে হত্যা করে নিজে রাজা হয়ে বসলেন। তারপর স্বভাবদোষে মাঝে মাঝে উৎপাত শুরু করলেন। কণিষ্ক রাজার সময়ও তেমনি করতে লাগলেন। তাঁর উৎপাতে বহু বৃক্ষ-বনস্পতি শিকড় উপড়ে ভেসে গেল; পাহাড়ের তলায় যে বিহার ছিল তা ধসে গেল। খবর শুনে কণিষ্ক বললেন, সরোবর আমি একেবারে শুকিয়ে ফেলব। এ কাজে তিনি লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত করলেন। নাগরাজ তখন চোখে অন্ধকার দেখলেন। সরোবরের জল শুকিয়ে গেলে তো তাঁর নিজের ঘরই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। তখন তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রাজার কাছে গেলেন। হাতজোড় করে অনেক প্রার্থনা করলেন, এমন আর কখনও করবেন না। কণিষ্ক তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন। নতুন করে বিহার তৈরি করে সেখানে বিরাট এক স্তূপ স্থাপন করলেন। বিহারে বলে দেওয়া হল, একজন যেন সব সময় সরোবরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি সেখানে কখনও কালো মেঘ উঠতে দেখে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। সেই থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। স্বভাবদোষে নাগরাজ যখনই কালো মেঘ সৃষ্টি করেন তখনই ঘণ্টা বেজে ওঠে, আর কণিষ্কের কাছে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঘণ্টার শব্দে তা তাঁর মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাগও ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এখানকার এই স্তূপেও তথাগতর দেহের অংশ আর অস্থিধাতু রক্ষিত আছে বলে শোনা যায়।

একদিন আমরা রাজধানী থেকে নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পুরনো রাজবিহারেও গেলাম। সেখানে দেড় আঙুল লম্বা শাক্যমুনির দুধের দাঁত আছে। এই রাজবিহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরও পুরনো এক রাজবিহার আছে। সেখানে আছে তথাগতর দেড় আঙুল চওড়া পাণ্ডুবর্ণ উষ্ণীষের অস্থিধাতু। দেড় বিঘত লম্বা গাঢ় বেগুনি রঙের তথাগতর একটা চুলও নাকি আছে। চুলটা কুঁকড়ে গেছে, এক আঙুলেরও কম বলে মনে হয়। উপোসথর দিন রাজা আর রাজ-অমাত্যও এই চুলের পুজো করতে আসেন। এই বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে রানীবিহার। রানীবিহারের শিখর পাকা ষাট হাত উঁচু। তামার ওপর সোনার গিলটি করা। এখানেও নাকি বুদ্ধের বহু ধাতু আছে। বুদ্ধিল বলতেন: এখন তো মাত্র হাজার বছর হয়েছে তথাগত নির্বাণলাভ করেছেন। আরও হাজার, দেড় হাজার বছর যাক না, দেখবে সারা পৃথিবীর সমস্ত স্তূপে এত চুল আর অস্থিধাতু জমা হয়েছে যে, তা দিয়ে গোটা মধ্যমণ্ডলের মাটি ঢাকা যাবে।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পিলুসার পাহাড়। দেখতে পিলু (হাতি)-র মতো, তাই লোকে নাম দিয়েছে পিলুসার। লোকে বলে, এই পাহাড়ের যে দেবতা তাঁর রূপও হাতির মতো। লোকনায়ক বুদ্ধ যখন এই ধরাধামে ছিলেন তখন এই পিলুদেবতা তাঁকে একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর বারো শ অর্হৎ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এই পাহাড়ে। এক বিরাট সমতল শিলার ওপর দেবতা তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন আর ভিক্ষাদান করেছিলেন। পরে এই শিলার ওপরই রাজা অশোক ষাট হাত উঁচু এক স্তূপ নির্মাণ করিয়েছেন। স্তূপের মধ্যে আছে বুদ্ধধাতু। এই স্তূপের উত্তরে আর-এক পাথরের গোড়ায় এক নাগ-নির্ঝর আছে। এখানেই তথাগত আর তাঁর বারোশ শ্রাবক দাঁতন করে পিলুদেবতার আহার্য গ্রহণ করেছিলেন। দাঁতনগুলি এখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। পরে সেগুলি গাছ হয়ে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

বর্ষা শেষ হয়ে এল। মহাপ্রাবারণার জন্ত কেবল রাজধানীই নয়, সারা কপিশাবাসী উৎসব আর দানের বিরাট আয়োজন করছে। রাজবিহারে চীনা রাজকুমারের সেই পাঁচ শতাব্দী আগেকার দানের পুনরাবৃত্তি করা হল। সেদিন সকাল থেকেই বাদ্যভাণ্ড আর নৃত্যগীত সহকারে শোভাযাত্রা বার করে দূর-দূরান্তরের গ্রাম আর নগরের সমস্ত নরনারী আর কপিশাবাসী রাজবিহারে এল। মধ্যাহ্নে নানারকম সুস্বাদু ভোজনে ভিক্ষুদের পরিতৃপ্ত করা হল।

মহাপ্রাবারণার সময় কপিশায় মাঠের ফসল ঘরে ওঠে। গাছে গাছে দ্রাক্ষা, উদুম্বর প্রভৃতি সুমধুর ফল পাকে। বিহারের মধ্যে দ্রাক্ষাগাছের ছড়াছড়ি। এদেশের বাড়ির ছাদে ছাদে অনেক পাঁচিল। তার ফোকরে ফোকরে দ্রাক্ষার গাছ ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। আগেই বলেছি, কপিশার মনাক্কার চাহিদা অনেক। কিন্তু বিদেশে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

মহাপ্রাবারণা শেষ হ'ল। আমরা দুজন এখান থেকে গান্ধার আর কাশ্মীর যাব স্থির করলাম।

পাহাড়ের লোকেরা সত্যি সত্যিই কূপমণ্ডূক। আমাদের এখানে এমন বহু নরনারী আছে, পাহাড় ছাড়াও যে সমতল দেশ পৃথিবীতে আছে তা তাদের জানা নেই। দেশভ্রমণের আনন্দে দূর দূর দেশ দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিন ধরেই ছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যেসব কথা শুনে এসেছি তার জন্তে মনে একটা দ্বিধা ছিল। সত্যিই কি অঙ্গারের মতো ঝলসানো বাতাসে

থাকতে হবে? বর্ষার সময় পোকামাকড় কিংবা বিষধর সাপ-বিছার মধ্যে দিন কাটাতে হবে? মরণের ভয় অবশ্য আমার ছিল না। কিন্তু তিল তিল করে ঐভাবে মরতে আমি পারব না। জীবনটাকে আমি এত তুচ্ছ মনে করি না যে, যেমন-তেমন-ভাবে তাকে নষ্ট করব।

বুদ্ধিলকে পেয়ে আমার ভালোই হ'ল। বুদ্ধিল ছিলেন উজ্জয়িনীর অধিবাসী। মধ্যমণ্ডলের কথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানত? মধ্যমণ্ডলে এমন কোনো বড় নগর বা বিহার নেই, যেখানে তিনি তাঁর উপাধ্যায়ের সঙ্গে যান নি। আগে আমার যাত্রা অন্ধকারে লাফ দেবার মতো ছিল। কিন্তু এখন বুদ্ধিলকে পেয়ে তা দিনের আলোর মতো আলোময় হয়ে উঠল।

আমরা কপিশার পাশের দেশ গান্ধারে যাচ্ছিলাম। বর্ষার তিন মাস এক সঙ্গে থেকে দেশভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথাই ভেবে রেখেছিলাম। আমরা পরস্পরের স্বভাব সম্বন্ধে এত জেনেছিলাম যে, আমাদের অটুট বন্ধুত্বের ওপর গভীর বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, বুদ্ধিল বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে নিজেকে আমি অতি তুচ্ছ মনে করতাম। যিনি অন্যের কাছে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন না তিনি কেন তাঁর সুহৃদ আর শিষ্যের কাছে তা করবেন?

কপিশা থেকে আবার আমরা সেই একই রাস্তা ধরে নগরহার পৌঁছুলাম। নগরহার থেকে আমাদের রাস্তার পূর্বদিকে খালি পাহাড় আর পাহাড়। সেখানে থেকে কুড়ি যোজন গিয়ে আমরা গান্ধারদেশের সীমা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর উদ্যানবাসীদের কাছে নতুন নয়। বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) আর জেতবন যাওয়া সবার ভাগ্যে ঘটে না, বরং প্রতিবেশী দেশ পুরুষপুরের মতো পুণ্যতীর্থে সবাই যায়। পুরুষপুর এক সময় অনেক বড় ছিল। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত চতুর্দিকে বিধ্বস্ত সব ঘরবাড়ি আর উঁচু জমি দেখে তাই মনে হয়। এক সময় যেখানে শতসহস্র পরিবার বাস করত, আজ সেখানে তার দশমাংশও নেই। পুরুষপুর ধর্মরাজ কণিষ্কের রাজধানী ছিল। তথাগতর শাসনের বিচারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অশোক। তাঁর তৈরি অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিহার আর চৈত্য আজও আছে। পুরুষপুরের আশপাশের ভূমি সমতল। পাহাড় দেখা যায় অনেক দূরে। নগরহার থেকে সেই পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ ধরেই আমি এসেছি। সে পথে অনেক দুর্গ আছে। শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্যে এরকম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আশপাশের

জমি খুব উর্বর। সেখানে নানারকম ফুলফল হয়। আখ আর শর্করার জন্যে পুরুষপুরের খ্যাতি আছে।

আমাদের কাছে পুরুষপুর আরও বেশি শ্রদ্ধাভাজন এই কারণে যে, এখানে বহু মহাবিদ্বান আর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। আর্য অসঙ্গের জন্ম এখানে। তাঁর অনুজ বসুবন্ধুর বাল্য ক্রীড়াভূমিও এই পুরুষপুর। ধর্মত্রাত, মনোরথ আর পার্শ্বের মতো মহান ধর্মনায়কদের জন্মদানে গৌরবান্বিত এই পুরী। বুদ্ধিলের অবশ্য অন্ধভক্তি না থাকলেও প্রাচীন বিহার আর প্রাচীন স্থান দেখার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ছিল। মহান্ আচার্যদের জন্মস্থান আর তাঁদের পিতৃগৃহ দর্শন করতে যাবার সময় মন তাঁর শ্রদ্ধায় পরিপ্লুত হয়ে উঠত দিগ্‌নাগ আর তাঁর গুরু বসুবন্ধুর প্রতি তাঁর মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। দিগ্‌নাগের প্রমাণশাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ই তাঁর মনে এই শ্রদ্ধা জেগেছিল। যে ঘরে অসঙ্গ, বসুবন্ধু আর বিরচি এই তিন সহোদর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঘরটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আজও কয়েকজন ব্রাহ্মণ গর্বভরে বলেন: আমাদের পরিবারেই এই তিনজন আচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গৃহস্থদের ঘরের মতো বহু বিহার আর চৈত্যেরও ভগ্নদশা হয়েছে। আজ সেখানে আগের মতো অত ভিক্ষু নেই। তাঁদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাঁদের আয় কমেছে আরও বেশি। আর তাই তাঁরা ধর্মস্থানগুলিকে আগের মতো যত্নে রাখতে পারেন না।

রাজধানী থেকে দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ষাট হাত উঁচু এক বোধিবৃক্ষ অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘন ছায়া আর সবুজ পাতা যেন বলছে, দেখো পুরুষপুরের ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়ায় নি। কিন্তু তার তলায় যে প্রতিমাগুলি আছে তারা কিন্তু সে কথা বলতে পারছে না। বোধিবৃক্ষের চারদিকে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। লোকে বলে, এই বোধিবৃক্ষই একদিন বুদ্ধকে শীতল ছায়া দিয়েছিল। এই বোধিবৃক্ষের তলায় দক্ষিণ মুখে বসে তথাগত একদিন আনন্দে বলে উঠেছিলেন: আমার নির্বাণের চার শ বছর পরে কনিষ্ক রাজা হবে। সে এই জায়গা থেকে একটু দক্ষিণে একটা স্তূপ নির্মাণ করে সেখানে আমার ধাতু স্থাপন করবে।

কিন্তু বুদ্ধিল বলতেন: তথাগত মধ্যমণ্ডলের বাইরে কখনও পা বাড়ায় নি; আর তাঁর উড়ে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ বানানো গল্প।

বোধিবৃক্ষের দক্ষিণে কনিষ্কের তৈরি সেই বিরাট স্তূপ কিন্তু এখনও আছে। কনিষ্ক আগে তথাগতর ধর্ম মানতেন না। একবার তিনি শিকার করতে এই

জঙ্গলে এসেছিলেন। একটা খরগোশ দেখতে পেয়ে তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। খরগোশটাকে কিন্তু তিনি ধরতে পারেন নি, খরগোশটা হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে পৌঁছেছিলেন এই গাছতলায়। গাছতলায় এক রাখাল দেখতে পেয়েছিলেন। রাখাল ছেলে সেখানে হাত তুয়েক উঁচু ছোট্ট এক স্তূপ বানিয়েছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করাতে রাখাল তথাগতের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলল—তুমিই সেই রাজা।

কণিষ্কের তৈরি সেই বিরাট স্তূপ পবিক্রমা করতে করতে আমি যখন এই গল্প শুনছিলাম, আমার মন তখন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। রাখাল ছেলের সেই দু হাত উঁচু স্তূপটার পাশে অদ্ভুত শিল্পকলামণ্ডিত আড়াই শ হাতেরও বেশি উঁচু চারতলা এই স্তূপটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। রাখাল ছেলের ছোট্ট স্তূপটাকে ঘিরে কণিষ্ক তাঁর বিরাট স্তূপ তৈরি করিয়েছিলেন। এবং তাঁর স্তূপের গর্ভে ছোট্ট স্তূপটি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। কণিষ্ক তাঁর স্তূপ যত বড় করেন, রাখাল ছেলের ছোট্ট স্তূপটা সব সময় তার চেয়ে দেড় হাত উঁচু হয়ে থাকে। এমনি করে পাঁচ শ হাত পরিধির মধ্যে তৈরি এই স্তূপ আড়াই শ হাত উঁচু হয়ে গেল। তবু সেই স্তূপটিকে লুকোনো গেল না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আবার তা জেগে উঠল। রাজা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর স্তূপ সরিয়ে নিলেন। রাখাল ছেলের স্তূপটাকে ঢেকে ফেলার আশা ছেড়ে তার পাশে তাঁর স্তূপ তৈরি করালেন। স্তূপের ওপর সোনালী রঙের পনেরোটা তামার ছাতা বসালেন। স্তূপের মধ্যে স্থাপন করলেন ভগবান তথাগতর ধাতু। এই মহাস্তূপের পূর্বদিকে পাথরের সিঁড়ির দক্ষিণে দেড় হাত আর তিন হাত উঁচু পাথরেব মহাস্তূপের গায়ে ছোট ছোট দুটি প্রতিলিপি উৎকীর্ণ আছে। সেখানে তথাগতর দুটি মূর্তি আছে—একটি তিন হাত উঁচু, আর—একটি চার হাত উঁচু। মূর্তি দুটি বোধিবৃক্ষের তলায় বজ্রাসনে বসে আছে। মহাস্তূপের দক্ষিণ পাশে দশ হাত উঁচু তথাগতর মূর্তি চিত্রিত আছে। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এক শ পা হেঁটে গেলে বারো হাত উঁচু শ্বেতপাথরের এক বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যাবে। অদ্ভুত মূর্তিটি। মহাস্তূপের ধারে ধারে প্রায় একশটি ছোট ছোট স্তূপ আর সুন্দর সুন্দর অনেক বুদ্ধমূর্তি আছে। এই মহাস্তূপকে নিয়ে কত চমৎকার গল্পই না আছে। অর্ধ রাত্রে গন্ধর্বরা নাকি মধুর স্বরে এখানে স্তুতি করেন, দেবতার পুজো আর প্রদক্ষিণ করেন। ভবিষ্যদ্বাণী আছে—এই স্তূপ সাত বার পুড়ে যখন নতুন তৈরি হবে তখনই তথাগতর ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিন বার পুড়েছে,

তিনবারই নতুন করে গড়া হয়েছে। শুনে বুদ্ধিল বললেন : তাহলে তো আর মাত্র তিন-চার শ বছর তথাগতর শাসন থাকবে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তথাগতর শাসন লুপ্ত করবে মূঢ়দের ধর্ম। কেননা, তথাগত যে অনাত্মবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, আর সর্বানিত্যতাবাদের দৃষ্টি মানুষকে দিয়ে গেছেন তা তখনই লুপ্ত হতে পারে, যখন পৃথিবীতে কেবল মূঢ়রাই থাকবে, জ্ঞানবুদ্ধির প্রকাশ কোথাও দেখা যাবে না।

কণিষ্ক মহাস্তূপের পশ্চিমে বেশ কয়েকতলা উঁচু এক বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। বিহারের ইমারত স্তূপের মতো দৃঢ় ছিল না। তাই আজ তা ভগ্নদশায় এসেছে। আজও সেই বিহারে বহু সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু বাস করেন। কণিষ্ক তাঁর মহাবিহারের তিনতলায় ভদন্ত পার্শ্বের থাকার ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। সে ঘর এখন আর নেই, পড়ে গেছে। পার্শ্ব ছিলেন কণিষ্কের গুরু—যেমন মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য (উপগুপ্ত) ধর্মরাজ অশোকের গুরু ছিলেন। পার্শ্ব যে ঘরে থাকতেন তার পূর্বদিকে আর একটি পুরনো ঘর আছে। এই ঘরে আচার্য বসুবন্ধু তাঁর 'অভিধর্মকোষ' লিখেছিলেন। ঘরটিতে একটি বিশেষ চিহ্ন আছে, যা দেখে লোকে বুঝতে পারে যে, তথাগতর দেশনার শুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র এই পুণ্যস্থানেই রচিত হয়েছিল। বসুবন্ধুর ঘর থেকে পঞ্চাশ পা দক্ষিণে দোতলার ওপর আর একটি ঘর আছে। সেখানে আচার্য মনোরথ তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আচার্য মনোরথ আচার্য বসুবন্ধুর গুরু। গুপ্তরাজা তাঁর পরম ভক্ত ছিলেন। আর তাই বসুবন্ধুও তাঁর রাজধানীতে সম্মান পেয়েছিলেন। কণিষ্ক-বিহারে ভগবান তথাগতর ভিক্ষাপাত্র রক্ষিত ছিল। রাজা মিহিরকুল বৌদ্ধশাসনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যখন বহু বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন তখন এই ভিক্ষাপাত্রও ভেঙে ফেলেছিলেন। পরে অবশ্য তা জোড়া দেওয়া হয়েছে। এবং রাজা যাতে আবার তাতে হাত দিতে না পারেন, সেজন্য পাত্রটিকে বহ্লীকদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কণিষ্ক তাঁর বিশাল চৈত্য নির্মাণে সুন্দর সুন্দর কারুকার্যখচিত কাঠের ব্যবহার করেছেন। চৈত্যের ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ি বানিয়েছেন। সিঁড়ির ওপরে কাঠের তৈরি সুন্দর ছাদ। সব মিলিয়ে এই চৈত্যটি তেরো-তলা। তার লৌহস্তম্ভ ছাপ্পান্ন হাত উঁচু। এবং তাতে বৃত্তাকার সোনালী ছাতা আছে পঁচিশটি। স্তম্ভটি নিয়ে সারা স্তূপের উচ্চতা প্রায় পাঁচ শ হাত স্তূপটির ওপর তিনবার বাজ পড়েছিল, অবশ্য প্রতিবারেই তার সংস্কার করা হয়েছে। স্তূপের

চার দিকে চারটি আসন। সেই আসনে বসেই পুজো করা হয়। ছাতার সঙ্গে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘণ্টা লাগানো রয়েছে। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে ঘণ্টাগুলি যখন দোলে তখন ভারি মিষ্টি শব্দ হয়।

মহাচৈত্যের দক্ষিণে পঞ্চাশ পা দূরে অঠোরো হাত উঁচু এক গোলাকার পাষাণ-চৈত্য আছে। সেটিও দেখতে বড় সুন্দর।

কণিষ্ক-চৈত্য থেকে দু যোজন দূরে কুভানদীর তীরে পুষ্কলাবতী। পুরুষপুরের চেয়েও পুরনো এই নগর। গান্ধারের বহু নগরের মতো এই নগরও দর্শনীয়। পশ্চিম নগরদ্বারের বাইরে মহেশ্বরের এক বিরাট মন্দির আছে। মন্দিরে পশুপতির মুখলিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত। নগরের পূবদিকে আছে অশোকের তৈরি ধর্মরাজিকা স্তূপ। এখানেই বসুমিত্র 'অভিধর্মপ্রকরণপাদ' শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। নগর থেকে এক ক্রোশ দূরে পুরনো ভাঙাচোরা এক বিহার। বর্তমানে সেখানে বাস করেছেন কয়েকজন সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু। এখানেই আচার্য ধর্মত্রাত তাঁর অভিধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই বিহারের পাশে ষাট হাত উঁচু অশোক স্তূপ। স্তূপের মধ্যে কাঠ আর পাথরের ওপর সুন্দর মূর্তি আর ফুলপাতা উৎকীর্ণ। লোকে বলে, পূর্বজন্মে শাক্যমুনি হাজার বার রাজা হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকবারই তিনি তাঁর চোখদুটি দান করেছিলেন। তথাগতর জীবনের সঙ্গে জড়িত আরও অনেক জায়গা রয়েছে ধারে-কাছে। পূবদিকে আছে দুটি পাষাণ-স্তূপ। ছ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে আছে আর একটি স্তূপ। সেখানে ভগবান তথাগত যক্ষিণী হারীতিকে দমন করেছিলেন। আজও সেখানে লোকে হারীতির পুজো করে। হারীতি প্রথমে মগধের রাজগৃহ নগরের এক যক্ষিণী ছিল। গান্ধারের যক্ষের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। হারীতির পূর্বনাম নন্দা। ছোট ছোট শিশুদের সে চুরি করে খেত বলে লোকে তার নাম দিয়েছিল হারীতি, অর্থাৎ চোর। তথাগত যখন জানতে পারলেন, হারীতি চুরি করে অন্যের শিশুসন্তান খায় তখন তিনি তাঁর ভিক্ষাপাত্রে হারীতির এক শিশুসন্তান পিঙ্গলকে লুকিয়ে তার সামনে এনে রেখে দিলেন। কিন্তু যক্ষিণী তার নিজের সন্তানকে খায় কী করে? তথাগত তখন বললেন— নিজের সন্তান প্রত্যেকেরই কাছে এমন প্রিয়।

হারীতি প্রতিজ্ঞা করল, আর সে কারও শিশুসন্তান খাবে না। সেই থেকে সে শিশুদের ভক্ষিকার বদলে রক্ষিকা হ'ল।

জাতক আর অবদানের অনেক ঘটনার স্থল এই গান্ধারদেশ। হারীতি-চৈত্যের ছ যোজনা উত্তরে সেই বহু বিখ্যাত জায়গা, যেখানে তথাগত পূর্বজন্মে শাম রূপে অন্ধ মা-বাবার সেবা করেছিলেন। সেখানে এক রাজা ভ্রমক্রমে তাঁকে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। রাজা দশরথও এমনি করে অন্ধ মা-বাবার একমাত্র সন্তান শ্রবণকুমারকে বাণবিদ্ধ করেছিলেম। শ্রবণ মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু শাম ইন্দ্রের কৃপায় আবার বেঁচে উঠেছিলেন। বৈশন্তর জাতকে এই করুণ কাহিনী বর্ণিত আছে।

শাম-স্তূপ থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আট যোজন দূরে উরসা নগরীতে এসে পৌঁছুলাম আমরা। তথাগত একজন্মে সুদান বৈশন্তর রাজকুমার-রূপে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নগরের উত্তরে সেই জায়গায় একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপের পার্শ্ববর্তী বিহারে বহু সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু আছেন। আচার্য ঈশ্বর এখানে তাঁর শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। নগরের দক্ষিণদ্বারের বাইরের অশোকস্তম্ভ সেই জায়গাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে এক ব্রাহ্মণ সর্বস্বদায়ী বৈশন্তরের কাছ থেকে তাঁর পুত্রকন্যাকে চেয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। বৈশন্তর যে দন্তালোক পর্বতে তাঁর প্রিয় পুত্রকন্যাকে মহাদান করেছিলেন, সেখানে অশোক এক স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছেন। এই স্তূপের পাশে সেই ব্রাহ্মণ রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করত। তাদের রক্তে মাটি ভেসে যেত। আজও দেখা যায়, এখানকার বৃক্ষ-বনস্পতি লালে লাল। বৈশন্তর আর তাঁর রানী যে গুহায় ধ্যানপূজা করে দিন কাটাতেন সেই গুহাটিও আছে তার পাশে। এখানে কাছেই এক শৃঙ্গ (ঋষ্যশৃঙ্গ)-এর আশ্রম ছিল। এক গণিকা এই শৃঙ্গকে মোহিত করে তার কাঁধে চড়ে নগরে গিয়েছিল নিজের বিরাট জয়বার্তা ঘোষণা করতে।

পাণিনির ব্যাকরণ আমিও পড়েছি। এই ব্যাকরণের ওপর বুদ্ধিলের বিশেষ অধিকার ছিল। বুদ্ধিল যখন বললেন, এখান থেকে ন যোজন দূরে দাক্ষীপুত্র পাণিনির জন্মস্থান শলাতুর তখন সেখানে যাবার জন্ম আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। উরসা থেকে উত্তর-পূর্বে ছ যোজন দূরে এক পর্বতের কাছে আমরা গেলাম। সেখানে গৌরীদেবীর বিরাট এক মন্দির আছে। গান্ধার, কপিশা, আর কাশ্মীরের পাশুপতেরা এই মন্দিরকে অতি পবিত্র মনে করে। ভস্মধারী পাশুপত পরিব্রাজকদের একটা সুন্দর মঠ আছে এখানে। দেবীর মন্দির থেকে ছ যোজন দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে উদ্‌ভাণ্ড (ওহিন্দ) নগরী। উদ্‌ভাণ্ড নগরীর

দক্ষিণে বয়ে চলেছে সিন্ধুনদ। গান্ধারদেশের নগরগুলির মধ্যে এই উদ্ভাণ্ডই সমৃদ্ধিশালী। তার কারণ হয়তো সিন্ধুর তীরে বণিকদের আনাগোনা।

উদ্ভাণ্ড থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক যোজনেরও কম দূরে শলাতুর গ্রাম। আজ পাণিনির ব্যাকরণ আমাদের কাছে কল্পবৃক্ষ। এই মহান্ আচার্য যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই স্থানটা আমরা ভক্তিভরে দর্শন করলাম। শলাতুর থেকে আবার উদ্ভাণ্ডে ফিরে এলাম। সিন্ধুনদ এখানে প্রায় এক ক্রোশ চওড়া। সিন্ধুর জল স্বচ্ছ নীল। তাই বলে বর্ষার সময় এমন নীল থাকে না। সিন্ধুনদ পার হয়ে তিনদিন চলার পর আমরা এসে পৌঁছুলাম তক্ষশিলায়। আমাদের পথ অধিকাংশই ছিল পূর্বদিকে। তক্ষশিলা আগে গান্ধারেরই এক অংশ ছিল। এখনও পুরুষপুর আর তক্ষশিলায় মিহিরকুলের শাসন। যেথা আক্রমণের পূর্বে তক্ষশিলা নগরী খুব সমৃদ্ধ ছিল। যেথারা লুঠ করে সব নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর আর উঠতে পারে নি তক্ষশিলা।

ধর্মরাজ অশোক আর কণিকের তৈরি অনেক স্তূপ আর বিহার আছে এখানে। নগরের উত্তরে দেড় ক্রোশ দূরে আছে অশোকের মহাচৈত্য। সেখানে তথাগত পূর্বজন্মে তাঁর নিজের শিরশ্ছেদ (শিরস্তক্ষ) করে হাজার জন্ম পর্যন্ত তা দান করেছিল। তাই এই জায়গার নাম তক্ষশিরা বা তক্ষশিলা। অশোকের তৈরি পুরনো বিহারের প্রথম স্থিতি আর নেই। ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্য সব বিহারে অল্প কয়েকজন ভিক্ষু আছেন। সৌত্রান্তিক আচার্য কুমারলতা এখানে থেকে তাঁর শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দক্ষিণ-গিরির উত্তরে অশোকের তৈরি ষাট হাত উঁচু এক স্তূপ আছে। অশোকের পুত্র কুণাল কুটিল সৎমার ছলনায় পড়ে এখানেই তাঁর চোখ দুটি উৎপাটন করে দিয়েছিলেন। তাঁর সৎমার ইচ্ছা ছিল না যে, অশোকের পর কুণাল জম্বুদ্বীপের রাজা হন। তাই তিনি রাজমুদ্রা চুরি করে রাজার হয়ে কুণালের চক্ষু উৎপাটনের আদেশপত্র পাঠিয়েছিলেন। কুণাল কোনো আপত্তি না করেই চোখ দুটো উপড়ে দিয়েছিলেন। আজও এই স্তূপের ওপর অন্ধরা দৃষ্টি ফিরে পাবার জন্য পূজা করে। অশোকও নেই, কুণালও নেই ; তাঁদের বংশবৈভবও শেষ, তবু আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই জায়গা দেখতে আসে। লোকে বলে, অর্হৎ ঘোষের বরে কুণাল আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। এক সময় সুদূর কাশী-কোশল আর মগধ-বিদেহ থেকে তরুণেরা বিদ্যাধ্যয়নের জন্য তক্ষশিলায় আসত। কিন্তু আজ তার এই হীন অবস্থা দেখে আমার কেবলই মনে হতে

লাগল, এই পৃথিবী বড়ই অসার। আমার বন্ধু বললেন: পুরাতনের ধ্বংস হয় নতুনের স্থান করে দেবার জন্ত। কেবল ধ্বংস আর বিনাশের দিকে তাকালে চলবে না, নতুনের দিকেও তাকাতে হবে। পুরনো পাতা যদি ঝরে না যায় তাহলে আমরা বসন্তের শোভা দেখব কী করে? যাঁরা প্রাচীন তাঁরা যদি চলে না যান তাহলে নতুন বসুবন্ধু আর দিগ্‌নাগকে আমরা পাব কেমন করে?

তক্ষশিলা থেকে আমরা সোজা পূর্বদিকে মধ্যমণ্ডলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কাশ্মীর দেখার ইচ্ছা হ'ল। তাই উত্তর-পূর্ব দিকে রওনা হলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে কাশ্মীরে এসে পৌঁছুলাম। কাশ্মীর উপত্যকা বড়ই রমণীয়। চারদিকে উঁচু পাহাড়। আমাদের উন্তানভূমির বনশ্রীর সঙ্গে এর তুলনা না হলেও বড় সুন্দর এই দেশ। নানা ফলেফুলে ভরা। এখানকার লোকদের পোশাক-আশাক উন্তানবাসীদেরই মতো। কিন্তু এদের মধ্যে সে বীরত্ব নেই। অবশ্য এখানে বিদ্যার কদর আছে। বৌদ্ধ আর পাশুপত—দুই ধর্মের লোকই আছে এখানে। উপত্যকার শতাধিক বিহার আর কয়েক হাজার ভিক্ষুকে দেখে মনে হয়, মিহিরকুল ততটা রক্তপিপাসু হয়তো নন, যতটা লোকে বলে। যৌবনে হয়তো তিনি অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু এখন সূর্য, পশুপতি, আর বুদ্ধের প্রতি তাঁর সমান শ্রদ্ধা। এখানে সকলেই নিজের ধর্মানুসারে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

মিহিরকুলের রাজধানীতে এসে আমি মনের কোণে একটুখানি ব্যথা অনুভব করলাম। আমার প্রথম যৌবনের সেই প্রিয়তমা হয়তো আজও তাঁর অন্তঃপুরে রয়েছে। বুদ্ধিল আমার বাল্যপ্রেমের কাহিনী সহানুভূতির সঙ্গে শুনতে চাইলেন। আমি যখন বললাম, যে ঘা শুকিয়ে গেছে তাকে আবার নতুন করে খোঁচানো কেন, তখন তিনি আর শুনতে চাইলেন না। আমি আমার বিস্মৃতপ্রায় প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম না।

কাশ্মীর শাস্ত্র আর বিদ্বান্‌দের দেশ। আগেও ছিল, এখনও আছে। কাশ্মীরের ভেতরে প্রবেশ করতেই পেলাম কণিষ্কপুত্রের তৈরি হুবিষ্ক-বিহার। হুবিষ্ক-বিহারে ভিক্ষুদের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। সেখানে আমরা দুদিন ছিলাম।

কাশ্মীর সম্পর্কেও নানারকম গল্প শোনা যায়। আগে সারা কাশ্মীর

উপত্যকা নাকি এক মহাসরোবর ছিল। সেখানে বাস করতেন এক নাগরাজ। মধ্যান্তিক অর্হৎ এই নাগরাজকে দমন করে জায়গাটাকে মনুষ্যবাসোপযোগী করে তুলেছেন। বুদ্ধিল বললেন : এ তো সহজ কথা। যেখানে চারদিকে পাহাড় আছে, অথচ জলনিষ্কাশনের পথ নেই, সেখানে একদিন সরোবর থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু অর্হৎদের কাজ তো সরোবর শুকোনো নয়, পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করাও না।

মধ্যান্তিক স্থবির অশোকের সমসাময়িক। মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য যখন বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন তখন মধ্যান্তিক স্থবির তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে হিমবানের দেশে এসেছিলেন। তিনিই কাশ্মীরে প্রথম তথাগতর ধর্ম এনেছিলেন। এখানকার লোকেরা তাদের প্রথম আচার্যের প্রতি গৌরবভাবাপন্ন হবে, সে তো স্বাভাবিক। আমরাও যখন জানি, মধ্যান্তিকের জন্যই কাশ্মীরের মতো বিদ্যাকেন্দ্র সৃষ্ট হয়েছে তখন আমরাই-বা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না কেন?

এই কাশ্মীরেই রাজা কণিষ্ক তথাগতর দেশনাসমূহ সংগ্রহ করে তা স্পষ্টীকরণের জন্য এক মহাসংগীতি (মহাপরিষদ্) আহ্বান করেছিলেন। অশোকের সময় তথাগতর দেশনা যেভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাতে বহু পরস্পরবিরোধী কথা ছিল। তাই অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘের এক মহাসংগীতি আহ্বান করে মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যের সঞ্চালনে তথাগতর উপদেশাবলী সংগ্রহ করেছিলেন। তেমনি কণিষ্কও যখন এ রকম মতভেদ দেখলেন তখন তাঁর গুরু ভদন্ত পার্শ্বের সম্মতিক্রমে এক মহাপরিষদ্ আহ্বান করা স্থির করলেন। কণিষ্কের নিমন্ত্রণে পূর্ব আর পশ্চিম, এবং সারা গান্ধার থেকে বহু বিদ্বান্ আর বিপশ্যনাযুক্ত ভিক্ষু এসেছিলেন। গান্ধারেই মহাসংগীতি হবে বলে প্রথমে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সেখানে গ্রীষ্মকালে খুব গরম পড়ে, বর্ষাকালেও খুব কষ্ট হয়, তাই কাশ্মীরই উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হ'ল। যত বিদ্বান্ ব্যক্তি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে চার শ নিরানব্বই জনকে নির্বাচিত করা হ'ল। তাঁরা সবাই ছিলেন ত্রৈবিদ্য এবং ষড়্‌ভিজ্ঞ। ভদন্ত বসুমিত্র যেদিন ভিক্ষুর বেশে বিহারে এসেছিলেন সেদিন তিনি পৃথকজনই ছিলেন।

বুদ্ধিল বললেন : তথাগতর নির্বাণের প্রথম বছরেই যে মহাসংগীতি আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় হয়েছিল তাতে আনন্দকেও এমনি পৃথক্‌জন বলা হয়েছিল। পরে অবশ্য অর্হৎ হয়ে এই সংগীতিতে তিনি

যোগ দিয়েছিলেন। বসুমিত্রের বেলায়ও তেমনি হয়েছিল। তিনি অর্হৎ হয়ে কণিষ্কের মহাসংগীতিতে যোগদান করেছিলেন। বসুমিত্র ছিলেন এই মহাসংগীতির নায়ক স্থবির।

বেশ কয়েক মাস ধরে পরিষদ্ বুদ্ধের উপদেশিত সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম—এই তিনটি পিটক সংগ্রহ করলেন। তারপর এক-একটির ওপর শতসহস্র শ্লোকের সমান এক-একটি বিভাষা তৈরি করলেন। তাতে সূত্র, বিনয় আর অভিধর্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হ'ল। সংগীতি শেষ হলে পরে কণিষ্ক বিভাষা আর ত্রিপিটক তাম্রপত্রে লিখিয়ে পাথরের পেটিকায় করে এক স্তূপের মধ্যে রেখে দিলেন। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, যদি সেই তাম্রপত্রের গ্রন্থ একবারটি পড়তে পেতাম! কিন্তু সম্ভব ছিল না। কারণ, কোথায় কোন্ স্তূপে তা রাখা হয়েছে, কে জানে! তা ছাড়া বুদ্ধিলের তেমন বিশ্বাসও ছিল না। লোকে বলে, সংগীতির শেষে কণিষ্ক সারা কাশ্মীরটাই ভিক্ষুসঙ্ঘকে অর্পণ করেছিলেন। জায়গায় জায়গায় অস্থিধাতু, দন্তধাতু, কেশধাতু, পাত্রধাতু; চীবরধাতু দেখতাম আর আমার ওপর তার প্রভাব পড়ত। আমি এইসব পবিত্র আর পুরাতন জায়গাগুলো ছেড়ে যেতে চাইতাম না। কিন্তু কাশ্মীরে তথাগতর দন্তধাতুর স্তূপ সম্বন্ধে যখন নানাকথা শুনলাম, আমার পুরো বিশ্বাস হল না। দন্তবিহার থেকে দু-আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে ছোট একটা বিহারে বোধিসত্ত্ব-অবলোকিতেশ্বরের দাঁড়ানো অবস্থায় এক মূর্তি আছে। এই মূর্তি সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। এর দক্ষিণ-পূর্বে এক যোজনের কিছু বেশি দূরে সুন্দর এক বিহার ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। তার এক কোণে দু-তলা একটা বাড়ি আছে। এই বিহারে থেকেই নাকি আচার্য সঙ্ঘভদ্র অভিধর্ম সম্বন্ধে তাঁর 'অভিধর্মন্যায়ানুসার' শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বিহারের আশপাশে ছোটবড় কয়েক শ স্তূপ আছে। এইসব স্তূপে রক্ষিত আছে এখানকার প্রাচীন স্থবির আর বিদ্বান্‌দের অস্থি। দন্তবিহার থেকে দেড় ক্রোশের কিছু বেশি দূরে উত্তর পাহাড়ের ঢলে ছোট একটি বিহার আছে, যেখানে আচার্য স্কন্দিল তাঁর 'বিভাষা প্রকরণবাদ অভিধর্মাবতার শাস্ত্র' রচনা করেছিলেন।

রাজধানী থেকে উত্তর-পশ্চিমে আট যোজন দূরে বণিক্‌বন বিহার। এখানে আচার্য পূর্ণ বিভাষার ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। রাজধানী থেকে পাঁচ-ছ যোজন পশ্চিমে মহানদীর উত্তরে পাহাড়ের দক্ষিণে পাশে মহাসাংঘিকদের এক বিহার আছে। এই বিহারে মহাসাংঘিক আচার্য বোধিল তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

গান্ধারের মতো কাশ্মীরেও অনেক বড় বড় বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাশ্মীরের রমণীয় উপত্যকার বহু জায়গায় বিহার আর স্তূপ আছে। কাশ্মীর বিভাষা আর বৈভাষিক দর্শনের ভূমি। তাই দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা এখানে অধ্যয়ন করতে আসে। আজ এইসব বিহারের কী হীন অবস্থা! কতকগুলি তো ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছে। একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দেয়াল পড়ে গেছে কিংবা অর্ধেক খাড়া আছে। ছাদের ওপর ঘাস জন্মেছে। কিন্তু কেন এই জীর্ণতা? সব দোষ তো মিহিরকুলের নয়। লোকের যদি গভীর শ্রদ্ধা থাকত তাহলে তারা ঐ জীর্ণ বিহারগুলিকে আবার নতুন করে তৈরি করত। আমার যখন মনে হ'ত, একদিন সব শেষ হয়ে যাবে, শুধু নামটাই অবশিষ্ট থাকবে তখন একটা ব্যথা অনুভব করতাম। কিন্তু পুরাতনকে তো জীর্ণ হতেই হবে! নতুনের জন্য তাকে স্থান করে দিতেই হবে। ধর্ম সম্বন্ধেও কি তাই? হাজার বছর পর তথাগতর ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবার যে ভবিষ্যদ্বাণী তা কি সত্যে পরিণত হবে? সত্যিই কি তথাগতর শাসন লুপ্ত হয়ে যাবে? বিহার আর চৈত্যের শূন্যতা আর জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে এইসব প্রশ্নই কেবল আমার মনে জাগত। আমি জানি, আমি শ্রদ্ধাপ্রধান,—বুদ্ধিলের মতো বুদ্ধিপ্রধান নই। তথাগত আর তাঁর শ্রাবকদের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো জায়গা ভালো অবস্থায় দেখতে না পেলে চোখের জল আমার বাধা মানত না। বুদ্ধিল বলতেন—প্রাচীনদের হাড়মাংস নয়, তাঁদের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাই উত্তরকালের মানুষদের পথপ্রদর্শন করে সামনের দিকে নিয়ে যায়। আমি শ্রদ্ধাকেই বড আসন দিতে চাইতাম, বুদ্ধিল চাইতেন বুদ্ধি, অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে। তিনি মনে করতেন, প্রজ্ঞা অবিনশ্বর, আর আমি মনে করতাম শ্রদ্ধা।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা কাটিয়ে আমরা কাশ্মীর থেকে বার হলাম। বর্ষায় পাহাড় আর মাঠের মধ্য দিয়ে যাত্রা করা সুবিধাজনক নয়। রাস্তা খারাপ থাকে, পুল ভাঙা থাকে, পাহাড়ে ধস নামে। তাই তথাগত নিয়ম করেছেন, ভিক্ষুরা বর্ষাকালে যাত্রা করবেন না।

কাশ্মীর উপত্যকার চারদিকে পাহাড়। শুধু একদিক খালি, যেদিক দিয়ে নদী পাহাড় ভেদ করে বেরিয়েছে। নদীর ধারে ধারে নিচের দিকে কিছুদূর গিয়ে আমরা পাহাড় পার হলাম। আর একটু দেরি করে এলে হয়তো পাহাড়ের উপরিভাগে বরফ দেখতে পেতাম। দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পার হয়ে আমরা কাশ্মীর রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই ছোট্ট প্রদেশে পৌঁছে এলে

পৌঁছুলাম। সৌন্দর্য আর ফলফুলের দিক দিয়ে কাশ্মীরের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। কিন্তু এখানে দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানারকম ফল হয়, সবজিও হয়। লোকে বাড়ির ধারে উদুম্বর আর কলার বাগান করেছে। আমও হয় এখানে। আর তাতেই প্রমাণ হয়, এখানকার জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান। এখানকার লোকেরা বেশির ভাগ সুতীর কাপড় পরে। তথাগতর শাসনের বহু প্রসার ও প্রচার আছে এখানে। ভিক্ষুদের অনেক সংঘারাম আছে। কিন্তু ভিক্ষুদের সংখ্যা কম। অনেক সংঘারাম ধ্বংসপ্রায়। এখানকার লোক সাহসী আর সরল।

পুণচে আমরা থাকতে চাইলাম না। এখানে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় কিছু নেই। আমরা মধ্যমণ্ডলে যাবার জন্ম উতলা হয়ে উঠলাম।

পুণচ থেকে নিচের দিকে নেমে রাজপুরীতে এসে পৌঁছুলাম। রাজপুরীও এক পাহাড়ী প্রদেশ। রাজপুরীর পরে পাহাড় শেষ হয়ে গেছে, নতুন পৃথিবী শুরু হয়েছে। সমতলভূমি, বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত কিংবা জঙ্গল, লোকের বেশভূষা আর রীতিনীতিতেও পার্থক্য।

ছয়

রাজপুরী থেকে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আমরা চললাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু-তিন দিন চলার পর এল চন্দ্রভাগানদী। চন্দ্রভাগা পার হয়ে শাকলী (শিয়ালকোট)-এর পথে অগ্রসর হলাম। শাকলা ছিল মিহিরকুলের রাজধানী। শীতের সময় তিনি এখানে এসে থাকতেন। এক সময় মিহিরকুলের রাজ্য যখন যমুনা আর নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তখন এই শাকলা ছিল আরও বড়। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মিহিরকুলকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। সেই থেকে তিনি বেশির ভাগ সময় কাশ্মীরেই থাকতেন। শোনা যায়, মিহিরকুল যখন শাকলায় ছিলেন তখন ভিক্ষুদের কোনো ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে তথাগতর ধর্ম উচ্ছেদ করার জন্ম বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। বহু বিহার আর স্তূপ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। যেসব ভিক্ষু রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আমার কিন্তু মনে হয়, বৌদ্ধদের ওপর অসন্তুষ্ট হবার আসল কারণ তা নয়। আমার মতো তিনিও দিগ্বিজয় করতে মধ্যমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু দিগ্বিজয় করা আর তাঁর হ'ল না। নরসিংহবালাদিত্যের সম্মুখীন হতে হ'ল

তাঁকে। প্রথমে অবশ্য মিহিরকুল কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই পরাজয় হ'ল। বালাদিত্যের হাতে বন্দী হতে হ'ল। কিন্তু বালাদিত্যের মা দয়াপরবশ হয়ে মিহিরকুলকে ছাড়িয়ে দিলেন। নইলে এত অত্যাচার করার সুযোগ তিনি পেতেন না। মধ্যমণ্ডলের স্বামী রাজা বালাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সেখানকার বৌদ্ধরা যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, এবং মধ্যমণ্ডলের প্রতি গান্ধার, কাশ্মীর আর কপিশাবাসীদের যে শ্রদ্ধা ছিল, মিহিরকুলের তা মোটেই ভালো লাগে নি। মিহিরকুল তাঁর নিজের দেশের ভিক্ষুদের প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি সংহার-মূর্তি ধারণ করেছিলেন।

মিহিরকুল পূর্ব থেকে পরাজিত হয়ে রাজধানী শাকলায় এসে দেখলেন, তাঁর ছোট ভাই তাঁর বন্দী হবার খবর শুনে সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে। মিহিরকুল যুদ্ধ করে সিংহাসন পুনরধিকার করার চেয়ে নির্বিবাদে কাশ্মীরে শরণ নেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। বর্তমান রাজা তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু কৃতঘ্ন মিহিরকুল তাঁকে হত্যা করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তারপর শুরু করলেন নরমেধ-যজ্ঞ। ভিক্ষুদের রক্তে তাঁর হাত লাল হয়ে উঠল। শোনা যায়, ষোল শ স্তূপ আর সংঘারাম তিনি ধ্বংস করেছেন। সেই ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে আমি যেবার দেশ ছেড়ে চলে আসি তার আগেই মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি নিশ্চয়ই নরকে গেছেন।

শাকলায় প্রাচীন ইতিহাসের সুন্দর সুন্দর কত গল্পই না শুনলাম। মিহিরকুল সর্বশেষ সত্যস্থবির সিংহকে হত্যা করেছিলেন। সে অনেকদিন আগেকার কথা নয়, মাত্র কয়েক বছর আগেকার কথা। এক সময় শাকলা মিহিরকুলের চেয়েও শক্তিশালী রাজা মিলিন্দ (মিনান্দর)-এর রাজধানী ছিল। মিলিন্দ যবন (গ্রীক) হয়েও তথাগতর শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। লোকে তাঁকে অশোক আর কণিষ্কের মতো ধর্মরাজ বলে। অর্হৎ নাগসেন মিলিন্দকে যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন সেই 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' আমি বুদ্ধিলের দয়ায় কাশ্মীরে এসে পড়েছি। যবন রাজার সেই বিরাট রাজধানী শাকলা আমি নিজের চোখে দেখলাম। এখন সেখানে বড় একটা সংঘারাম আছে। এই সংঘারামেরই আচার্য বসুবন্ধু তাঁর 'পরমার্থ সত্যশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন। নাগসেনও এই বিহারে ছিলেন। ভদ্রকল্পের চারজন বুদ্ধ এখান থেকেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের পদচিহ্ন এখনও আছে।

পাহাড় থেকে নামার পর আমাদের পথ নিরাপদ ছিল না। বড় বড় জঙ্গল।

সেইসব জঙ্গলে বাঘ আর সিংহ। পশুশত্রুর চেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষশত্রু। তাই এক শ কি দু শ জনের বড় বড় সশস্ত্র সার্থের সঙ্গে পথ চলতে হ'ত। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত বড় যে, তা পার হতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যেত। বাইরে আসার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতাম, যেন কালের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়েছি। কেবল নগরেই বণিক্ আর যাত্রীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন। আমাদের দুজনের কিন্তু কোথাও কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে হয় নি। বাঘ-সিংহেরও না, দস্যুরও না। এ দৈবযোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

শাকলা থেকে এগিয়ে গিয়ে আমরা চীনভুক্তিতে এসে পৌঁছুলাম। তখন কি আমি জানতাম যে, আমার শেষজীবনটা মহাচীনেই কাটাতে হবে! যাক সে কথা। চীনভুক্তি এক সমৃদ্ধ দেশ। প্রচুর ফসল হয় এখানে। গাছপালাও আছে অনেক। শিল্পকলাতেও খুব উন্নত। তথাগতর শ্রাবক তার তীর্থিকদের মনোমতোও বটে। জায়গাটার নাম চীনভুক্তি হল কেন, সে তো আগেই বলেছি। মহাচীনের রাজকুমারকে কণিষ্ক বন্দী করে এনেছিলেন। বন্দী রাজকুমারের প্রতি তিনি যথোচিত সম্মান স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্তে এই ভুক্তি (জেলা) তাঁকে দান করেছিলেন। তাই এই জায়গার নাম চীনভুক্তি। রাজকুমার শীতের সময় এখানেই থাকতেন। চীন থেকে তিনি ন্যাসপাতি আর অন্ত কত ফুলফল এনে এখানে লাগিয়েছিলেন। ন্যাসপাতিকে তাই এখানে 'চীনা রাজকুমার'ও বলা হয়।

চীনভুক্তির প্রধান নগর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কুড়ি যোজন যাবার পর আমরা পাহাড়ের মধ্যে তমসাবন সংঘারামে পৌঁছুলাম। এ অতি প্রাচীন বিহার। এখনও এখানে কয়েক শ সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু থাকেন। তথাগতর নির্বাণের তিন শ বছর পরে কাত্যায়নীপুত্র এই জায়গায় তাঁর শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। রাজা অশোক এই পাহাড়েই বাট হাত উঁচু স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

তমসাবন থেকে ছ যোজন উত্তর-পূর্বে জলন্ধর। ধনধান্তে ভরা এই দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে বহু সংঘারাম আছে, বহু ভিক্ষু আছেন—হীনযান আর মহাযান দুই সম্প্রদায়েরই। তাছাড়া পাশুপত (শৈব) ধর্মাবলম্বীও আছেন অনেক। জলন্ধর নগরের তিন দেবালয়ে কয়েক শ সাধু থাকেন। কিন্তু এ স্থানের নাম জলন্ধর হ'ল কেন? জলন্ধর তো কাশ্মীর আর কেদারখণ্ডের মধ্যেকার হিমালয়ভূমির নাম—যেখান থেকে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী আর চন্দ্রভাগা

যার হয়েছে। নিচের দেশটাও এক সময় জলন্ধরের রাজার অধীন ছিল। তাই তার নাম জলন্ধর।

জলন্ধর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে আমরা এলাম মধ্যমণ্ডলের শ্রুঘ্ন নগরে। যমুনার পশ্চিম তীরে শ্রুঘ্ন নগর। এই রাজ্য পূর্বে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে পাহাড়। শ্রুঘ্ন নগরে পাশুপাত আর অন্য ধর্মের প্রসার আছে। ভিক্ষু খুব কমই আছেন। যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই হীনযানী। এখানকার ভিক্ষুদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দূরদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে নগরের পূর্ব-দ্বারের বাইরে যমুনার ধারে অশোকের তৈরি এক স্তূপ আছে। ভগবান তথাগত চারিকা করতে করতে এখানে এসে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই স্তূপের পাশে আরও অনেক স্তূপ আছে। এইসব স্তূপে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র আর মৌদ্গল্যায়নের অস্থি-ধাতু আছে। এখানেও তথাগতর চুল আর নখ-ধাতু রক্ষিত আছে।

শ্রুঘ্ন থেকে বত্রিশ যোজন দূরে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে পাহাড় থেকে নিচে নেমেছে। পুণ্য অর্জনের জন্য বহু লোক এখানে গঙ্গাস্নান করতে আসে। বহু জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য কত লোকই-না গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। যাদের সে সৌভাগ্য হয় না তাদের অস্থি এনে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। কণখল (মায়াপুরী) নামে প্রসিদ্ধ এই জায়গা পাশুপতদের কাছে বড় পবিত্র।

শতদ্রুর পূর্বদিকে আসার পর মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। কেবলই মনে হতে লাগল, মধ্যমণ্ডলের যেখান দিয়ে আমি চলেছি, লোকনায়ক বুদ্ধ একদিন সেখানে বিচরণ করতেন। আজও তাঁর চরণধূলি এখানে পড়ে আছে। এখানেই যমুনা আর গঙ্গার মধ্যভাগে কুরুভূমি। তই কুরুভূমিতে তথাগত কত গভীর উপদেশই ন দিয়েছিলেন। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' আর 'মহানিদান'-এর মতো তথাগত দর্শন সারভূত সূত্র এখানেই প্রচার করা হয়েছিল। কুরুভূমি থেকে তথাগতর জন্মভূমি অনেক দূর। এখান থেকে শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ আর বারাণসী পৌঁছুতে বেশ কয়েক মাস লেগে যায়।

হীনযান আর মহাযান—এই দুই সূত্র আর বিনয়েই বুদ্ধিল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন—প্রাচীন আচার্যরা এই সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, কুরুদেশ এত সুন্দর তার জলবায়ু এত ভালো যে, সেখানকার লোকেরা সবাই বুদ্ধিমান, বিদ্যার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ। সেখানকার মেয়েরা ঘাটে জল

নিজে গিয়েও ধর্ম আর দর্শন নিয়ে আলোচনা করে। তাঁরা আরও লিখেছেন, ভগবান তথাগত যেখানে তাঁর অনাত্মবাদের কথা বলেছেন, ঠিক সেইখানে কয়েক শতাব্দী আগে প্রবাহণ আর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের আত্মবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। আত্মবাদের সূতিকাগৃহে এসে তথাগত অনাত্মবাদের সিংহনাদ করলেন।

আমরা শুধু আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্র আর রীতিনীতির কথাই জানি। রীতিনীতির মধ্যে কেবল মহাযান তথা সর্বাস্তিবাদ। কিন্তু বুদ্ধিলের জ্ঞান ছিল ব্যাপক। ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। তাই ব্রাহ্মণশাস্ত্র আর রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। আবার হীনযানের অনেক নিকায়-গ্রন্থও তিনি পড়েছিলেন। যদিও তিনি অনেক কথাই বিশ্বাস করতেন না, অনেক পবিত্র ধারণাকে অন্ধ বিশ্বাস বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন, তবু তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। সকলের সঙ্গেই তিনি মধুর ব্যবহার করতেন। যে পথ তিনি সবাইকে অবলম্বন করতে বলতেন সে পথ সম্বন্ধে আমার কোনো আশাই ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিলকে কখনও নিরাশাবাদ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। তিনি বলতেন—সত্যযুগ চলে যায় নি, সামনে আসছে। জ্ঞানের আলোয় মানুষের চোখ খুলছে। অজ্ঞানের অন্ধকার যতই কেটে যাবে ততই জনহিতের পথ প্রকাশমান হয়ে উঠবে।

বুদ্ধিলের আনন্দ বিগতকালের কথায়—ইতিহাসের পাতায়। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন বন্ধুর সঙ্গে আমার বহু বছর কেটেছে।

শ্রুঘ্নরাজ্য কুরুরাজ্যের মধ্যে ছিল। তার রাজধানী ছিল যমুনার দক্ষিণ তীরে। গঙ্গা পার হলে দেশ। পঞ্চালের নাম আমি সূত্রাবলীতে পড়েছিলাম। কুরু-পঞ্চাল জোড়া নাম। প্রবাদ আছে, ভৃম্যশ্ব রাজার পাঁচটি ছেলে ছিল। পাঁচ ছেলেকে তিনি তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। পাঁচ ছেলের আলয় থেকে পঞ্চাল। এই রাজাদের কালেই বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আর ভরদ্বাজের মতো ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাই বেদের সব চেয়ে পুরনো মন্ত্র রচনা করেছিলেন। একসময় কুরু আর পঞ্চাল বিদ্যা আর সংস্কৃতিতে জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয় ছিল। আজ এখানকার মাটি শস্যশ্যামলা। অনেক গ্রাম আর নগর আছে এখানে। কিন্তু আজকের প্রতাপশালী রাজা মধ্যমণ্ডলের পূর্বদিকে থাকেন। তাঁর কেন্দ্র মগধ আর কোশল। সেখানে নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ আর গুপ্ত বংশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু .ম্লেচ্ছদের শক্তি আবার অন্যদিকে মোড়

ছিল। পঞ্চাল আবার লক্ষ্মী আর সরস্বতীর কেন্দ্রভূমি হ'ল। এবং এখানেই স্থাপিত হ'ল রাজধানী কান্যকুব্জ (কনৌজ)।

বুদ্ধিল বললেন : পঞ্চাল আগে উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে যমুনা পর্যন্ত গঙ্গার দু ধারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের সময়ে গুরু দ্রোণাচার্য পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করেছিলেন। পঞ্চালরাজের কাছে শুধু দক্ষিণ-পঞ্চালই থেকে গেল। উত্তর-পঞ্চাল দ্রোণাচার্য অধিকার করলেন। সেই থেকে পঞ্চাল উত্তর আর দক্ষিণ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একভাগের রাজধানী হ'ল অহিচ্ছত্রা আর অন্য ভাগের কাম্পিল্য। পরে কাম্পিল্যের প্রাধান্যও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন কান্যকুব্জ কেবল দক্ষিণ-পঞ্চাল কিংবা সমগ্র পঞ্চালের রাজধানী নয়, প্রায় সারা মধ্যমণ্ডলের রাজধানী। কুরু, পঞ্চাল, কোশল, কাশী, বজ্জী, বিদেহ, বৎস আর চেদী, সূরসেন (ব্রজ) আর দশার্ণ (বুন্দেলখণ্ড) প্রভৃতি দেশ কান্যকুব্জের রাজা মৌখরী ঈশ্বরবর্মার অধীন।

গঙ্গা পার হয়ে আমরা উত্তর-পঞ্চাল (রুহেলখণ্ড)-এর শস্যশ্যামলা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলাম। পথ আমাদের কণখল থেকে প্রায় দক্ষিণেই রয়েছে। শীতের ক্ষেতে যব আর গমের সবুজে বাতাসের ছোঁয়া লেগে অপূর্ব ঢেউ জেগেছে। অহিচ্ছত্রায় এখনও ছোট এক রাজা আছেন। কান্যকুব্জের অধীন তিনি। নগরের অস্তিত্ব আজও আছে। কিন্তু সে বৈভব কোথায়? পাশুপত আর বৌদ্ধ—দুই ধর্মের লোকই আছে এখানে। আর আছে পশুপতির অনেকগুলি মন্দির। মন্দিরে বহু পাশুপত সাধু আছেন। রাজধানীর বাইরে নাগসরোবর। নাগসরোবরের ধারে অশোকের তৈরি এক স্তূপ। শোনা যায়, তথাগত এখানে নাগরাজকে সাতদিন ধরে উপদেশ দিয়েছিলেন। পাশেই ভদ্রকল্পের চার বুদ্ধের আগমনের স্মৃতিতে চারটি স্তূপ। বিহারগুলিতে শক-ক্ষত্রপ করগুলের তৈরি একটি বিহারও আছে। বুদ্ধিল একটি পাষাণমূর্তির ওপর 'ভিক্ষুস্য ধর্মঘোষস্য করগুলবিহারো অহিচ্ছত্রায়া' লেখা দেখে বললেন : তথাগত ভিক্ষুদের অপরিগ্রহী হতে বলেছিলেন। তাঁদের সোনা-রূপো স্পর্শ করা নিষেধ ছিল। আর শরীরে আটটি ধাতুর অতিরিক্ত কোনো কিছু রাখার অধিকারও ছিল না।

কিন্তু ভিক্ষু ধর্মঘোষ তথাগতর শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে করগুল বিহারে একটি মূর্তির তৈরি করে সোনা-রূপো প্রদর্শন করেছেন। আমরা করগুল বিহারেই উঠেছিলাম। এখানকার ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যার সমাদর আছে। তাই তাঁরা

আমার তরুণ বন্ধু বুদ্ধিলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা ছিলাম মহাযানপন্থী। কিন্তু ভিক্ষুদের জন্ত মহাযানের কোনো বিনয়পিটক নেই। তাই তাঁরা বিনয়ে কোনো-না-কোনো হীনযানী নিকায় মানেন। আমরা মূল সর্বাস্তিবাদের বিনয়ের অনুযায়ী ছিলাম। দরকার পড়লে আমাদের নিকায়-বিষয়ক সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়ে বোঝাপড়া করতে হ'ত। মহাযানের উদার শিক্ষা আর তার চেয়েও বেশি বসুবন্ধু এবং দিগ্‌নাগের 'প্রমাণশাস্ত্র' মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করেছে। তাই অন্তত বিদ্বানদের মধ্যে সমদর্শিতা আর স্নেহের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

করগুল-বিহারের পুরনো স্তূপ, প্রতিমাগৃহ আর প্রতিমা সবই লাল পাথরের তৈরি। অবশিষ্ট সব ধূসর পাথরের। বুদ্ধিল বলেছিলেন, শক-ক্ষত্রপদের রাজধানী ছিল মথুরায়। মথুরার কাছে প্রচুর লাল পাথর পাওয়া যায়। তাই এখানে লাল পাথরই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। মথুরার প্রস্তরশিল্পীদের তৈরি লাল পাথরের মূর্তি নৌকোয় করে দূর দেশেও পাঠানো হয়। গুপ্ত রাজাদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র আর সাকেত (অযোধ্যা)। তাঁদের আমলেই গঙ্গার দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের পাথরের ব্যবহার বেশি হতে লাগল। পুরনো নগর আর রাজধানী, পুরনো বিহার আর স্তূপ—এসবের জীর্ণদশা দেখে আমার বড় দুঃখ হ'ল। অহিচ্ছত্রারও চারিদিকে বিষণ্ণতার ছায়া। বুদ্ধিলের তো কথাই ছিল : বিনাশ ছাড়া সৃষ্টি হয় কী করে? সংহার ছাড়া সৃজন কোথায়?

কখনও; কখনও আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম : তোমাকে সংহারবাদী বলা উচিত।

তিনি হেসে বলতেন : সংহারবাদ, ক্ষণিকবাদ, সর্বানিত্যবাদ সবই এক। আপনি বৌদ্ধ, সুতরাং এ কথা আপনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু শুধু সংহারবাদ মানুষকে নিরাশবাদী করে তোলে। তথাগত দুঃখকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি কেবল দুঃখবাদী ছিলেন না। কারণ, তিনি দুঃখকে নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার পথকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকম কেবল সংহারই নয়, তার পরে সৃষ্টিই আমাদের ইষ্টবস্তু।

অহিচ্ছত্রায় আমরা দুজনে বহুবার পাশুপত পরিব্রাজকদের মঠে গিয়েছি। বুদ্ধিল কখনও প্রতিষ্ঠা কিংবা সম্মানের জন্ত লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু যেখানেই তিনি যেতেন, প্রতিষ্ঠা এসে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত, ফুলের মালা তাঁকে সম্মানিত করত। তাঁর বিদ্যা, ধৈর্য আর সবচেয়ে বড় তাঁর মধুর

প্রভাব বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাশুপত পরিব্রাজকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। তাঁরাও তাঁকে সম্মান করতেন। পরিব্রাজক কিংবা ভিক্ষু, তিনি তথাগতর অনুগামী হোন কিংবা পশুপতির—সকলেই পর্যটক। সকলেই দেশ পর্যটন করে বেড়ান। পর্যটনই পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এনে দেয়। ধর্মীয় মতভেদ তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। পাশুপত পরিব্রাজকেরা অঙ্গে শ্বেতভস্ম ধারণ করেন, মাথায় তাঁদের বড় বড় জটা। তাঁরা তিতিক্ষা আর ব্রত নিয়েই থাকেন। তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী। তাই উচ্চবর্ণের মধ্যে তাঁদের সম্মান বেশি। সাম্প্রদায়িক ধারণা অনুযায়ী বৌদ্ধদের তাঁরা হীন জাতি মনে করে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা জানেন, বৌদ্ধরা বেশির ভাগই পণ্ডিত, প্রমাণ আর যুক্তি দিয়ে কথা বলেন। তবু কখনও কখনও রসিক পাশুপতরা পণ্ডিত বুদ্ধিলের সঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে আসতেন। কিন্তু বুদ্ধিলের অগাধ পাণ্ডিত্য আর অদ্ভুত তর্কশক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় স্বীকার করতে হ'ত। বুদ্ধিল কিন্তু এতে কখনও খুশি হতেন না। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করতে চাইতেন না। তিনি সকলেরই গুণ দেখতেন। বলতেন: যারা শুধু অন্যের দোষ দেখে তারা নিজেরাই জ্বলে মরে। শাস্ত্র-অধ্যয়নে মানুষের চোখ খুলে যায়। কিন্তু তার কূপমণ্ডূকতা দূর করতে হলে দেশ-পর্যটনও দরকার। দেশ আর কালের সঙ্গে পরিচয় হলে পৃথিবীর পরিবর্তনের ধারাটিও জানা যায়।

ফরগুলের নামেই অহিচ্ছত্রায় এই বিহার। ফরগুল ছিল একজন শক। সমস্ত প্রাচীন পবিত্র স্থানে শকদের তৈরি বিহার দেখা যায়। শকদের কিছু আগে যবনরা এসেছিল আমাদের দেশে। শক আর যবন দুই-ই তথাগতর ধর্মে সাম্য আর সমদর্শিতার ভাব লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ লক্ষ শক আর যবন থেকে গেল এখানে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিজেদের বর্ণ-মর্যাদা অথবা বর্ণ-সংকীর্ণতার জন্য মন থেকে তাদের সমান জ্ঞান করতে চাইত না। অবশ্য শাসনদণ্ডের ভয়ে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিল। তথাগত বর্ণ, জাতি ও কুলের বিভেদ মুছে ফেলে মানুষমাত্রকেই সমান জ্ঞান করতে বলেছেন, সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব এনে দিয়েছেন। আর তাই বৌদ্ধবিহার আর বৌদ্ধকুলেই শক-যবনদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। এই কারণেই শকেরা ফরগুল বিহারের মতো শত শত বিহার তৈরি করিয়েছে। রাজদণ্ড যার হাতেই থাক, সে ইচ্ছে করলে উচ্চকুলের ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারত। দিন যেতে লাগল। বর্ণধর্মের পক্ষপাতীরা নিজেদের দুর্বলতার

কথা বুঝতে পারল। আজ তো মনে হয়, শক আর যবন আমাদের দেশে নেই-ই। তার কারণ, তাদের অনেকে ক্ষত্রিয় হয়েছে, ব্রাহ্মণ হয়েছে। আজও তাদের মন্দিরে মন্দিরে সূর্যের পূজা হয়। সূর্যমূর্তির পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। শকেরা যে জুতো পরে শীতের দেশ থেকে ভারতে এসেছিল, এ সেই জুতো। গরম দেশের অনুপযোগী হলেও এই জুতো তারা বেশ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত সব সময় না হলেও বিশেষ বিশেষ সময়ে পরত। আজ এই জুতো দেখতে চাইলে তুখার আর কম্বোজ দেশে যেতে হবে। আমাদের কোনো মন্দিরে দেবতার পায়ে কি জুতো থাকতে পারে? এই সূর্য-পূজক শক-ব্রাহ্মণ কি আজ জুতো পরে 'মন্দিরে দেবতার সামনে যেতে পারে, না কাউকে যেতে দিতে পারে? কিন্তু আজকের এই শক-ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা যখন এ দেশে প্রথম জুতো-পরা সূর্যের পূজা আরম্ভ করেছিল তখন তারা নিজেরাও জুতো পরে মন্দিরে যেতে পারত। অত্যন্ত শীতের দেশে, যেখানে ক্ষণকালের জন্য পা খালি রাখলে ঠাণ্ডায় পা অসাড় হয়ে যায়, সেখানে খালি পায়ে দেবালয়ে যাওয়া নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়"। দেশ-কাল অনুসারে ব্যবহারও পরিবর্তন করতে হয়। শক, যবন আর যেথারা আগে খুব ফর্সা ছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলির সময় ব্রাহ্মণদেরও নাকি তাদের মতো কপিলবর্ণ দেহ আর পিঙ্গলবর্ণ কেশ ছিল। কিন্তু চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে বাস করার পর এখন তাদের রূপে এই দেশের প্রভাব পড়েছে। রঙ বদলেছে।

বুদ্ধিল বলেছিলেন: আমাদের বংশ শক-ব্রাহ্মণদের বংশ। মথুরার মতো তাদের উজ্জয়িনী নগরীও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত শক-ক্ষত্রপ আর মহাক্ষত্রপদের রাজধানী ছিল। সেখানকার ব্রাহ্মণরাই সর্বপ্রথম তাদের উচ্চকুলীন বলে মানতে শুরু করেছিল। আজ তাদের বংশধরেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাদের পুরনো যজমানেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। যে সময় তারা এ দেশে এসেছিল সেই সময় শকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রের প্রভেদ ছিল না। যার ইচ্ছা, সেই দেবতাদের পূজা করতে পারত। যুদ্ধের সময় সকলেই অস্ত্রধারণ করত, শান্তির সময় সকলেই পশুপালন করত। আজকের উদ্যান আর কপিশার যেথাদের মতো তারাও তখন যাযাবর ছিল। তাদের মধ্যে সামন্ত আর সাধারণে পার্থক্যও ছিল। আমার মনে হয়, শকদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় হয়েছে তারা এই সামন্তকুলেরই অন্তর্গত ছিল। তাদের অনেকে গোরু-ভেড়া কিংবা ঘোড়া চরিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। পরে তারা চাষী

হয়েছে। আজ রাজশক্তি না থাকার দরুণ তাদের প্রতাপ, আর ধনসম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের সাধারণ বৈশ্য কিংবা শূদ্রের মতো মনে হয়। আজও তারা তথাগতর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। কিন্তু উচ্চস্তরের লোকেরা এখন বেশির ভাগই তথাগতর ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণদের অনুগামী হয়েছে। কারণ, আমাদের ধর্মই মানুষে-মানুষে প্রভেদ না করে সকলকে সমান অধিকার দিতে পারত। কাউকে উঁচু জাতি আর কাউকে নিচু জাতি বলা আমাদের ধর্মের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদেরই বংশ আজ ব্রাহ্মণ হয়ে সর্বত্র যে আদর-সম্মান পাচ্ছে, তথাগতর ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকলে কি তা পেত? ক্ষত্রিয়, বিশেষ করে রাজাদের মধ্যে আজ বেশির ভাগই তো শক-সন্তান। একে উলটো গঙ্গা বলতে পারি। মানুষে-মানুষে সাম্য প্রচার করে এখন আবার বর্ণ আর জাতির বৈষম্য বিস্তার করা হচ্ছে।

অহিচ্ছত্রায় আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম। জায়গাটা আমাদের ভালো লেগেছিল। সেখানকার মানুষজনকেও। সেখানকার পরিব্রাজক আর গৃহস্থ, সবার মধ্যেই ছিল শালীনতা, সহানুভূতি আর বিদ্যানুরাগ। অহিচ্ছত্রা থেকে আমরা গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম দিকে যেদেশে গিয়ে পৌঁছুলাম, বুদ্ধিলের মতে সেদেশ হচ্ছে দক্ষিণ-পঞ্চাল। কাম্পিল্য এখন একটি গ্রাম মাত্র। তার আশপাশে পুরনো নগরের ধ্বংসাবশেষ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বুদ্ধিলের মতে তথাগত যখন এখানে এসেছিলেন তখন এই দেশকে বলা হ'ত কিম্বিলা।

সেখান থেকে আমরা গেলাম সংকাস্য। সংকাস্যও তার অতীতের বৈভব হারিয়ে ফেলেছে। কাম্পিল্য, সংকাস্য আর অহিচ্ছত্রার মতো কত প্রাচীন নগরের বৈভব হরণ করে কান্যকুব্জ আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। গঙ্গা থেকে দূরে ছোট্ট এক নদীর তীরে সংকাস্য। ছোট্ট নদীটি কান্যকুব্জের ধারে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। এই নদীতে বর্ষা ছাড়া অন্য সময় বড় বড় নৌকো আসতে পারে না। তাই বারো মাস নদীপথে বাণিজ্যও হয় না। সেদিক থেকে কান্যকুব্জ কিন্তু ভাগ্যবান্। কাম্পিল্য নগরীও এক সময় তা-ই ছিল। সংকাস্য বৌদ্ধদের পুণ্যভূমি। কারণ, তথাগত তাঁর মা মায়াদেবীকে উপদেশ দিতে গিয়ে স্বর্গলোকে একবার বর্ষাবাস করেছিলেন। তারপর আবার নেমে এসেছিলেন এই সংকাস্যে। দেবলোক থেকে নামার সময় তাঁর ডাইনে আর বাঁয়ে ব্রহ্মা আর ইন্দ্র ছত্র-চামর ধারণ করেছিলেন। বুদ্ধিল অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, এ হ'ল সম্পূর্ণ বানানো গল্প। তাই বলে সংকাস্যের ভিক্ষুদের

কাছে এ কথা বলে তাঁদের শত্রু হতে তিনি রাজী ছিলেন না। অহিচ্ছত্রার মতো এখানেও সম্মিতীয় নিকায়ের ভিক্ষু আছেন। পাশুপতদের মঠ আর দেবালয় আছে অনেক। সংকাশ্যর মুখ্য বিহারটি বড় সুন্দর। তথাগত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক থেকে যে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিলেন সেই তিনটি সিঁড়িও এখানে আছে। বুদ্ধিল বলেছিলেন : সুধর্মা দেবসভা আর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক যে ভূগোলে অবস্থিত ছিল, আর্যভট সেই ভূগোলকেই ভেঙে ফেলেছিল। সেখানে দর্পণের মতো উজ্জ্বল বৃষভারূঢ় অশোক-শিলাস্তম্ভ দেখে সত্যিই মনে হয়, অশোকের সময়েও দেবাবতরণের কথা লোকে বিশ্বাস করত।

সংকাশ্য থেকে আমরা নদীর ধারে ধারে চললাম কান্যকুব্জ নগরীর দিকে। উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই পঞ্চালই ধনধান্যে ভরা সমৃদ্ধ দেশ। পথে আমরা বন-জঙ্গল বড় একটা দেখতে পেলাম না। খালি গ্রামের পর গ্রাম। মাঝে মধ্যে ফসলের ক্ষেত। বহুদূর পর্যন্ত যব আর গমের ক্ষেত। গ্রামেব ধারে আমবাগান। রাজধানীর অধিবাসীরা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বাগান করেছে। নগরী থেকে কয়েক ক্রোশ দূর পর্যন্ত দেখা যায় রাজা, রাজকুমার আর রানীদের বাগান, আর সেই সব বাগানের ভেতর ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। রাজধানী লক্ষ্মীর আবাস। কিন্তু শত্রু রাজা যখন অভিযান চালায় তখন এখানেই সব চেয়ে বেশি মৃত্যুর লীলা আর সংহার দেখা যায়। কান্যকুব্জ গঙ্গার পশ্চিম তীরে একটি নগর হিসাবে আগেও ছিল। রাজধানী হয়েছে মৌখরীদের জন্য। কিন্তু মৌখরীরা পাটলিপুত্র কিংবা সাকেত ছেড়ে এখানে কেন রাজধানী তৈরি করল ? বারাণসী আর কৌশাম্বীর মতো আরও প্রাচীন এবং ভব্য নগরও তো ছিল। বুদ্ধিলকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন : মধ্যমণ্ডলের সবচেয়ে প্রচণ্ড শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের পশ্চিমভাগেই বেশি প্রস্তুতির দরকার ছিল। যবন আর শক এদিক দিয়েই এসেছিল। তাদের প্রতিহত করতে গেলে পাটলিপুত্র অনেক দূর পড়ে। কান্যকুব্জ গঙ্গার তীরে এবং পশ্চিম সীমান্তের ধারে। তাই স্কন্ধাবার (সৈন্যশিবির)-এর উপযুক্ত স্থান। স্কন্ধাবার হিসাবেই এই নগর আরম্ভ হয়েছিল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্কন্ধাবার থেকে পরে এক বিরাট নগরীতে পরিণত হয়েছিল। যেখানে মধ্যমণ্ডলের শত্রু ছিল। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে এসেছেন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা। মৌখরীরাও নিজেদের বংশ স্থাপন করে একেই তাদের নগরী করেছে।

—তাহলে তোমার মতে মধ্যমণ্ডলের প্রচণ্ড শত্রু পশ্চিমদিক থেকে আসে বলে রাজধানীও পশ্চিমদিকে সরে এসেছে ? তাই যদি হয়, তবে পূর্বভাগের কখনও মধ্যমণ্ডলের রাজধানী হবার সৌভাগ্য হবে না। আর গঙ্গার মতো মহানদীর তীরে অবস্থিত বলে কান্যকুব্জ বরাবরই মধ্যমণ্ডলের রাজধানী থাকবে।

—বরাবরের কথা কে বলতে পারে ? আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, কান্যকুব্জের অবস্থান সৈন্য এবং বাণিজ্য দুইয়েরই পক্ষে অনুকূল। মৌখরীদের সৈন্য দেখে পশ্চিমের কোনো শত্রু সহসা কান্যকুব্জের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেবার সাহস করবে না। রাজধানী তো কেবল ধনসম্পত্তির ভাণ্ডার নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে তাকে শত্রুর নাগাল থেকে অনেক দূরে রাখার চেষ্টা হ'ত। রাজধানী আবার সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তিশালী স্কন্ধাবারও। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই রাজধানী থাকা দরকার। পশ্চিমের শত্রুদের জন্য স্থাণ্বীশ্বরের আশপাশের জায়গাই হ'ল এমন যুদ্ধক্ষেত্র। সুতরাং যতদিন নদীপথে যাতায়াতের সকল রকম সুবিধা থাকবে ততদিন কান্যকুব্জই থাকবে মধ্যমণ্ডলের রাজধানী।

গুপ্তরা যখন হরিবর্মাকে পশ্চিম স্কন্ধাবারের মুখ্য সেনাপতি করে কান্যকুব্জে বসিয়েছিল তখন কে জানত যে, এই মৌখরী স্কন্ধাবারই একদিন রাজধানীতে পরিণত হবে ?

কান্যকুব্জের ইতিহাস বহু প্রাচীন। কিন্তু তার বৈভবের শুরু হরিবর্মার কাল থেকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কান্যকুব্জ নগর দিন দিন বেড়েই চলেছে। গঙ্গার ধারে ধারে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত তার বিস্তৃতি পরে আরও বিস্তৃতি ঘটবে। চারদিকে তার উঁচু নগর-প্রাকার ; নগরে শত শত সৌধ আর প্রাসাদ। নতুন নতুন সৌধ আর প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে আরও অনেক। এ থেকেই মনে হয়, কান্যকুব্জ নতুন নগর। উপনগরের পুরনো বাগান এখন শ্রেষ্ঠী আর সামন্তদের মহলে পরিণত হচ্ছে। নতুন বাগান তৈরি হচ্ছে দূরে—বহুদূর পর্যন্ত। সেই বাগানে ছোট ছোট সুন্দর বাড়ি, স্বচ্ছ সরোবর আর পুষ্পদল। আমাদের উদ্যানবাসীদের মতো এখানকার এই সমতলভূমির লোকেরাও সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তারা প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না, নিজেরাই সৃষ্টি করে। দেবালয় আর বিহারও নগরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। তাই তার সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন। এখানে নির্গ্রন্থ (জৈন) আর পাশুপত দেবালয় এবং মঠ আছে যেখানে, সেখানে হীনযান আর মহাযান দুইয়েরই অনেক বিহার আছে। তাতে শত শত ভিক্ষু আছেন।

কান্যকুব্জের স্থাপনা সম্পর্কে ভিক্ষুরা বলেন, প্রাচীনকালে পঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্তর কাছে একজন ঋষি এসেছিলেন। রাজা তাঁর সকল কন্যা এই ঋষিকে প্রদান করলেন। কিন্তু রাজকুমারীরা এমন কুৎসিতদর্শন ঋষিকে বিবাহ করতে চাইল না। কেবল সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমারী রাজার অমঙ্গলের ভয়ে বিবাহে রাজী হ'ল। ঋষি যখন এ কথা জানতে পারলেন তখন অন্য রাজকুমারীদের অভিশাপ দিলেন। তারা কুব্জা হয়ে গেল। কন্যাকুব্জা থেকে নগরের নাম কান্যকুব্জ।

ব্রাহ্মণরা বলেন, এ নগরের পূর্বনাম মহোদয়। রাজা কুশনাভের শত কন্যা ছিল। তাদের দুর্ব্যবহারে বায়ু ঋষি অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন। অভিশাপে শত কন্যা কুব্জা হয়ে গেল। মহোদয়ের নাম হল কান্যকুব্জ।

তথাগতর জীবনকালেও এই নগরের নাম কান্যকুব্জই ছিল। বিনয়পিটকের উল্লেখ করে বুদ্ধিল একথা বলেছিলেন।

নগরের উত্তর-পশ্চিমে অশোক স্তূপ। এখানেই তথাগত ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে ছোট এক স্তূপের ভেতর তথাগতর চুল আর নখধাতু রক্ষিত আছে। কান্যকুব্জের বৈভব আজও ঈর্ষার বস্তু—যদিও এক শতাব্দী আগেকার পুরনো এ নগর। আমি কপিশা আর কাশ্মীরের সব নগর দেখেছি। জম্বুদ্বীপের পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগরও দেখেছি। সব জায়গায় দেখেছি গগনচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণীর মাঝে চলেছে রাজপথ। নগরের অভ্যন্তরে রাজভবনগুলো দেখে চোখ ঝলসে যায়। নগরপ্রান্তের উদ্যানপ্রাসাদ যেন স্বর্গরাজ্যের এক অংশ। শালীনতা, স্বচ্ছতা, সাহিত্য, কলা ও ধর্মের প্রতি লোকের অপরিসীম অনুরাগ। আমি শুধু এইসবই দেখতাম। কিন্তু প্রদীপের তলায় যে অন্ধকার তা আমার চোখে পড়ত না। বুদ্ধিল ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি বুদ্ধির পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। কিন্তু হৃদয়ে তাঁর অপার করুণা ছিল। তাঁর শান্ত সুন্দর মুখখানির জন্য তিনি ভিক্ষাও পেতেন বেশি। কিন্তু অত তাঁর লাগত না। বেশিটুকু তিনি তাঁর লোহার ভিক্ষাপাত্রে রেখে দিতেন। কোথাও কোনো বুভুক্ষু, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক বালক দেখলে তাকে খাওয়াতেন। তিনি বলতেন: পৃথিবীতে অপার দুঃখ আছে সত্যি। কিন্তু অকারণে, অর্থাৎ নিসর্গ থেকে কোনো দুঃখ আসে না। কোনো-না-কোনো কারণ থাকেই। দুঃখ যদি অকারণ হ'ত তাহলে তা দূর করার যত চেষ্টা, সব ব্যর্থ হ'ত। দুঃখের কারণ থাকেই। ভগবান তথাগত বলেছেন, এ সংসারে কোনো কিছুই নিত্য নয়। দুঃখের কারণও নিত্য নয়। তাই সেই কারণগুলির

বিনাশ সম্ভব। দুঃখনাশের পথ আছে, উপায়ও আছে। তথাগতর উপদেশিত ধর্ম—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। কিন্তু সংসারে আমরা কী দেখি? শতকরা সত্তর জন লোক দুঃখে আছে। যদি এ সংসারে আমাদের বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় কিছু করতে হয় তাহলে সবার আগে দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা উচিত। মাত্র অল্প কয়েকজন লোক ঐশ্বর্যে ডুবে রয়েছে। তাদের কাছে পৃথিবী স্বর্গ তুল্য। এই স্বর্গলাভ করা নাকি পূর্বকৃত ফল। যদি দশজনের সুখ-বৈভব মেটানোর জন্য নব্বইজনকে পশুর মতো কাজ করতে হয়—এমনকি তার মধ্যে কুড়িজনকে পশুর মতো মালিকের হাতে কেনাবেচা করতে হয়, যদি কর্মবিধানের জন্য অতি বৈষম্যের আবশ্যক হয় তাহলে তথাগত-কথিত দুঃখবিনাশের পথ ভুল হয়ে যাবে। তথাগত বলেছেন, শুধু দুঃখাভিভূত মানুষেরই নয়, অন্য প্রাণীরও সেবা পরম ধর্ম। জাতকের গল্পে সব জায়গায় আমরা তার উদাহরণ পাই।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাল। আমার দৃষ্টি এখন সুরম্য অট্টালিকার প্রতি নয়, জীর্ণ কুটিরের প্রতি। আমার লক্ষ্য এখন হৃষ্টপুষ্ট সুবেশ আর সুন্দর মুখের দিকে নয়, শৈশবে কিংবা তারুণ্যে যারা বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে, দেহ যাদের কঙ্কালসার হয়েছে, নগ্ন বুভুক্ষু জীর্ণশীর্ণ সেইসব লোকের দিকে। এই যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল, সে ঐ বুদ্ধিলেরই জন্য। এটা বুদ্ধিলেরই কৃতিত্ব। আমার যা দোষ তা আমি জানি। আমি পুরোপুরি স্বার্থশূন্য, একথা আমি বলি না। আমি যে ধর্মব্রত গ্রহণ করেছি তা সর্বদা পালন করি, তাও নয়। কিন্তু কারও দুঃখ আমি সইতে পারি না। একে আমার গুণ বলতে পারেন, দুর্বলতাও বলতে পারেন।

কতবার আমার মনে হয়েছে, যদি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, আর আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে এই সংসারের সমগ্র দুঃখের সামান্য অংশও দূর করতে পারতাম তাহলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু তথাগতর জ্ঞানে আলোকিত পথে চলতে গিয়েও আমি সর্বত্র অন্ধকার দেখি। ভাবি, দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কেমন করে দেশবাসী সুখের ছবি দেখবে? কেননা, সেইসব নিপীড়িত দুঃখীর হাতই তো এই সমস্ত অট্টালিকা তৈরি করেছে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য, যা আমি কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ পাবার পর দেখেছিলাম, তা-ও ঐসব অর্ধভুক্ত নগ্নপ্রায় লোকদেরই সৃষ্টি। প্রতিটি অট্টালিকার পাশেই একটা করে ডোবা। ডোবাগুলি দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এইসব

অট্টালিকা তৈরি করতে ওগুলির সৃষ্টি। ঐশ্বর্য, সুখ, রোগশূন্য অবস্থা সর্বত্রই থাকা প্রয়োজন। এগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়।

তথাগত জগতের সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী বলেছেন। মানুষের বুদ্ধি আছে, বীর্য এবং পরাক্রমও আছে। সে নিজের সাধনার দ্বারাই আপন ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারে। তথাগতর পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি দুঃখের সমুদ্রের মাঝে শান্তি এবং ত্যাগের দীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন। যখন কোনো মানুষ নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে তখন সকলের সুখেই তার সুখানুভূতি হয়। বোধিসত্ত্ব যখন তাঁর দেহ এক ক্ষুধার্ত বাঘিনীকে আহার্যরূপে দিতে চেয়েছিলেন এবং সেই বাঘিনী যখন তাঁর দিকে তার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি নিয়ে মুখব্যাদান করেছিল তখন ভয় পাওয়া দূরের কথা, তিনি পরম শান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছিলেন। এরই জন্য একে 'পারমিতা' (পরাকাষ্ঠা) বলা হয়। তথাগত যদি সত্যি সত্যিই দুঃখনাশের পন্থা দেখিয়ে দিয়ে থাকেন, যদি সত্যিই সে রকম কোনো পথ থাকে তাহলে অবশ্যই একদিন সেই পথে চলার মতো লোক জন্মাবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে, যেদিন সারা জগৎ সুখস্বপ্নে ভাসবে, সমস্ত মানুষ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্ হবে? আমাদের উদ্যান প্রদেশেও বৈষম্য ছিল, দুঃখ ছিল। কিন্তু বিশাল প্রাসাদ ও জীর্ণ কুটিরের মধ্যে এবং অন্ত্যজ ও কুলীনের মধ্যে যে দুস্তর বৈষম্য—সেখানে তার কোনো চিহ্ন ছিল না। এক ছিল ধনী আর নির্ধনের পার্থক্য। আর ছিল জাতিভেদ। তার রূপ ছিল ভয়ঙ্কর। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আর রাজা-পুরোহিত নিজেদের পৃথিবীর অধীশ্বর বলে মনে করত, আরামে থাকা-খাওয়া তাদেরই একমাত্র অধিকার বলে জ্ঞান করত। শূদ্র বা চণ্ডালদের কিছুই বলার অধিকার ছিল না। তথাগত এই বৈষম্যের বিরোধীতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ বা কুলীন হয় না। শীল বা সদাচারই মানুষকে বড় করে। কখনও কখনও আমরা দু'জন নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করেছি, কখনও কখনও জাতিধর্মের পক্ষপাতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও আমার বাদানুবাদ হয়েছে। তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, উঁচু-নিচুর পার্থক্যটা প্রকৃতিগত। এরই জন্য উঁচু জাতের লোকেরা ফর্সা হয় এবং নিচু জাতের লোকেরা কালো। এটা ঠিক যে, জম্বুদ্বীপের উঁচু বর্ণের লোকেরা ফর্সাই হয়, তবে কখনও কখনও তাদের ভেতর কেউ-কেউ শামলা কিংবা কালোও হয়। পশুর মত যে সমস্ত দাসদাসীদের কেনাবেচা হয় তাদের ভেতরও কত ফর্সা লোক দেখা যায়। ফর্সা

দাসদাসীদের অনেক দূর দূর দেশ থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনে আনা হয়। তাছাড়া পৃথিবীতে উদ্যান আর কপিশার মতো আরও অনেক দেশ আছে। সেখানকার সব লোকই ফর্সা, এমন কি মধ্যমণ্ডলের লোকের থেকেও অনেক বেশি ফর্সা। আমাদের দেশের নরনারীর মতো সোনালী রঙ, নীল চোখ আর কুঞ্চিত কেশ খুব কমই দেখা যায়। আবার আমি আরব থেকে তুরস্ক দেখেছি, সেখানে কোনো রঙের বা আকৃতির পার্থক্য নেই। মহাচীনেও দাস-দাসী রয়েছে, ধনী-নির্ধন রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন রঙ ও আকৃতিগত পার্থক্য নেই। এটা ঠিক যে, জম্বুদ্বীপে অধিকাংশ দাসদাসী কালো বা শামলা। কিন্তু এর কারণ এই নয় যে, কালো লোক মাত্রেই দাসদাসী, আর শূদ্রচণ্ডাল হবার জন্যই তাদের জন্ম।

আমি যখন তথাগতর চরণধূলির স্পর্শে পবিত্র স্থানগুলিতে যাই তখন সেখানে রক্ষিত পবিত্র ধাতুগুলিকে খাঁটি বলে বিশ্বাস না করলেও তা দেখে আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে যায়। তথাগত এখানে এসেছেন, এখানে ঘুমিয়েছেন, এখানে বসেছেন, এখানে তিনি দুঃখীদের আদিকল্যাণ, মহাকল্যাণ এবং পর্যবসানকল্যাণরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং কত লোক সেই উপদেশ শুনে নিজের স্বার্থের মাত্রা কমিয়েছে আর অন্যের উপকার করেছে।—এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে কিছু সময়ের জন্য আমি আশপাশের যন্ত্রণাময় জগৎ ভুলে যাই। জন্মভূমি ছাড়বার পর এই প্রথম আমি এক শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী নগর কান্যকুব্জকে দেখলাম, আর আমার মনে এই ধরনের চিন্তা জাগ্রত হ'ল।

সাত

আমরা দুজন কান্যকুব্জ ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। গরমের দিন ছিল। কিন্তু আমরা তিন প্রহর দিন থাকতেই চলতে শুরু করি, যাতে অন্ধকার হওয়ার আগেই কোনো বিহারে গিয়ে পৌঁছুতে পারি। কাশ্মীর, কপিশা, তক্ষশিলা, স্রুঘ্ন, কান্যকুব্জ এবং সংকাশ্যের জায়গায় জায়গায় এত ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে যে, আমি ইচ্ছা করলে রাস্তায় যত বিহার পড়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করতে পারি। প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থানের ঠিকানা আমরা যোগাড় করে নিয়েছিলাম এবং সেখানে পৌঁছুবার পর আবার পরবর্তী পথের সন্ধান করতাম। কান্যকুব্জ থেকে আমার লক্ষ্য ছিল কৌশাম্বী।...কান্যকুব্জ, কাম্পিল্য, সংকাশ্য

ও আলবিকা (আলংভিকা) পঞ্চাল দেশে অবস্থিত। আমার কাছে প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল আলবিকা। বুদ্ধি বলেছিলেন. সেখানকার যক্ষ (দেবতা) আলবক পঞ্চালচণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। সে ছিল বড় ক্রোধী। একবার সে বুদ্ধের ওপরই এই ক্রোধ দেখাতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে পরাস্ত হতে হয়েছিল।

কাশ্মীর ছাড়বার পর আমাকে এখন সমতল ভূমিতেই দিন কাটাতে হচ্ছিল। শ্রুঘ্ন আর কণখল ছাড়িয়েও কিছুদূর উত্তরে হিমালয়কে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আমরা হিমালয় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আমাদের রাস্তায় ও আশেপাশে এখানে-সেখানে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এইসব গ্রাম আম আর অন্যান্য গাছে ঘেরা। বড় বড় নগরের বাগানগুলোতে কমলা, আপেল, আঙুর প্রভৃতি আমার চিরপরিচিত ফলের গাছ দেখেছি। কিন্তু এইসব ফলে সেই স্বাদ কই? বিহারের বাগানগুলোতেও সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো ফলের গাছ লাগাবার চেষ্টা দেখেছি। বড় বড় গাছ অথবা আখ আর শাকসবজির ক্ষেতেই গরমের প্রকোপটা বেশি। গ্রামে এছাড়া অন্যান্য ক্ষেতের বাইরে পলাশ, করোদ ও নানারকম গাছ দেখা যেত। জঙ্গল ছিল খুব। তবে হাতী, বাঘ, সিংহ আর চিতার মতো ভয়ঙ্কর জন্তুর বাস ছিল আরও বড় বড় জঙ্গলে. যা হিমালয় আর বিন্ধ্যপর্বতের কাছেই বেশি দেখা যেত। এই জঙ্গলগুলিতে পঞ্চাশ কি এক শ জন লোক মিলে এক-একটা দল করে যেত, ফলে খুব ভয় থাকত না।

আমি এ পর্যন্ত বরাবরই স্থলপথে এসেছি। কান্যকুব্জে এসে স্থির করলাম, যমুনার কূলে পৌঁছে সেখান থেকে জলযাত্রা করব। এইজন্য আলবিকা থেকে যমুনার রাস্তাই ধরেছিলাম। গঙ্গা দিয়ে গিয়ে প্রয়াগে পৌঁছে আবার যমুনা ধরে যেতে হ'ল। সবাই না হলেও মধ্যমণ্ডলের অধিকাংশ লোকই ভিক্ষুদের প্রতি খুব সম্মান দেখাত। কি জলপথে, কি স্থলপথে বণিক্‌সম্প্রদায় পরিব্রাজক সাধুদের দেখলেই সাহায্যে প্রসারিত করত। আলবিকা থেকে আমার রাস্তা ছিল সুদূর দক্ষিণ-পূর্বের দিকে। সেখানে গঙ্গা আর যমুনার মাঝখানের জমি খুবই সুফলা। এই দুই নদীকেই পুণ্যতোয়া মনে করা হ'ত। এই নিয়ে যদি এখানকার লোক গর্ব করে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বস্তুত, নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা আর গর্ব থাকা স্বাভাবিক। যখন কোনো লোক তার নিজের গ্রামের আশেপাশেই বসবাস করে তখন তার এই ধরনের ভালোবাসা নিজের গ্রামকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়। দূরে গেলে নিজের

গ্রামকে বড় মধুর লাগে। যখন আমি যমুনা-গঙ্গার মাঝখানে (অন্তর্বেদ) ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন জানি কতবার উদ্যানের কথা মনে এসেছে। সেই শরলাকৃতি সবুজ দেবদারুর বন আর উচ্ছল নদীর কলকল শব্দ। তবে মধ্যমণ্ডলের লোকেরাও নিজেদের বিশাল ও শান্ত স্রোতস্বিনী নদীগুলির জন্য গর্ববোধ করতে পারে। এখানকার গরম আবহাওয়া হয়তো আমার পক্ষে অপ্রীতিকর ছিল, তবে এই দেশে যে বরাবর বাস করেছে তার কাছে আবহাওয়া সে রকম ছিল না। সময় শেষের ছ মাস আমার কাছে অসহ্য লাগত। আর এই সময় কোথাও যেতে মন চাইত না। গরম হাওয়া লেগে শুধু অসুখ নয়, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। আজ মহাচীনে বসে যখন আমি এই কথা লিখছি তখন আমার কাছে সারা উদ্যান, কপিশা, মগধ অর্থাৎ সারা জম্বুদ্বীপ সমান ভালো লাগছে। কতবার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ইচ্ছা জেগেছে, যেখানে আমার বাল্য আর যৌবন কেটেছে সেখানে আবার ফিরে যাই।

কিন্তু সে এখন স্বপ্ন। পায়ে সে জোর নেই, আয়ুও তেমন না।:আর মনের তেমন সাহস আর উৎসাহ পাই না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিচিত জায়গার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, সে কোথায় যাবে আর কোথায় যাবে না— ঠিক করা বড় মুশকিল হয়ে পড়ে। মানুষের স্মৃতিও বড় মধুর ও অমূল্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তাও কত ভঙ্গুর পাত্রে রাখা। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মধুর স্মৃতি চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। চীনের লোকেদের আমি এর জন্য প্রশংসা করি। তারা এই স্মৃতির কদর করে। তারা তা সুরক্ষিত করে রাখে। আমার জন্মের ১৯।২০ বছর আগে ফা-শীন (ফা-হিয়ান) তাঁর অদ্ভুত আর বিশাল ভ্রমণ সমাপ্ত করে তা লিখে রেখে গেছেন। যদি তাঁর মতো চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী আমি না পড়তাম তবে আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখবার ইচ্ছাই হ'ত না। ফা-শীনকে এখনই লোকে ভুলে যেতে বসেছে। এমন সময়ও আসবে যখন ফা-শীন কোথাকার লোক, সে কথাও লোকে ভুলে যাবে। কিন্তু তিনি যে বিবরণ লিখে রেখে গেছেন তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

আমি এক সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে পথ চলবার পর যমুনার তীরে এসে পৌঁছুলাম। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গা যাওয়ার সুবিধা নিয়ে মানুষ স্বভাবতই চিন্তা করে। আমি ভিক্ষু, স্থলপথে যেতে ঘোড়াগাড়ি, পাল্কি বা অন্য কোনো বাহন গ্রহণ করতে পারি না। আর যদি গ্রহণ করার আদেশ থাকতও, তবু তা আমি কখনই পছন্দ করতাম না। পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করলে

কত রকমারি বৃক্ষ দেখতে দেখতে পথ চলা যায়। তার সৌন্দর্যে মগ্ন থেকে যে আনন্দ লাভ হয়, যানবাহন চড়ে গেলে তা সম্ভব নয়। বস্তুত, এ-ও একরকম লোভই বলা যায়, যার জন্ত আমি নদীপথে চলা পছন্দ করতাম না। যখন কোনো ভ্রমণে দুই সহযাত্রী একই ভাবে চিন্তা করেন এবং তাঁদের রুচিও একই ধরনের হয় তখন সেই যাত্রায় যে কি আনন্দ, যাঁর কখনও এ ঘটনা হয়েছে তিনিই জানেন। আমরা দুজন এই রকমই বন্ধু ছিলাম। প্রয়াগ থেকেই আমরা যমুনা দিয়ে নৌকোয় কৌশাম্বী চলে আসতে পারতাম। কিন্তু বহু জায়গা দেখা আমার ভাগ্যে আর হয়ে উঠল না। যমুনার কূলে যে জায়গায় আমি পৌছুলাম তার নাম ছিল চন্দ্রপুরা। যমুনা কিছুটা গঙ্গারই মতো বিশাল, কিন্তু এই জায়গায় ঘাটগুলো বেশ কিছু উঁচু। চন্দ্রপুরে একটা খুব ভাল বাজার আছে, যার ঘাটে ব্যাপারীদের নৌকো অনবরত আসা-যাওয়া করে। তাই এখানে পৌছে নিশ্চিন্ত হলাম যে, নিচের দিকে কৌশাম্বী পর্যন্ত যাবার নৌকো পেতে অসুবিধা হবে না। পরের দিন আমার গাড়িও জুটে গিয়েছিল। সে গাড়িতে চন্দ্রপুরে নৌকোয় দেওয়ার জন্ত মাল বোঝাই করা ছিল। যেখানেই বড় বড় ব্যবসায়ী ও বেশ ধনী জমিদারের বাস সেখানেই ভালো বিহার বা পরিব্রাজকদের বিশ্রামাগার হওয়া আবশ্যক। চন্দ্রপুরেও একটি ভালো বিহার ছিল, সেই বিহারের ভিক্ষুরাও কিছু স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে বলতে চেয়েছিলেন—শুধু শাক্যমুনিই নন, এমন কি ভদ্রকল্প এবং আরও বহু বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন। এই ধরনের কথা আমি বহু জায়গায় শুনেছি। তাছাড়া বুদ্ধিলও আছে সঙ্গে। কাজেই আমি আর এ সব কথা সহসা বিশ্বাস করতাম না।

স্থানীয় ভিক্ষুরা আমাদের ভালোভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। বুদ্ধিল যেখানেই যান, নতুন নতুন বন্ধু জোটাতে তাঁর দেরি হয় না। আর তাঁর বন্ধুত্ব এমনই জিনিস যে, যতই দিন যায় ততই তা বেড়ে চলে। মোট কথা, যে মানুষ মধুর মতো কথা শোনাতে পারে, সে কাউকে বশ না করে পারে না। বুদ্ধিলের মুখে সব সময়ে হাসি লেগেই আছে। তিনি প্রকৃতই অক্রোধী মানুষ। তিনি যখন আমাকে পড়াতেন তখন নিজেকে আমার একজন বয়স্ক বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি কখনও আমাকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে আমি বহু জিনিস শিখেছি। তিনি নিজের আচরণ দিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন পর্যটক হতে হলে কেমন হতে হয়। চন্দ্রপুরে স্থানীয় ভিক্ষুরা আমাদের এমন এক মালবাহী নৌকোয় পাঠানোর চেষ্টা করেছেন,

যাতে আমাদের কোনো কষ্ট না হয়। কৌশাম্বীর বড় বড় শ্রেষ্ঠীর মধ্যে সুফল শ্রেষ্ঠী একজন। তাঁর পণ্যবাহী নৌকোগুলো পূর্বসমুদ্র (বাংলার খাড়ি) থেকে গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবতী (রাপ্তি), আর মহী (গণ্ডক) হয়ে পাহাড়ে বাধা না পাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ সেই ঘাট অবধি যাতায়াত করত। তাঁর কর্মচারীরা সমস্ত বড় বড় নগরেই ছিলেন। ইচ্ছা করলে কান্তকুব্জেও তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হতে পারত। কিন্তু সে সময় আমার তাঁকে প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রপুর বিহারের স্থবির (মোহান্ত) বলেছিলেন, শ্রেষ্ঠী সুফল মথুরা থেকে ফিরে দু-একদিনের মধ্যেই চন্দ্রপুরে এসে যাবেন। সুফল শ্রেষ্ঠীর কাছে আমাদের খুব বাড়িয়েই তিনি গুণগান করলেন। শ্রেষ্ঠী নিজেও শ্রাবকের ভক্ত ছিলেন। তাঁর গর্ব ছিল তিনি ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর বংশোদ্ভূত। তাঁদের কাছে কৌশাম্বীতে তথাগত বহু বার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, আর ঘোষিতারাম নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘকে তিনি দান করেছিলেন। স্থবিরের কাছ থেকে আমাদের কথা শুনে পরের দিন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে নৌকোয় যাত্রা করি। শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে এক সপ্তাহকাল বেশ সুখেই ভ্রমণ করেছি তা না বললেও চলে। সে ভ্রমণ বেশ জ্ঞানবর্ধকও ছিল। ভিক্ষু আর পরিব্রাজকরা যেমন ভ্রমণ করে নিজেদের জীবন কাটাতেন, শ্রেষ্ঠীরাও তেমনি নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য ভ্রমণ করিতেন। বিশ্বাসভাজন কর্মীদের নিয়ে তাঁরা ব্যবসা চালাতেন, আর যে সমস্ত রাজ্যে ব্যবসা চলত সেইসব রাজ্যের রাজা ও সামন্তদের সঙ্গে তাঁরা নিজেরা দেখাসাক্ষাৎ করতেন। বারাণসী থেকে শ্রুঘ্ন পর্যন্ত মৌখরী পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ ঈশ্বরবর্মার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। আর সুফল শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে মহারাজের যে শুধু পরিচয় ছিল তাই নয়, প্রকৃত বন্ধুত্বও ছিল। তবে পরম ভট্টারকের সঙ্গেই শুধু সম্পর্ক রাখা যথেষ্ট নয়, উপরি (প্রদেশপতি) ও কুমারামাত্য (বিষয়পতি, জেলাধীশ)-দের যদি প্রসন্ন না রাখা যায় তবে তৈরি কাজও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর জন্যই শ্রেষ্ঠীকে প্রত্যেক বছরে কোনো-না-কোনো জায়গায় যেতে হ'ত। শ্রেষ্ঠীর কারবার মগধ ও অবন্তী রাজ্যেও চালু ছিল। তাই তাঁকে সেখানেও যেতে হ'ত।

সূর্যোদয়ের বহু আগেই আমাদের নৌকো যমুনা দিয়ে রওনা হ'ল। স্রোতের অনুকূলে পাল খাটিয়ে চলার অর্থ আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাদের তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঐ ঋতুতে পশ্চিমী হাওয়ায় নৌকোর পাল এমনিতেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গরমকালে জলের ওপরও গরম থেকে রেহাই

পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর নৌকোখানি ছোট্ট সুন্দর এক প্রাসাদের মতো। আরামের সকল ব্যবস্থাই ছিল তাতে। চাঁদোয়া-টাঙানো ছাদের ওপর খস বিছিয়ে তাতে জলের ছিটে দেওয়া হচ্ছিল। জানালা আর দরজাতেও খস। সুসজ্জিত এই বিলাসনৌকোর আরামের কোনো অভাবই ছিল না। শ্রেষ্ঠীর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বছর। তাঁর স্ত্রী তাঁর চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের ছোট। বাড়িঘরের কাজকর্ম বড় ছেলেই দেখাশোনা করে। শ্রেষ্ঠীপত্নী সারা সময় পুজাপাঠ আর কথোপদেশেই কাটান। যাত্রাপথে যেখানেই তথাগতর কোনো পদচিহ্ন আছে শুনতেন সেখানেই যেতেন, আর ভিক্ষুদের দানধ্যান করতেন। শ্রেষ্ঠীর নৌকোর সঙ্গে ছিল আরও চারটি নৌকো। তাতে ছিল তাঁর রক্ষী আর পরিচারকবৃন্দ। যেখানে সম্পত্তি সেখানেই ভয়। যদিও মৌখরী ঈশ্বরবর্মার শাসন খুব দৃঢ় এবং শান্তিপূর্ণ, তবু যতদিন সুখ আর সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের ভাগ্যের লিখন হয়ে থাকবে ততদিন সমাজে চোর আর দস্যুও থাকবে। তাই সব সময়েই জলসার্থ কিংবা স্থলসার্থ—সার্থবাহেরা সকলে দস্যুর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়েই যায়। বাণিজ্যতরীও তাই দু-একটা নয়, কয়েক কুড়ি একসঙ্গে চলে। প্রয়োজন মতো তাতে সশস্ত্র যোদ্ধাও থাকে, আবার অন্য সকলের হাতেও অস্ত্র থাকে। সুফল শ্রেষ্ঠীর নৌকোর সঙ্গে পঞ্চাশজনেরও বেশি যোদ্ধা ছিল। অবশ্য যেখানে ভয় ছিল সেখানে রাত্রে যাত্রা করত না।

বর্ষাকালে নদী জলে ভরে যায়। জলস্রোত তীব্র হয়। কোথাও কোথাও তা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বন্যা হলে তো কথাই নেই, গাছপালা সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন সাবধানে নৌকো চালাতে হয়। শ্রেষ্ঠী বললেন: শীত আর গ্রীষ্মের চেয়ে বর্ষাকালেই নৌকাযাত্রায় বিপদ বেশি। কিন্তু মানুষের জীবন কবে এমন হয়েছে যে, কোনো বিপদের দেখা মেলে নি? বর্ষাকালেই তো দূরদেশে বাণিজ্যতরী নিয়ে যাওয়ার সুবিধা। তখন ছোট ছোট নদীতেও এত জল থাকে যে, বড় বড় নৌকো অনায়াসে যেতে পারে। দেশে বড় নদীর চেয়ে ছোট নদীই বেশি। তাই বর্ষকালেই নৌকোযাত্রার ধুম পড়ে যায়। তাছাড়া আরও কারণ আছে—স্থলপথের চেয়ে জলপথে খরচ কম, এবং কখনও কখনও সময়ও কম লাগে।

শ্রেষ্ঠীর নৌকো চলেছিল মন্থরগতিতে। প্রয়োজন না হলে পাড়ে নৌকো ভিড়ছিল না। চন্দ্রপুর থেকে কৌশাম্বীর মধ্যে নৌকো ভেড়ানোর জায়গাও

বেশি ছিল না। তবু সকাল-সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য নদীর কোনো ঘাটে নৌকা দাঁড়িয়ে পড়ত। প্রায় সব ঘাটেই শ্রেষ্ঠীর কর্মী কিংবা পরিচিত লোক আগের নৌকোয় খবর পেয়ে যেত, সময়মতো ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকত।

শ্রেষ্ঠী তাঁর দুটো কামরার মধ্যে একটা কামরা আমাদের দুই ভিক্ষুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা বিশ্রাম করতাম। কখনও শুতাম, আবার কখনও গল্প করতাম। অন্য সময় শ্রেষ্ঠী আর শ্রেষ্ঠীপত্নী আমাদের উপদেশ শুনতেন কিংবা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করতেন। শ্রেষ্ঠীপত্নীর তথাগতর জীবনী এবং সূক্তি শোনার খুব আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি বিকেলে আলাদা সময় ঠিক করে নিয়েছিলেন। বুদ্ধিল একদিন মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ব্যাখ্যা করে পাঠ করেছিলেন। তারপর থেকে শ্রেষ্ঠীপত্নী রোজই আগে থাকতে কথা শোনার জন্য তৈরি হয়ে থাকতেন। বুদ্ধিলের পাঠ করার রীতিই ছিল আলাদা। মধুর স্বরে মূল সংস্কৃত পড়তেন, তারপর প্রাকৃত ভাষায় অর্থ করে এমন সুন্দরভাবে বোঝাতেন যে, মনে হ'ত তথাগতর সেই সময়টা যেন চোখের সামনে ভাসছে। বুদ্ধচরিত পাঠ করার সময় তিনি কখনও অলৌকিক ঘটনা এবং অবাস্তব গল্পের আশ্রয় নিতেন না। এতে করে তথাগতের মুখমণ্ডলের চারিদিকে যে প্রভা ছিল তা বিলুপ্ত হ'ত ঠিকই, কিন্তু তাতে তথাগতকে এতটুকু খর্ব করা হ'ত না। বরং তাঁর পুরুষোত্তম রূপ শতগুণে স্বর্গীয় হয়ে উঠত। শ্রদ্ধাবতী শ্রেষ্ঠীপত্নীর কাছে বুদ্ধিলের কথাগুলি খুব বিচিত্র মনে হ'ত। এমন কথা আগে কখনও কোনো ভিক্ষু তাঁকে বলেন নি। তাই বুদ্ধিলের কথা তাঁর কাছে খুব আকর্ষক হয়েছিল। শ্রেষ্ঠী আর শ্রেষ্ঠীপত্নী শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, বুদ্ধের সমসাময়িক তাঁদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে আজকের মানুষের রীতিনীতি আর ভাষায় অনেক প্রভেদ। বুদ্ধিল যখন মাটি দিয়ে চোখের সামনে দেখতে দেখতে বিদিশা (সাঁচি)-র চৈত্যস্তূপ আর অন্যান্য প্রাচীন-বিহার চৈত্য (ভরহুত, শ্রীপর্বত ইত্যাদি)-র মূর্তিগুলির প্রতিকৃতি তৈরি করে দেখালেন তখন তাঁদের বিশ্বাস হ'ল, এই তরুণদর্শন ভিক্ষুর কথা সম্পূর্ণ সত্যি।

সাতদিনের এই নৌকোযাত্রা আমাদের দুজনেরই ভালো লাগল। শ্রেষ্ঠী আর তাঁর পত্নীর আগ্রহে কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে এক সপ্তাহের জায়গায় দু সপ্তাহ থাকতে হ'ল। অতি প্রাচীন আর প্রসিদ্ধ নগরী এই কৌশাম্বী। তথাগতর জীবনকালে এ এক বিরাট সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। কিন্তু আজ তা ধ্বংসের মুখে। এর সমৃদ্ধির এক অংশ হরণ করেছে প্রয়াগ। এখানকার লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট

হয়ে প্রথমে চলে যান পাটলিপুত্র, তার পরে কান্তকুব্জ। কৌশাম্বী জলপথের ধারে অবস্থিত বলে আজও এখানে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন পাওয়া যায়। নইলে কবেই মৃত্যুর হিমস্পর্শে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যেত। নগরীর যখন এই অবস্থা তখন সেখানকার সংঘারামগুলিও যে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী! বৎসরাজ উদয়নের অন্তঃপুরেও কালের ছোঁয়া লেগেছে। তারও ধ্বংসলীলা দেখা যাচ্ছে। চল্লিশ ফুট উঁচু এক বুদ্ধমন্দির আজও এখানে বর্তমান। মন্দিরের ভেতরে আছে চন্দনকাঠের এক বুদ্ধমূর্তি। লোকে বলে, রাজা উদয়ন তথাগতর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জীবনকালেই শিল্পীদের দিয়ে এই মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন।

বুদ্ধিল কিন্তু একথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, বৈদিশগিরি এবং অন্য প্রাচীন চৈত্যগুলিতে কখনও বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে বলে জানা যায় নি বরং পিঠাসন কিংবা চরণের আকারে তাঁকে উপস্থিত করা হয়েছে। তাই উদয়ন অথবা তথাগতর জীবনকালে এমন মূর্তি তৈরি হওয়া অসম্ভব।

নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শ্রেষ্ঠী ঘোষিতের আবাস। সেখানে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে এক বুদ্ধমন্দিরে চুল আর নখ ধাতুর পূজা হয়। শ্রেষ্ঠী ঘোষিত যে ঘোষিতারাম তৈরি করিয়েছিলেন তা আজও আছে নগরের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তার পাশে আছে প্রায় দেড় শ' হাত উঁচু এক অশোকস্তুপ। ঘোষিতারামের দক্ষিণ-পূর্বে ইটের তৈরি দোতলা একটা বাড়ি আছে। আচার্য বসুবন্ধু এই বাড়ির যে ঘরটিতে বসে তাঁর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' রচনা করেছিলেন সেই ঘরটি এখনও আছে। ঘোষিতারামের পূর্বদিকে আম্রবন। আম্রবনের একটা বাড়ি আছে। সেখানে আর্য অসঙ্গ তাঁর মহান্ গ্রন্থ 'যোগাচার-ভূমি' রচনা করেছিলেন। নগরের উত্তর-পশ্চিমে এক ক্রোশ দূরে ছোট একটা পাহাড় আছে। পাহাড়ের প্রস্তগুহায় তথাগতর যাতায়াত ছিল। হিমালয়ের পরে গঙ্গা আর যমুনার মধ্যে এই একটাই ছোট পাহাড় দেখা যায়। এখানে সকল ধর্মেরই সংঘারাম আর মঠ আছে। একদিন এই সব সংঘারাম আর মঠে প্রাণের প্রবাহ ছিল। আজ তা শুকিয়ে গেছে। ভিক্ষু আর পরিব্রাজকের সংখ্যাও তাই অনেক কমে গেছে।

কৌশাম্বী থেকে সাত যোজন দূরে প্রয়াগ। এতটা পথ আমরা নৌকোয় করেও যেতে পারতাম। কিন্তু গেলাম স্থলপথে। তা-ই আমাদের ইচ্ছে ছিল। পথে ঘন জঙ্গল। তাতে বাঘ, সিংহ আর হাতির বাস। এক সময়

হয়তো এই জঙ্গল গ্রাম কিংবা শহর ছিল। কিন্তু কৌশাম্বীর বৈভব নষ্ট হয়ে যাবার পর গ্রামও নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবীর লীলাই এই। আজ যেখানে প্রাণচঞ্চল উৎফুল্ল নগরী, কাল সেখানে হয়তো এমন জঙ্গল তৈরি হ'ল যে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে গেলে প্রাণ হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে জানা যায়, প্রয়াগ সে সময় জঙ্গলাকীর্ণ ছোট্ট একটি গ্রাম ছিল। কিন্তু আজ তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জনের জন্য হাজার হাজার নরনারী এখানে আসে। দু-তিনটে বৌদ্ধ সংঘারামও আছে এখানে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের দেবালয়ের সংখ্যাই বেশি। সঙ্গমস্থলের কাছে একটা বটগাছকে ব্রাহ্মণরা পরম পবিত্র মনে করেন। লোকে এই বটগাছে চড়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তাদের ধারণা, এতে করে সারাজন্মের-পাপক্ষয় হয়। তারা মনে করে, এমনি করে পাপক্ষয় করে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গ থেকে বিমান আসবে তাদের নিয়ে যেতে। বটগাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরা লোকদের কত যে হাড়পাঁজর দেখতে পাওয়া যায় গাছটির নিচে! শুধু বট-গাছ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা নয়, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে ডুবে মরাও মহৎ পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। বুদ্ধিল এসব শুনে দারুণ ক্রোধে বলেছিলেন : এ কেমন নির্বুদ্ধিতা যে, মানুষ আত্মহত্যাকে পুণ্যকর্ম মনে করে! আর এই বা কী রকম ধর্ম, যা মানুষকে এমন মূর্খ তৈরি করে!

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকের তৈরি পুরনো এক স্তূপ আছে। তার পাশে কেশ আর নখধাতুর ছোট একটা চৈত্যও আছে। এই স্তূপের ধারে এক পুরনো সংঘারামে আচার্য নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব 'চতুঃশতক শাস্ত্র' লিখেছিলেন।

এরপর আমরা চললাম বারাণসীর পথে। পথ আমাদের পূবদিকে। পথের দু'ধারে আমগাছ। গাছে বেশ বড় বড় আম তাতে বোঝা গেল, বর্ষার আর দেরি নেই। বর্ষাবাসের জন্য আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হ'ত। বর্ষার দু'মাস আমরা জেতবন-শ্রাবস্তীতে কাটাতে চাইলাম। তাই সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা পথ চলে রোজ তিন যোজন পথ অতিক্রম করতাম। বারাণসীও এক প্রাচীন নগরী। বিশাল তার আয়তন। এক নগরীর উত্থান মানে অন্য নগরীর পতন। বারাণসী যদিও কোনো রাজ্যের রাজধানী নয়, তবু কৌশাম্বীর মতো তার অবস্থা দীনহীন নয়। তার প্রথম কারণ, বারাণসী আজও এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ; দ্বিতীয় কারণ, বৌদ্ধ, জৈন আর ব্রাহ্মণদের বড় পবিত্র স্থান এই

বারাণসী। বারাণসীর শিল্পিরা সুন্দর সুন্দর কাপড় এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করতে অদ্বিতীয়। বারাণসী আর বৈভব যতটা দীর্ঘস্থায়ী করতে পেরেছে ততটা আর কেউ পারে নি। পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ কিংবা অন্য কোনো নগরীও না।

আমরা বারাণসীর উত্তরে ধর্মচক্রপ্রবর্তন বিহার (সারনাথ)-এ এসে উঠলাম। এই হ'ল প্রাচীন ঋষিপতন মৃগদাব, যেখানে তথাগত তাঁর আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ এবং পর্য্যবসানকল্যাণ ধর্মের সর্বপ্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পুণ্যস্থান দর্শনের জন্য সুদূর মহাচীন এবং দেশ-দেশান্তরের তথাগত-শ্রাবকরা লালায়িত হয়ে থাকেন। তথাগত বুদ্ধ হয়ে এখানেই প্রথম বর্ষাবাস করেছিলেন। এখানেই তিনি পাঁচজন ভিক্ষুকে তাঁর ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুসংঘের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যেখানে তিনি পাঁচজন ভিক্ষুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেখানে রাজা অশোক এক বিশাল স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখনও হাজার বছর হয় নি অশোকের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আজ তাঁর শিলাস্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ লিপি কেউ পড়তে পারে না। ঋষিপতনে অনেক সংঘারাম আছে। একে সংঘারামের নগর বলা যেতে পারে। বুদ্ধিল বললেন: এখানকার সবচেয়ে পুরনো মূর্তিগুলি লাল পাথরের তৈরি। রাজা কণিষ্কের সময়ে এগুলি তৈরি হয়েছিল। আজও এখানে নতুন নতুন মূর্তি তৈরি হয়। আজকের শিল্পীরা অবশ্য শিল্প আর সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাদের পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে।

বারাণসী থেকে আমরা সাকেতের পথ ধরলাম। সাকেত পৌঁছুতে সাত-আট দিন লেগে গেল। পথে শ্বাপদাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হ'ল। ছোটবড় অনেক নদী পার হতে হ'ল। সাকেতের, বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে অযোধ্যা বলে বর্ণনা করেছেন। সাকেত মহাকবি অশ্বঘোষের জন্মভূমি। জননী আর জন্মভূমিকে তিনি অপরিসীম ভালোবাসতেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে লিখতেন 'সাকেতক আর্যসুবর্ণাক্ষীপুত্র'। তথাগতর সময় এই নগরী খুব সমৃদ্ধ ছিল। আর সেইজন্যেই বিশাখার-পিতা অর্জুন শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তী না গিয়ে সাকেতকেই করলেন তাঁর আবাস—যদিও তখন কোশলদেশের রাজধানী সাকেত ছিল না, ছিল শ্রাবস্তী। এখান থেকে শ্রাবস্তী সাত যোজন দূরে। তাই আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, বর্ষোপনায়িকা (আষাঢ় পূর্ণিমা) পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় সেখানে পৌঁছে যাব।

সাকেতের কাছে সরযূ পার হয়ে আমরা উত্তরে শ্রাবস্তীর পথে চললাম। পথ এমন জায়গা দিয়ে চলেছে, যেখানে জঙ্গল কম এবং গ্রাম ও নগর বেশি। এখন পাকা আম পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধিলের কাছে আম নতুন জিনিস নয়, কিন্তু আমার কাছে পরম দুর্লভ এবং অতি প্রিয়। মধ্যাহ্নের পর ভিক্ষুদের আহার করা নিষেধ। কিন্তু ফলের রস খাওয়া চলে। তাই আহারের পরে সন্ধ্যাকালে আমের রস আমার বড় ভালো লাগত। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী যাবার পথ সব সময়ই পথিক আর বণিকে জনাকীর্ণ থাকে। যদিও কৌশাম্বীর মতো শ্রাবস্তীর বৈভবও ক্ষীণ হয়ে গেছে, তবু হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত আজও তাঁর প্রাধান্য রয়েছে। আমার আশা ছিল, শ্রাবস্তীকে কৌশাম্বীর চেয়ে ভালো অবস্থায় দেখব। কিন্তু দেখলাম, এই বিশাল নগরীর কিছু অংশে মাত্র জনবসতি আছে। পূর্বারাম আর জেতবনের মতো অতি পবিত্র এবং প্রসিদ্ধ বিহারও ধ্বংসপ্রায়। নগর থেকে দূরে জীর্ণশীর্ণ সংঘারাম দেখা যায়। নগরপ্রাকার ভেঙে পড়েছে। উত্তর, পূর্ব আর দক্ষিণের প্রসিদ্ধ দ্বারগুলি এখন নামমাত্রই রয়ে গেছে। দক্ষিণ দ্বারের কিছুদূরে জেতবন। আর পূর্বদ্বারের বাইরে বিশাখার তৈরি পূর্বারাম। নগরীর ভেতরে রাজকারাম, রাজপ্রাসাদ, অনাথ-পিণ্ডক আর বিশাখার ঘরগুলির সন্ধান এখন শুধু সংকেত চিহ্নেই পাওয়া যায়। আমরা এখন জেতবনে রয়েছি। তথাগতর সময় জেতবন রমণীয় ছিল। আজও আমাদের ভাবনায় তা রমণীয়ই আছে। তথাগত বুদ্ধ হবার পর তাঁর জীবনের ছেচল্লিশটি বর্ষাবাসের মধ্যে ছাব্বিশটি বর্ষাবাস এখানেই করেছিলেন। এখানেই তিনি শত শত উপদেশ দিয়েছিলেন। আজও সেই গন্ধকুটী দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তথাগত বহু বর্ষা কাটিয়েছেন। পাশে আছে সেই স্নানগৃহ, যেখানে তিনি স্নান করতেন। যেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আর উপাসক-উপাসিকারা সন্ধ্যাবেলায় তথাগতর মুখনিঃসৃত ধর্মোপদেশ শোনার জন্যে একত্র হতেন, সেই জায়গাটাও আছে। জেতবনে ঘুরতে ঘুরতে আমার তথাগতর জীবনের এক-একটা ঘটনা মনে পড়ত। এখানেই সেই জন্তাঘর, যেখানে তথাগত সঙ্গী পরিত্যক্ত রোগী ভিক্ষু তিস্সকে নিয়ে এসে গরম জলে স্নান করিয়েছিলেন আর নিজের আচরণ দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পরের দুঃখে সাহায্য করা মানুষের সবচেয়ে বড় পুণ্যকর্ম।

জেতবনের ভেতরকার অনেক বিহার ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক-গুলি ধ্বংস হচ্ছে। এমনি করেই হয়তো একদিন সারা জেতবন অরণ্যের গর্ভে

চলে যাবে। কিন্তু অমর তথাগতর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল বলে সে-ও অমর হয়ে থাকবে।

এবারে বর্ষাবাসের জন্তে জেতবনে দু-শ' ভিক্ষু এসেছেন। পূর্বারামে ভিক্ষুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঞ্চাশ। এমন একদিন ছিল, যখন এই সব সংঘারামে হাজার হাজার ভিক্ষু বাস করতেন। তখন আজকের এই জীর্ণশীর্ণ ভেঙে-পড়া গৃহগুলি কত জমজমাটই না ছিল। তখন হয়তো এখানকার ভিক্ষুরা সেই বুদ্ধবচন 'সব অনিত্য' কথাটার অর্থ ভালো বুঝতে পারেন নি। এই জেতবনে তথাগত যে সূক্তগুলি বলেছিলেন, আজ সেগুলি যখন এই জেতবনে বসেই পড়ি, তখন আমার দু চোখে জলধারা বাধা মানে না। যদিও অনাথপিণ্ডক আর বিশাখা মৃগারমাতার মতো ধনী শ্রেষ্ঠীরা এখন এখানে থাকেন না, তবু শ্রাবস্তী আর তার আশপাশের গ্রামের লোকেরা জেতবনের মহিমার কথা ভোলে নি। ভিক্ষুদের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রতি তাদের সজাগ দৃষ্টি। শ্রাবণ মাসের গোড়া থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারা ভারে ভারে আম দিয়ে যায়। কিন্তু এখানকার স্থানীয় ভিক্ষুদের কাছে আম তেমন লোভনীয় নয়, যেমন আমাদের কাছে। আমাদের দেশে আমের কথা কেবল বইতেই পাওয়া যায়।

আকাশে মেঘ না থাকলে শ্রাবস্তী থেকে হিমালয় পাহাড় দেখা যেত। তখন আমার জন্মভূমির কথা মনে পড়ত। এই হিমালয় তো আমাদের উদ্যানেও চলে গেছে। কখনও কখনও ভাবতাম, এখান থেকে একবার হিমবান ঘুরে আসি। কিন্তু আমরা যে আরও অনেক পুণ্যভূমি দর্শন করে তাম্রপর্ণী (সিংহল) পর্যন্ত যাব ঠিক করেছি।

বর্ষাবাস শেষ হ'ল। মহাপ্রাবারণার দিন শ্রাবস্তী আর জেতবনের ধ্বংসাবশেষের মাঝে আর একবার উৎসবের দৃশ্য দেখা গেল। ভিক্ষুদের ভেট দেবার জন্তে বহু নরনারী নানারকম খাবার নিয়ে এল। কত লোক নিজের হাতের তৈরি চীবর প্রদান করল। এখানে কপিলবস্তু আর লুম্বিনীর পথের যাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। জেতবন থেকে বেরিয়ে আমরা অচিরবতী (রাপ্তী) পার হলাম। তখন কার্তিক মাস। পথের দু' ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। ধানের ক্ষেত আর খালে বিলে জল থৈ থৈ করছে। শ্রাবস্তী কিংবা কৌশাম্বীকে যে দীনদশায় দেখেছিলাম, গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগ আর বারাণসী এবং সাকেতের মধ্যদেশে যে বিধ্বস্ত গ্রাম দেখেছিলাম তা এখন নেই। বিদেশী

শত্রুর আক্রমণে ওদিককার বিস্তীর্ণ এলাকা যে রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এ জায়গার ওপর তেমন কোনো আঘাত আসে নি। যুদ্ধের পরিণাম এইরকমই হয়। বিশেষ করে, যদি আক্রমণকারী বিদেশী শক্তি হয়। কেননা, স্থানীয় জনসাধারণের ওপর তাদের কোনো রকম সহানুভূতি থাকে না। শ্বেত হূণরা বিদেশী ছিল। তোরমাণ এবং তার পুত্র মিহিরকুলও ঐ পর্যন্তই এসেছিল। শ্রাবস্তীর এধারে তাদের পদার্পণ ঘটেনি। তাই এধারের লোকেরা বেঁচে গিয়েছিল।

যুদ্ধ এক ভীষণ মহামারীর মতো। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। আর গ্রাম একবার বিপর্যস্ত হয়ে গেলে আবার নতুন করে গড়তে অনেক দেরি হয়। কেননা, পাখিদের মতো মানুষও নতুন কোনো জায়গায় নিজেদের ঘরসংসার পাতলে পুরনো জায়গার স্মৃতি বা মোহ তার মনে বিশেষ থাকে না। এখানকার গ্রামগুলির শস্যপূর্ণ ক্ষেত আর আবাদ দেখে আমার মন ভরে গিয়েছিল। কোনো কোনো গ্রাম তো নিশ্চয়ই সেইসব মানুষদেরই, যার যুদ্ধের জন্যে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে এখানে এসে বসতি করেছে।

পরিশ্রমী কৃষক, দক্ষ শিল্পী এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই গোলমালের সময় স্থানচ্যুত হয়েছিল। তাই জেতবন এবং পূর্বারামের নতুন করে কোনো সংস্কার সম্ভব হয় নি। অবশ্য এ কাজে বিরাট খরচের ব্যাপারও ছিল। এখানকার গ্রামগুলিতে তাই ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর বিহার ইতস্ততঃ তৈরি হয়েছে।

কপিলবস্তুর পথে মাত্র দু-চারটে এমন গ্রাম দেখা গেল, যেখানে ইঁটের তৈরি কয়েকটা মাত্র বাড়ি ঘর আছে। বাকি সব কাঁচা মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের ছোট ছোট ঘর। সবুজ রঙ শুধু ক্ষেতেই নয়, ঘরের চালেও। ঘরের চালে লাউ-কুমড়ো আর অন্যান্য লতা উঠেছে। সাঠী ধানের চাল আর ছোটবড় মাছ, দুয়েরই প্রাচুর্য। আমি এখনও মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়ি নি। গৃহস্থের বাড়ি নিমন্ত্রণে কিংবা ভিক্ষাটনে মাছ অবশ্যই দিত। প্রতি বছর এখানে এ সময় ভীষণ কম্পজ্বর দেখা দেয়। কখনও কখনও এই কম্পজ্বর এত বিস্তারলাভ করে যে, সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ বছরটা সে রকম কিছু হয় নি। অন্য এক কষ্ট অবশ্য আমি ভোগ করেছিলাম। সে মশার উপদ্রব। মশার জন্যে রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না। আমাদের কাছে মশারি ছিল না। এখানে কেবল ধনী ব্যক্তিরাই মশারি ব্যবহার করে। জনবসতি আর ক্ষেতখামার থাকা সত্ত্বেও জঙ্গল বড় একটা কম নেই। আমরা যতই পূবদিকে এগিয়ে চলেছি ততই বেশি করে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

আমরা ছিলাম পাঁচজন—আমি, বুদ্ধিল, মগধের ভিক্ষু সুরত আর সিংহলের দুজন। সিংহলের স্থবির সুনন্দ ছিলেন বৃদ্ধ এবং বহুশ্রুত। তিনি অন্তরের তীব্র ধর্মানুরক্তির প্রেরণায় সত্তর বছর বয়সে এই যাত্রা শুরু করেছিলেন। বরাবরই তিনি ভ্রমণ করেছেন পায়ে হেঁটে। স্থবির সুনন্দর দেহ অটুট ছিল। কিন্তু তাহলেও সত্তর বছরের ভার তো কম বড় নয়। তাই আমরা তাঁর আরামের দিকে সব সময় নজর রাখতাম। আমরা কেবল অপরাহ্নেই এক যোজন পথ যাত্রা করতাম। বিশ্রামের সময় আমাদের বৃথা যেত না। কখনও সুনন্দ উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মোপদেশ দিতেন, আবার কখনও আমাদের পুরনো দিনের গল্প শোনাতেন।

দ্বিতীয় দিনে আমরা সেই নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম, যা একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিত আর শাক্যদের মাঝে রাজ্যসীমা ছিল। নদীর জল ধরে রাখার জন্য অনেক জায়গায় বাঁধ রয়েছে, কোথাও বা বাঁশ আর কাঠের তৈরি সেতু। তাই নদী পাব হতে অসুবিধে হ'ল না। নদী পার হয়ে আমরা শাক্যদের প্রাচীন ভূমিতে পা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে এক বটগাছ পেলাম। স্থবির সুনন্দ গদগদ হয়ে বলতে লাগলেন: এই সেই বটগাছ, যার তলায় দেবমানবের শাস্তা একদিন এসে বসেছিলেন। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তাঁর গায়ে রোদ্দুর এসে পড়েছিল। সেই সময় শাক্যদের প্রতি কোশলরাজ বিরূঢ়ক দাসীপুত্র হিসাবে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সসৈন্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তথাগতকে দেখে বলেছিলেন—প্রভু, এই রোদ্দুরের মধ্যে হাল্কা ছায়ার গাছতলায় বসে আছেন কেন? এই ঘনছায়ার বটতলায় এসে বসুন। তথাগত বলেছিলেন—ঠিক আছে মহারাজ। কিন্তু জ্ঞাতিদের ছায়া আরও ঠাণ্ডা হয়।—বিরূঢ়ক ভগবান তথাগতর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে শাক্যদের হত্যা করে ঠিকই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

স্থবির সুনন্দের বিশ্বাস, এই সেই প্রাচীন বট, যা একদিন তথাগতকে ছায়া দিয়েছিল। কিন্তু আমার আর বুদ্ধিলের বিশ্বাস, এই বট এক শ' বছরের বেশি পুরনো হবে না। কিন্তু তাই বলে আমরা তাঁর বিশ্বাসে আঘাত দিই নি। বুদ্ধিল আর স্থবিরের কাছ থেকে শাক্যরাজ্য সম্বন্ধে বহু নতুন কথা জানতে পারলাম শাক্যদের মধ্যে রাজশাসনের বদলে গণশাসন ছিল। তাদের একটা সংস্থা (গণপঞ্চায়েত) থাকত। এই সংস্থা সব বিষয়ে নির্ণয় (বিচার) করত।

বিরাট আগারে এই সংস্থা বসত তাকে বলা হত সংস্থাগার। একবার যুবরাজ বিরূঢ়ক এখানে এলে শাক্যরা তাঁকে এই সংস্থাগারে থাকতে দিয়েছিল। যুবরাজের প্রতি বাইরে তারা সম্মান প্রদর্শন করত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রত্যেক শাক্যের মনে মহানাম শাক্যের দাসীকন্যার পুত্রের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ছিল। অতিথিরা সব চলে গেলে একজন দাসী বিরূঢ়ক যে আসনে বসেছিলেন সেই আসন ধুতে ধুতে বলেছিল, দাসীপুত্র এটা অপবিত্র করে দিয়ে গেছে, এখন আমাকেই কষ্ট করতে হচ্ছে!

বিরূঢ়কের এক সৈনিক তার বল্লম নিতে ভুলে গিয়েছিল। বল্লম নিতে এসে সে দাসীর কথা শুনে ফেলেছিল, এবং পরে বিরূঢ়কের কাছে গিয়ে সব বলেছিল।

ভগবান বুদ্ধ দাস এবং আর্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের ভেদাভেদ মিটিয়ে এক মানবজাতি স্থাপন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সমুদ্রে যেমন নানাদিক থেকে নদী এসে মিশে এক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি নানা দেশ থেকে নানা জাতির লোক বৌদ্ধধর্মে সম্মিলিত হয়ে এক হয়। চীন-মহাচীন, পূর্বগান্ধার-পশ্চিমগান্ধার, পূর্বকম্বোজ-পশ্চিমকম্বোজ—সব দেশ আর সব জাতির লোক যখন কোনো সংঘারামে আসেন তখন সবাই এক ধরনের অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করেন। অনুরুদ্ধ আর আনন্দর মতো কত শাক্যপুত্রই না তথাগতর সংঘে প্রবেশ করে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন। উপালি ছিলেন শাক্যদের নাপিত। অনুরুদ্ধ এবং অন্যান্য শাক্যপুত্র যখন ভিক্ষু হতে লাগলেন, তখন সবার আগে তাঁরা উপালিকে উপসম্পদা (ভিক্ষুদীক্ষা) দিলেন, যাতে সবাই তাঁকে অভিবাদন করেন এবং তাদের মধ্যে জাত্যভিমান ঢুকতে না পারে। কিন্তু এমন ভাবনা তো শাক্যদের সবার মনে আসতে পারে না।

শাক্যভূমিতে থাকাকালে বুদ্ধিল আর আমি এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। রাজতন্ত্র যতই বিরাট আর শক্তিশালী হবে, ততই মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ বাড়বে। মধ্যমণ্ডলে ছোটবড় বিভিন্ন জাতির মধ্যে আচার-ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু আমি এমন অনেক দেশের কথা জানি, যেখানে মানুষে-মানুষে বৈষম্য থাকলেও তাদের ব্যবহারে কোনো ভেদ নেই। মহাচীন, তুষারোক (তুরস্ক) প্রভৃতি দেশে এ রকমই। আমার আপন জন্মভূমি উদ্যানের লোকেরাও একই ধরনের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত, তথাপি ধনসম্পত্তি এবং প্রভুদের জন্য পার্থক্য সেখানেও দেখা যায়।

বুদ্ধিল বলেছিলেন : শাক্যদেরও গণ-বৈষম্যশূন্য ছিল না। তার প্রমাণ, শাক্যভূমিতে দাসদাসী ছিল। পশুর মতো তাদের ক্রয়বিক্রয় করা হ'ত। তাদের এত জাত্যভিমান ছিল যে, কোশলরাজ প্রসেনজিতেকেও নিচু মনে করে তাঁকে তারা কন্যাদান করতে চায় নি। মহানাম প্রসেনজিতের সঙ্গে তাঁর দাসীপুত্রী বার্ষভক্ষত্রিয়ার বিবাহ দিয়েছিলেন। বিরূঢক তাঁদেরই সন্তান। তবু শাক্যভূমির সকল শাক্য ভাই-ভাই ছিলেন। সম্পত্তিতে বৈষম্য থাকলেও শাসনকার্যে তাঁদের সকলের মতই সমান মর্যাদা পেত।

ভিক্ষুসংঘে কোনো কাজ যে একজনের নির্দেশমতো হয় না, তাতে সমগ্র সংঘের সম্মতির প্রয়োজন, সে ঐ গণসংস্কারই পরিচায়ক। ভিক্ষুসংঘে তার ছাপ পড়েছে। তথাগত স্বয়ং এক গণরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি গণের রীতিনীতি দেখেছিলেন। পরে মগধ, কোশল, বৎস প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু গণসংস্থার মতো সে সব রাজ্যের ব্যবস্থা তাঁর পছন্দ হয় নি। তাই তিনি সংঘের জন্য সংঘসন্নিপাত (সংঘের অধিবেশন), ছন্দগ্রহণ (ভোটগ্রহণ), ছন্দশলা (ভোটশলাকা) বিতরণ এবং যদ্ভূয়সিক (বহুমত) নির্ণয় প্রভৃতি নিয়ম করে দিয়েছিলেন। সংঘে তিনি এমন সাম্যভাব স্থাপন করেছিলেন, যা গণরাজ্যেও দেখা যেত না। আজ অবশ্য সে সাম্য কোনো সংঘে নেই।

আমাদের বড় ইচ্ছে ছিল, শাক্যভূমিতে গিয়ে তথাগতর বংশের শাক্যদের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বিরূঢ়ক সত্যি সত্যিই শাক্যদের সর্বসংহার করেছেন। দু-একজনকে অবশ্য ভিক্ষুর বেশে দেখলাম, কিন্তু শাক্য পরিবারের দেখা কোথাও পেলাম না। শুনলাম, তারা পালিয়ে গিয়ে উত্তরের হিমবান্ পর্বতে বাস করছে। সেখান থেকে আবার আনেকে অন্য দেশেও গেছে। শাক্যভূমিতে এখন জঙ্গলই বেশি। সেখানকার, বিশেষ করে পর্বতের সানুদেশের ঘন জঙ্গলে কিরাতদের বাস। তারা পশুপালন আর শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। আজও তারা বন্য জীবন ত্যাগ করতে চায় না। তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার খুব কমই হয়েছে।

শ্রাবস্তী থেকে বারো যোজন দূরে যেখানে গৌতম বুদ্ধের আগে ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানেও একটি স্তূপ আছে। আর আছে অশোকের তৈরি শিলাস্তম্ভ। সেখান থেকে এক মাইল দূরে কোনাগম বুদ্ধের জন্মস্থান। যাই হোক, পরের দিন আমরা

কপিলবস্তু পৌঁছুলাম। শ্রাবস্তী আর কৌশাম্বীতে তো তবু এখনও কিছু লোক আছে, কিছু অট্টালিকাও আছে, কিন্তু এখানে? এখানে এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোথায় শুদ্ধোধনের প্রাসাদ ছিল তা জিজ্ঞাসা করে জানতে হয়। লোকে সেখানে সিদ্ধার্থকুমার আর তার মা মায়াদেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে। একটা ভগ্নাবশেষ দেখিয়ে কে যেন বলল, এখানে সিদ্ধার্থকুমারের গ্রীষ্মপ্রাসাদ ছিল, আর ওখানে ছিল হেমন্তপ্রাসাদ। সিদ্ধার্থনগরের পূর্বদ্বার দিয়ে বেরিয়ে উদ্যানে যাবার পথে সেই রোগী লোকটাকে দেখে যেখান থেকে রথ ঘুরিয়ে প্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন সেই জায়গাটা আমরা দেখলাম। যেখানে তিনি ধনুর্বান আর শস্ত্রচালনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই জায়গাটাও দেখলাম। বুদ্ধ হবার পর সর্বপ্রথম যেখানে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেখানেও আমরা গেলাম। নগর থেকে কিছু দূরে যেখানে বহু শাক্যকুমার উপালিকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং যেখানে তিনি ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই জায়গার সন্ধানও আমরা পেলাম। সেই জায়গাটাও দেখলাম, যেখানে বিরূঢ়ক শাক্যদের রক্তে হস্তরঞ্জিত করেছিলেন।

কিন্তু কোথায় সেই কপিলবস্তু নগর? এ তো ইট আর মাটির ধ্বংসস্তূপ! এত বড় অলৌকিক পুরুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন তার এই অবস্থা!

কপিলবস্তু থেকে আমরা পরের দিন লুম্বিনী গিয়ে পৌঁছুলাম। রাজা অশোক এখানে এক শিলাস্তম্ভে এই কথা কটি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন— 'এখানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' আসন্নপ্রসবা মায়াদেবী কপিলবস্তু থেকে তাঁর পিতৃগৃহ দেবদহ নগরে যাচ্ছিলেন, পথে লুম্বিনীর উদ্যানে তাঁর প্রসব-বেদনা উঠল। সেখানেই জন্ম হ'ল সেই অলৌকিক শিশুর, যিনি সারা পৃথিবীর দুঃখ আর অন্ধকার দূর করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। লুম্বিনী বন সবুজপাতা আর ফুলে সজ্জিত ছিল। উদ্যানের পুষ্করিণীর জল ছিল স্বচ্ছ নীল। সেই পুষ্করিণী আজও আছে। পুষ্করিণীর উত্তরে যেখানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে শালগাছের শাখা ধরে মায়াদেবীর এক মূর্তি আছে। কাছে একটি কুয়োও আছে। এই কুয়োর জলেই নাকি নবজাত শিশুকে স্নান করানো হয়েছিল। আজ আমরা এই কুয়ো আর পুষ্করিণীর জলে আচমন করে নিজেদের ধন্য মনে করলাম।

কপিলবস্তু এখন জনমানবহীন ঘন বনে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে

আর লুম্বিনীতে যেতে হলে সাবধানে যেতে হয়। কারণ, এইসব জঙ্গলে হাতি আর বাঘ আছে অনেক।

এইসব পুণ্যস্থান দর্শন করার সময় স্থবির সুনন্দর দু' চোখে অবিরাম অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। লুম্বিনীতে এসে তিনি ভগবান বুদ্ধের শেষ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন। ভগবান বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে বলেছিলেন—

> "আনন্দ! শ্রদ্ধালু কুলপত্রের কাছে এই চারটি স্থান দর্শনীয়, সংবেজনীয়: (১) যেখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছিলেন (লুম্বিনী); (২) যেখানে তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেছিলেন (বুদ্ধগয়া); (৩) যেখানে তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তিত করেছিলেন (সারনাথ); এবং (৪) যেখানে তথাগত অনুপাদি শেষ নির্বাণ-ধাতু লাভ করেছিলেন (কুশীনারা)। আনন্দ! ভবিষ্যতে শ্রদ্ধালু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আর উপাসক-উপাসিকারা এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসবেন যে, এখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এখানেই তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন।"

লুম্বিনী থেকে আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দক্ষিণের পথে চললাম। এই জঙ্গলেই আমরা পেলাম রামগ্রামের স্তূপ। রামগ্রামের লোকেরা তথাগতর অস্থি-ধাতুর এক-অষ্টমাংশ সংগ্রহ করে এই স্তূপ তৈরি করেছিল। রাজা অশোক বাকি সাত জায়গায় স্তূপের অস্থিগুলির অধিকাংশ একত্র করে তাঁর বিশাল রাজ্যের বহু নগরে ও প্রসিদ্ধ স্থানে স্তূপ তৈরি করে তার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তী বলে, রামগ্রামের স্তূপ তিনি স্পর্শ করেন নি। একদিন সেখানে রামগ্রামবাসীদের গণরাজ্যের রাজধানী ছিল, আজ সেখানে গভীর অরণ্য।

লুম্বিনী থেকে রওনা হয়ে পনের দিন পরে আমরা তথাগতর মহাপরিনির্বাণ-স্থান কুশীনগরে এসে পৌঁছলাম। তথাগত যেখানে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ করেছিলেন, সেই পুণ্যভূমিতে এসে মন যদি আমাদের দুঃখে ভরে ওঠে, ব্যাকুল হয় তাহলে কী করবার আছে!

কুশীনগর তখন এক সুন্দর নগর ছিল। এখানে ছিল মল্লদের গণরাজ্য। বুদ্ধের অন্তিম সংস্কার করার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। নগরপ্রান্তে দুই শালবৃক্ষের মধ্যে সিংহশয্যায় তথাগতর পরিনির্বাণ হয়েছিল। এখানেই তিনি সমুদ্রকে তাঁর শেষ শিষ্য করেছিলেন। সেই কুশীনগর এখন ধ্বংসপ্রায়। কয়েকটা ঘর

অবশ্য এখনও আছে। পরিনির্বাণ স্তূপের পাশে ছোট ছোট কয়েকটা বিহারও আছে। যে মুকুটবন্ধনে তথাগতর দাহক্রিয়া হয়েছিল সেই জায়গাটাও আমরা দর্শন করলাম।

কুশীনগর থেকে আমরা বৈশালী রওনা হলাম। বৈশালী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাইশ যোজনের পথ। ছু' দিন চলার পর আমরা মধ্যমণ্ডলের পঞ্চম মহানদী মহী (গণ্ডক) পার হলাম। আমরা এখন যেখান দিয়ে চলেছি, হাজার বছর আগে সেখানে গণরাজ্য ছিল। গণরাজ্য একজনের রাজ্য নয়, বহুজনের। শাসক-রাজা আগে তাঁর নিজের আর তাঁর পরিজনের সুখের কথা ভাবেন, পরে অন্যের ভাবেন। আমার বিশ্বাস, গণরাজ্য 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' ছিল। কোশল আর মগধের সীমান্তে তখন অনেক গণরাজ্য ছিল। বুদ্ধিল বললেন: সেই সব গণরাজ্যের মধ্যে ন'টি ছিল মল্লদের, আর লিচ্ছবিদেরও ছিল ন'টি। মল্ল আর লিচ্ছবিদের সীমা ছিল এই মহানদী। রাজশক্তি আর সমৃদ্ধিতে বৈশালী ছিল শীর্ষস্থানীয়। তথাগত তাঁর সারা দেহ ঘুরিয়ে নাগাবলোকন করে শেষবারের মতো বৈশালীকে দেখে আনন্দকে বলেছিলেন—

> "আনন্দ! পরম রমণীয় এই বৈশালী, রমণীয় তার উদয়ন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সপ্তাম্রক-চৈত্য, বহুপুত্রক-চৈত্য আর সারংদদ-চৈত্য।"

এই চারটি চৈত্য বৈশালী নগরদ্বারের বাহিরে পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে বন ও পুষ্করিণী শোভিত রমণীয় দেবস্থান ছিল। লিচ্ছবি ভগবানের দর্শন লাভের জন্য বৈশালী নগর থেকে কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অম্বপালী বনে গিয়ে পৌঁছন। তাঁকে দেখে বুদ্ধ বলেছিলেন: ভিক্ষুগণ! লিচ্ছবিদের পরিষদকে দেখুন, এঁকে তেত্রিশ দেবতার পরিষদ বলে মনে করবেন।

বৈশালী একদিন সত্যই রমণীয় ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই। আজ তার সংস্থাগার—যেখানে লিচ্ছবি তাঁর রাজকার্য দেখাশোনা করতেন—অনেক খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তথাগত বৈশালী গণরাজ্যের ন্যায়ের খুব প্রশংসা করতেন। এখানে অপরাধীর বিচার করতেন বিনিশ্চয়-মহামাত্য (ন্যায়াধীশ)। অপরাধ প্রমাণিত না হলে তাকে মুক্তি দিতেন আর প্রমাণিত হলে তিনি নিজে দণ্ড না দিয়ে পাঠাতেন ব্যবহারিক (উচ্চ ন্যায়াধীশ)-এর কাছে। ব্যবহারিকও অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত না হলে মুক্তি দিতেন, আর প্রমাণিত হলে তিনি নিজে দণ্ড না দিয়ে সূত্রধারের হস্তে সমর্পণ করতেন। অপরাধ প্রমাণ হলে

সূত্রধার পাঠাতেন অষ্টকুলিকের কাছে, অষ্টকুলিক পাঠাতেন সেনাপতির কাছে, সেনাপতি পাঠাতেন উপরাজ (উপগণপতি)-র কাছে আর উপরাজ পাঠাতেন গণপতির কাছে। অপরাধের প্রমাণ না পেলে গণপতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেন আর প্রমাণ পেলেও নিজের ইচ্ছামতো দণ্ড দিতেন না—প্রবেণী পুস্তক (দণ্ড বিধান) দেখে সেই মতো দণ্ড দিতেন। ন্যায় বিচারের জন্যে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা হ'ত বলেই তো তথাগত বৈশালীবাসীদের প্রশংসা করতেন। বুদ্ধিল বললেন : আমাদের ভিক্ষুসংঘের সংগঠন আর তার কার্যকলাপ বৈশালীর গণরাজ্য অনুসারেই তথাগত নির্ধারিত করেছিলেন। বৈশালীর উত্তরে সেই কূটাগারশালা, যেখানে তথাগত বহুবার থেকেছেন এবং জীবনের শেষ বর্ষা কাটিয়েছেন। অশোক সেখানে একটা শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেছেন। তথাগতর সময়কার সেই মহাবন আজও আছে। বৈশালীর চারদিকে উদ্যান-পুষ্করিণী সমন্বিত চারটি চৈত্য ছিল। পূর্বে উদয়ন-চৈত্য, দক্ষিণে গৌতমক-চৈত্য, পশ্চিমে সপ্তাম্রক-চৈত্য আর উত্তরে বহুপুত্রক-চৈত্য। সেই চৈত্যগুলি আজও আছে। কিন্তু সে অবস্থা আর নেই। পশ্চিম দ্বারের কাছে চাপাল-চৈত্যে তথাগত আনন্দকে বলেছিলেন, আজ থেকে তিনমাস পরে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।...প্রধান চৈত্যগুলিতে এখন শাশুপতদের মন্দির গড়ে উঠেছে। বুদ্ধের শাসনে প্রথমে স্তূপ, পদচিহ্ন, আসন কিংবা বোধিবৃক্ষকে তথাগতর জীবনের প্রতীক মনে করে পূজা করা হ'ত। কিন্তু এখন তার স্থান অধিকার করেছে বুদ্ধপ্রতিমা। এখন বহু রকম বোধিসত্ত্বপ্রতিমা তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্মণরা আগে হোমযজ্ঞ করে পূজো করতেন। কিন্তু এখন পশুপতি আর অন্য দেবতার মূর্তি পূজো করেন। বৈশালীর চারদিকের পশুপতি-মন্দিরে পশুপতি আর গৌরীর স্থান নিয়েছে মুখলিঙ্গ। লিঙ্গপূজো সত্যিই বড় আশ্চর্য।

বৈশালী রমণীয় ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, বৈশালীর বহুজন সুখী ছিল। আমার বিশ্বাস, রাজশাসনের বদলে গণশাসন স্থাপিত হলে বহুজন সুখী হতে পারে। কিন্তু রাজ্য স্থাপিত হয় তলোয়ারের ধারের ওপর। যেখানে তলোয়ারের প্রচণ্ড শক্তি সেখানেই জয়লক্ষ্মী। তাহলে কি বহুজনের ভাগ্য চিরদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে? তাদের কোনো আশাই নেই?—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? আমি যে চাই সকল মানুষ, সকল প্রাণীই সুখী হোক!

আমি বৈশালীর প্রাচীন লিচ্ছবি বংশধরদের দেখেছি। আজও তাদের মধ্যে নির্ভীকতা আছে। কিন্তু এখন তারা সাধারণ কৃষক কিংবা মৌখরীদের

সৈনিক হবার আশাই শুধু করতে পারে। কোশলদের অত্যাচারে মল্ল শাক্যরা যেমন পালিয়ে গিয়ে উত্তরের হিমবান্ পর্বতে বাস করছে তেমনি বহু লিচ্ছবি নেপালে গিয়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছে। কিন্তু তাদের রাজ্য বৈশালীর গণরাজ্যের মতো নয়, গুপ্ত আর মৌখরীদের মতো একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ রাজ্য।

আমরা বৈশালী ছাড়লাম। তিন দিন পথ চলার পর এসে পৌঁছুলাম গঙ্গার তীরে। গঙ্গার এপারে বৈশালী গণরাজ্য, ওপারে মগধ। নৌকোয় করে গঙ্গা পার হবার সময় আমার মনে পড়ল, এই জলধারাতেই আনন্দ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর শবদেহের দাবিদার ছিল মগধ আর বৈশালী। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বহুদূর বিস্তৃত পাটলিপুত্র নগরী। তথাগতর সময়ে এ ছিল পাটলিগ্রাম, নগর তৈরি সবে শুরু হয়েছিল। এই পাটলিগ্রাম পরে জম্বুদ্বীপের মহানগরীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত আর অশোক এখান থেকেই রাজ্য শাসন করতেন। গুপ্তরাজাদেরও রাজধানী ছিল এই পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্রের রাজলক্ষ্মী এখন বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছেন।

মগধ এক পুণ্যভূমি। এখানে বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া)-য় সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এখানে রাজগৃহে কতবার তথাগত ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে তথাগতর চরণধূলির স্পর্শে পুণ্য হয়েছিল গৃধ্রকূট, নালন্দা প্রভৃতি বহু স্থান আছে। আমি ঠিক করলাম নালন্দা থেকে বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করব। চন্দ্রগোভী আর চন্দ্রকীর্তির মতো মহাপণ্ডিতদের পদতলে বসে বিদ্যাধ্যয়নের সৌভাগ্য কি আর হবে ?

আট

আমি আব বুদ্ধিল দুজনেই ছিলাম জন্ম-যাযাবর। দেশভ্রমণেই আমাদের আনন্দ। ভিক্ষু হবার পর উদ্যানের বিহারে কয়েক বছর যে এক জায়গায় ছিলাম তখন বিপুল এই পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করতে পারি নি। কিন্তু এখন আমি ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছি। তাই ভাবতে আশ্চর্য লাগে ; পুরো তিনটি বছর কী করে আমি নালন্দায় থাকতে রাজী হয়েছিলাম ! তবে আমার কাছে বিদ্যার আকর্ষণ ভ্রমণের চেয়ে কিছু কম ছিল না। বুদ্ধিলেরও তাই। তাই বোধ হয় পায়ে বেড়ি বেঁধে নালন্দায় বিদ্যার অথৈ সমুদ্রে ডুব দিতে পেরেছিলাম।

সে তিন বছর পড়াশোনার এত অবসর পেয়েছিলাম, যা সারা জীবনে কখনও পাই নি। আমি জানতাম, এ সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না।

স্থবির সুনন্দর সঙ্গে আমরা রাজগৃহ, নালন্দা আর বজ্রাসন পর্যন্ত ছিলাম। তারপর তিনি চলে গেলেন তাঁর নিজের দেশে। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, আমরা সিংহল যাই। তাঁর ইচ্ছার চেয়েও বড় ছিল আমাদের ইচ্ছা—মহাসমুদ্রের মাঝে এই দ্বীপটিকে একবার দেখি। তাই নালন্দা ছেড়ে যাবার সময় আমরা ঠিক করলাম সিংহলেও যাব। শত শত যোজনের পথ নালন্দা। জলপথে যাওয়াই আনন্দের, আর সেটা তাড়াতাড়িও হ'ত। কিন্তু আমরা জল আর স্থল উভয় পথেই যাব স্থির করলাম।

তাম্রলিপ্তি পূর্বসমুদ্রের এক বিরাট বন্দর। এখানে এসে আমরা নানা দেশের সার্থবাহের নৌকো আর নানা দেশের লোক দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে ছিল মহাচীনের ব্যবসায়ী। আর ছিল যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), কম্বোজ, পারস্য, যবন (গ্রীস), রোম প্রভৃতি দেশের নানা রঙের নানা রূপের মানুষ। ভ্রমণের স্বাদ যে পেয়েছে তার ভ্রমণ যত কঠিন আর দূরের হবে ততই ভালো লাগবে। আমরা যদি তাম্রপর্ণী (সিংহল) যাবার কথা না ভাবতাম, তাহলে এত দিনে হয়তো যবদ্বীপ হয়ে চীনে পৌঁছে যেতাম। ধান্যকটক আর শ্রীপর্বত আমরা স্থলপথেই যেতে পারতাম। তবে জলপথের চেয়ে স্থলপথেই বেশি ভয়। জলপথে শুধু দস্যুর ভয়, স্থলপথে দস্যু ছাড়া বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও ভয় আছে। তাম্রলিপ্তি থেকে কয়েকটি জাহাজ অন্ধ্রদেশের ধান্যকটক নগরে যাচ্ছিল। তাতে শ্রীপর্বতের তীর্থযাত্রী কয়েকজন ভিক্ষু আর উপাসক-উপাসিকাও ছিলেন। আমরাও সেই জাহাজে যাব ঠিক করলাম।

বর্ষা আমরা নালন্দায় কাটিয়েছিলাম। তাম্রলিপ্তি পৌঁছুতে পৌঁছুতে শীত এসে গেল। আমাদের উত্তানে দেখেছি, পাহাড়ের যত ওপরে উঠি ততই শীত বাড়ে; আর যত নিচে নামি তত গরম লাগে। কিন্তু তাম্রলিপ্তির পথে এই যাত্রায় প্রথম জানলাম, যত দক্ষিণে যাব তত গরম পাব, আর যত উত্তরে যাব তত ঠাণ্ডা। অন্ধ্রদেশে আমরা শীতকালে পৌঁছেছিলাম, কিন্তু সেখানে শুধু নামেই শীত। তাম্রপর্ণীর লোকেরা তো শীত কাকে বলে জানেই না। ধান্যকটক দক্ষিণাপথের এক মহানগরী, ইক্ষ্বাকুবংশের শাসনকালে খুব সমৃদ্ধ ছিল। সমুদ্র থেকে কৃষ্ণানদী হয়ে এখানে বড় বড় জাহাজ আসত।

ধান্তকটক রাজার রাজধানী ছাড়া শ্রেষ্ঠীদেরও রাজধানী ছিল। কিন্তু আর সে বিশাল রাজ্যের রাজধানী নেই। তার বৈভব হরণ করেছে কাঞ্চী। কাঞ্চীতে এখন পল্লববংশ শাসন করছে। পুরনো দিনের বৈভব আজ ধান্তকটক আর শ্রীপর্বতের মহান্ চৈত্যগুলিতে বিদ্যমান। শ্বেতপাথরের সুন্দর সুন্দর মানুষ পশুপাখি বৃক্ষলতা পুষ্প আঁকা রয়েছে। আমি চিত্রকার নই, মূর্তিকারও না। কিন্তু কপিশা, গান্ধার, মথুরা, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের শিল্পকলা দেখেছি। তাই জানি, শ্বেতপাথরের এই সব শিল্পে অপূর্ব শিল্পকৌশল দেখানো হয়েছে।

ধান্তকটক থেকে আমরা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে শ্রীপর্বতে গেলাম। কৃষ্ণা নদীতে নৌকোয় করে কিছু দূর গিয়ে ঘন জঙ্গল পার হয়ে পৌঁছুলাম শ্রীপর্বতে। আর্য নাগার্জুন বহুদিন এখানে ছিলেন। ভিক্ষুদেরও পছন্দ ছিল এই রমণীয় পর্বতস্থল। তাই বোধ হয় উত্তরে দেখতে পেলাম, বহু প্রাচীন সংঘারাম আর বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

আমরা আবার ধান্তকটকে ফিরে সমুদ্রপথে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম। নদীর ভেতরে বেশ কিছুটা দূর গিয়ে পেলাম কাঞ্চীপুরী। কাঞ্চীপুরীর পল্লব-রাজা ধান্তকটকের সৌভাগ্য হরণ করেছেন। দক্ষিণাপথে পল্লব নৃপতিই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। তাঁর কাঞ্চীপুরী কেবল রাজধানী বলেই এত সমৃদ্ধিশালী নয়, বড় বড় স্থল আর জল-সার্থবাহও এখানে থাকেন। দ্বীপ-দ্বীপান্তরে তাঁদের বাণিজ্য চলে। রাজা পাশুপতধর্মে আস্থাশীল। তাই এখানে অনেক পাশুপত দেবালয় আর মঠ আছে। বৌদ্ধ আর জৈনরাও আছে এখানে। তাদের সংঘারাম এবং উপাশ্রয়ও আছে, কিন্তু শ্রী নেই।

কাঞ্চী থেকে সমুদ্রপথেই গেলাম কাবেরীপত্তন। সমুদ্রের তীরে বিশাল এই পত্তন তাম্রলিপ্তির মতো দ্বীপ-দ্বীপান্তরে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কাবেরীপত্তন থেকে জাহাজে করে সিংহলদ্বীপের তীরে জম্বুকোলপত্তনে নামলাম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এক সপ্তাহ পরে গিয়ে পৌঁছুলাম সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরে। অনুরাধপুরে তিনটি বড় বড় আর অনেক ছোট ছোট সংঘারাম আছে। আমরা অভয়গিরিতে গিয়ে উঠলাম। এখানকার মহাবিহার সবচেয়ে পুরনো আর পূজ্য বিহার। অশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র এই বিহার স্থাপন করেছিলেন। আমাদের হিসাবে এখন এখানে ভীষণ শীতকাল, কিন্তু কোথাও শীতের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। মশামাছির জন্য গায়ে চাদর দেওয়া যেতে পারে,

কিন্তু শীতের জন্য নয়। সিংহলের রাজা কুমার ধাতুসেন মহাবিহারের ভক্ত। আবার অভয়গিরির প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। যবন, মিশর, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের লোক আছে এখানে। তাদের অনেকে নিজেদের আলাদা আলাদা পাড়া তৈরি করে নিয়েছে।

শীতের শেষে এল গ্রীষ্ম। আমরা মধ্যমণ্ডলের গ্রীষ্ম সহ্য করেছি, কিন্তু এখানকার গ্রীষ্ম তত কঠোর না হলেও আমাদের মতো বরফের দেশের লোকেদের কাছে প্রিয় নয়। গ্রীষ্মশেষে বর্ষাবাস করে আমরা সিংহল ছাড়ব ঠিক হ'ল। শুনতে পেলাম, রাজধানীর দক্ষিণের পাহাড়ে এখন শীত। সেখানে গ্রাম বেশি নেই, কিন্তু ছোট ছোট বিহার আছে কয়েকটা। এই গ্রীষ্মের দেশে এমন শীতল ভূমি দেখার ইচ্ছা হ'ল খুব। আমরা রওনা হলাম। ছদিন পথ চলার পর পাহাড়ে এলাম। পাহাড়ের পর পথ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। কখনও কখনও দু-তিন যোজনের মধ্যে কোনো গ্রামের চিহ্ন নেই। আমাদের সঙ্গে চলেছে এক সার্থদল। রাজধানীতেই আমরা শুনেছিলাম, এইসব পাহাড়ে বন্য ব্যাধ থাকে, তারা নরহত্যা করে। তাই দল বেঁধে সতর্ক হয়ে পথ চলতে হয়। কিন্তু কোনো ব্যাধের সন্ধানই আমরা পেলাম না। যতই ওপরে উঠছি ততই গরম দূরে পালাচ্ছে। দশদিন পথ চলার পর আমরা পাহাড়ের মধ্যে এক বিরাট সরোবরের তীরে এসে পৌঁছুলাম। একটি সরোবর থেকে একটি নদী বার হয়েছে। সরোবরের ধারে সুন্দর ছোট্ট একটি সংঘারাম আছে। তার চারদিককার পাহাড় লতাগুল্ম আর গাছে ঢাকা। এই বনে হাতি আছে অনেক, তবে বাঘ-সিংহ নেই। এমন মনোরম জায়গা দেখে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। যদিও এখানে আকাশ-ছোঁয়া দেবদারু গাছ নেই, বরফে ঢাকা পর্বতশিখর নেই, তবু এ দৃশ্য পরম রমণীয়। আমার মতো বুদ্ধিলও সৌন্দর্য-ভূমির পূজারী। লোকে আমাদের সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা হাতির পরোয়া করি নি, ব্যাধের ভয় করি নি। কখনও সকালে, কখনও বিকালে এখানকার কোনো ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে দূর-দূরান্তে বেড়াতে চলে গেছি।

সকালে সূর্যোদয়ের সময়েই আমরা সারা দিনরাতের নিরাহার-ব্রত ভেঙে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলাম। মধ্যাহ্নের পর ভিক্ষুরা আহার করতে পারেন না। ফিরতে যদি মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়, তাই আমরা পাঁচ ভিক্ষু আর সঙ্গের উপাসকের জন্য প্রচুর খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। আজ আমরা আরও দূরে

যাব। পথ আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আমাদের সঙ্গের উপাসক আর এক ভিক্ষু, শিকারী আর ব্যাধের সঙ্গে বস্তু-বিনিময়ের জন্য কয়েকবার এখানে এসেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই এ পথের সন্ধান আমরা পেয়েছি। দুপুর পর্যন্ত আমরা চললাম। তারপর খাবার সময় হ'ল। ছোট্ট এক নদীর তীরে গাছের শীতল ছায়ায় বসে পড়লাম। সরোবর থেকে এ জায়গা দু যোজনের কম হবে না। পথে কোনো কোনো জায়গায় চড়াই-উতরাই। কোথাও কোথাও পথ খুব দুর্গম। কিন্তু উদ্যানের পাহাড়ী পথ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। একটু বিশ্রাম করে আমরা খেয়ে নিলাম। আমি যখন উদ্যানের কথা বলছিলাম, আমাদের সঙ্গী সিংহল-ভিক্ষু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বুদ্ধিল মাঝে মাঝে সবাইকে হাসাচ্ছিলেন। কিন্তু উপাসকের মুখে হাসি নেই। সরোবর থেকে আসার সময় তিনি খুব হাসিখুশি ছিলেন। আমাদের ভয় হ'ল। ভয়ের জায়গাই এটা। কারণ, সিংহলের এমন ঘন জঙ্গলে আমরা এসেছি, যেখানে একটা গ্রাম নেই, ঘর নেই। এখানকার মাটিতে কোনোদিন হাল-কোদাল পড়ে নি। সেই আদিকাল থেকে এ মহাবনই রয়ে গেছে।

উপাসক সব সময়েই উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছেন। একটু শব্দ হলেই চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছেন। তাঁর কাছে কুড়ুল আর তীরধনুক আছে। আমাদের পাঁচ ভিক্ষুর কাছে কোনো অস্ত্রই নেই। এতটা পথ হেঁটে আমরা খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাবার পর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হ'ল। আমরা শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের ঘুম নেমে এল চোখে। একটু পরে হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, প্রায় কুড়িজন ব্যাধ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরে তাদের বস্ত্র নেই। ছোট ছোট পা, জাম-কালো গায়ের রঙ—কিন্তু সুগঠিত দেহ। কাঁধে তাদের ধনুক-বাণ, হাতে ধারাল কুড়ুল। উপাসকের অবস্থাই সবার চেয়ে খারাপ। সারা শরীরে যেন তাঁর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। ব্যাধেরা চিৎকার করে কী সব বলছে, কিন্তু তাদের একটা কথাও আমরা বুঝতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করে বুঝতে পারলাম, আমরা মহাকালের মুখে পড়েছি, ব্যাধের দেশে এসে দারুণ অপরাধ করেছি।

তারা আমাদের বেশিক্ষণ ভাবতে দিল না। উপাসকের অস্ত্রগুলি কেড়ে নিয়ে একদিকে চলতে ইশারা করল। চারদিক ঘিরে আমাদের নিয়ে তারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। ঘন জঙ্গল যেন আরও ঘন হচ্ছে। আমি আমার

সামনের দুটি ব্যাধকে দেখেছি। তারাও উলঙ্গ। একজন যেন সবার চেয়ে বেশি বলশালী। তার চুলে ফুলপাতা আর পালকের বিন্যাস অন্য সবার থেকে তাকে ভিন্ন করে তুলেছে। হয়তো সে ব্যাধের দেশের রাজা। দ্বিতীয়জন বয়েসে তরুণ। তার সঙ্গে এই রাজার কী সম্বন্ধ তা আমি ভেবে পেলাম না। তার দেহ সবচেয়ে সুন্দর আর সুগঠিত। যেন কোনো কুশলী তাস্কর তার সমস্ত শিল্প ঢেলে কৃষ্ণপাথরে এই মূর্তি গড়েছে। সবার কাছেই নিজের রঙ পছন্দ। আমার সঙ্গীদের মধ্যে বুদ্ধিলের রঙই সবার চেয়ে হাল্কা। তবু তাকে আমাদের উদ্যানের লোকেরা শামলা বলবে। সিংহলের দুই ভিক্ষু ছিলেন গম-রঙের। বাকি এক ভিক্ষু আর উপাসকের রঙের সঙ্গে এই ব্যাধদের রঙের কোনো পার্থক্য ছিল না।

ব্যাধেরা যখন আমাদের বন্দী করেছিল তখনই তারা আমার দিকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করেছিল। আমার মনে হয়েছিল, তারা আমার ফর্সা রঙ আর নীল চোখ সম্বন্ধে কিছু বলছে। তখন কি জানি, আমার এই বৈশিষ্ট্য আমার উপকারের বদলে অপকার করবে।

সূর্যাস্ত হতে তখন অল্পই বাকি। আমরা এক পাহাড়ী নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে এক বিরাট গুহার সামনে পঁচিশ-তিরিশ জন লোক। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী আর শিশু। দু-চারজন বৃদ্ধও ছিল। বৃদ্ধদের চুলের রঙ কালো। কেবল দেহের বলিরেখা দেখে বুঝতে হয়, তারা বৃদ্ধ। গুহাদ্বারে পৌঁছুনোর আগেই আমাদের সঙ্গের ব্যাধেরা ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠল। এমনি চিৎকার অবশ্য তারা সারা পথেই করেছিল। এমনি করেই হয়তো তারা বন্য পশু তাড়ায়। গুহার সামনে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা ওদের অভ্যর্থনা জানাল। ব্যাধেরা আসলে আমাদের ধরতে যায় নি, গিয়েছিল শিকার করতে। তারা বহু খরগোশ আর হরিণ মেরেছে। চামড়ার থলেয় করে মধু ভরে এনেছে। শিকার করতে করতেই আমাদের সঙ্গে তাদের দেখা। গুহার ভেতরে নিয়ে গিয়ে তারা আমাদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। পাঁচজন অস্ত্রধারী ব্যাধ আমাদের দেখাশোনার জন্য রয়ে গেল।

আমরা এখন আদি মানবের মধ্যে রয়েছি। তাদের ভাষা বুঝি না, ইশারাও বুঝি কম। কিন্তু জীবনের এমন কতকগুলো বিষয় আছে, যা সব জাতির মধ্যেই এক। তাই ভাষা না জানলেও আকারে ইঙ্গিতে আমাদের পরিস্থিতি খানিকটা

আন্দাজ করতে পেরেছি। আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের জীবনের আর বেশি দিন বাকি নেই।

বুদ্ধিল বললেন : দিন নয়, মুহূর্ত বলো। কারণ, কয়েকদিন এইভাবে রাখলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

উপাসক বললেন : ওরা আমাদের প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না।

সিংহলের নগরবাসী কিংবা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেবল অস্ত্রশস্ত্র লেনদেন ছাড়া ব্যাধদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তারা জানে না, কোথা থেকে লোহা আসে। তাদের পূর্বপুরুষদের ঘাড়ে, পিঠে আর হাতে লোহার অস্ত্র পড়ার পর তারা বুঝতে পেরেছিল, এই বস্ত্রধারীদের কাছে এমন এক জিনিস আছে, যা না হলে তাদের চলবে না। তারপর কে জানে কবে, কিছু না বলেই পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল—ব্যাধেরা তাদের শিকার করা পশু কিংবা মধু এমন জায়গায় রেখে আসবে, যেখানে বস্ত্রধারীদের যাতায়াত আছে; আর বস্ত্রধারীরা ব্যাধদের জিনিস নিয়ে তার বদলে রেখে আসবে লোহার দা, কুড়ুল, ছোরা, বাণের ফলা এইসব। এমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ না হয়েই বস্তু-বিনিময়ের এক সম্পর্ক গড়ে উঠল। জঙ্গলের রাজা ব্যাধ আর গ্রামের রাজা বস্ত্রধারী সিংহলী। এক সময় হয়তো সিংহলে খুব জঙ্গল ছিল। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ আর মহামারী থাকা সত্ত্বেও মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের আরও গ্রাম আর ফসলের ক্ষেতের দরকার হয়েছে। তারা তখন জঙ্গলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলেছে। জঙ্গলের রাজাই বা তার অধিকার ছাড়বে কেন? তাই সংঘর্ষ বেধেছে। কখনও সে সংঘর্ষ উগ্র আকাব ধারণ করেছে, আবার কখনও তা শান্ত থেকেছে। কিন্তু সংঘর্ষের শেষ হয় নি কখনও, চলছেই।

আমাদের কপালে কী লেখা আছে তা আমরা নিশ্চিত জেনেছি। সে রাত্রে তারা আমাদের ঐ গুহাতেই থাকতে দিল। বাইরে দু-তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে শিকার পুড়িয়ে তারা খাচ্ছে। নাচগান করছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নাচগান চলল। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। গুহার ভেতরে অনেক জায়গা, কিন্তু দরজা সংকীর্ণ। দরজায় যমদূতের মতো অস্ত্রধারী প্রহরী বসে। পালিয়ে যাবার ইচ্ছা আমাদের কারও নেই। তা সম্ভবও নয়। উপাসক তো আগে থেকেই মরে রয়েছেন। চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই তাঁর করার নেই।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হ'ল। সূর্যোদয় হ'ল। মৃত্যুর ছায়াতেও করুণাময় নিদ্রা আমাদের পরিত্যাগ করে নি। সূর্যের আলো দেখে উপাসকের শুকিয়ে-যাওয়া দুচোখ থেকে আবার জল ঝরতে লাগল। উপাসক আর একজন ভিক্ষু বাকি আগেও ব্যাধ দেখেছেন। কিন্তু আসলে তাঁরা অনুরাধপুরে কয়েকজন দাস-ব্যাধকে দেখেছেন। বন থেকে হাতি ধরে যেমন মোটা দামে বিক্রি করা হয় তেমনি বনের এই মুক্ত মানুষদের ধরে ধরে বিক্রি করা সিংহলের বহু লোকের ব্যবসা। কিন্তু মুক্ত ব্যাধরা স্বেচ্ছায় তাদের হাতে ধরা দেয় না, প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করে। এতে কত ব্যাধ মারা যায়, কত ব্যাধ আহত হয়। সিংহলের দাস-শিকারীরা বালক আর স্ত্রী-ব্যাধ ধরতে বেশি পছন্দ করে। কারণ, বড়রা দাসত্ব-জীবন সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি মারা যায়। আমরা তো সেই সমাজের লোক, যারা ব্যাধদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। সুতরাং এখন আমরা কী করে তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করব।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতি মুহূর্তে সেই শেষক্ষণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। মুহূর্তের পর মুহূর্ত দুঃসহ হয়ে উঠছে। আমি আর বুদ্ধিল চাইছি, কোনো রকমে শেষ ছুটি হয়ে যাক। কিন্তু এক প্রহর দিন কেটে গেল, তবু প্রহরীরা ছাড়া আর কেউ এল না। আমাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। সময় আর কাটতে চায় না। বুদ্ধিল তাই কথা বলতে লাগলেন : মানুষে-মানুষে সত্যিকারের বন্ধুত্ব আর উদারতা না থাকলে প্রতি মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। আমি এমন সব লোকের কথা শুনেছি, যারা মানুষ খুন করে তার মাংস খায়। সৌভাগ্যক্রমে সিংহলদ্বীপের ব্যাধেরা মনুষ্যভুক্ নয়। কিন্তু তারা যদি খাবার জন্য আমাদের ধরত তাহলে আমি খুব খুশি হতাম। একদিন তো এ দেহের মৃত্যু হবেই। যদি তা দিয়ে দশ-বিশটা মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় তাহলে তার চেয়ে বড় উপযোগ আর কী হতে পারে? এই ব্যাধদের আমরা কী করে দোষ দেব? আমরা সুসভ্য নাগরিক, তাদের চেয়ে জ্ঞানে আর সংস্কারে অনেক উন্নত। আহার-নিদ্রা-মৈথুনকেই জীবনের শেষকথা বলে আমরা স্বীকার করি না। তবু আমরা বন্য পশুদের মতো তাদের ঘেরাও করে ধরি, হাটে নিয়ে গিয়ে যে বেশি দাম দেয় তার কাছে বিক্রি করি। পশুদের মধ্যেও স্বজাতিপ্রেম আছে; যত হীন অবস্থাই হোক, আপন সন্তান আর বন্ধুপরিজনদের জন্য তাদেরও হৃদয়ে ভালোবাসা আছে। আমাদের কাছে লোহার তীক্ষ্ণ কৃপাণ আছে আর ভালো ভালো অস্ত্র আছে।

কিন্তু ব্যাধেরা আমাদের কাছ থেকেই পাওয়া সাধারণ অস্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষা করে, শিকার করে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। লড়াইয়ের সময় তারা অনেক কষ্টে পঞ্চাশজন কি একশজনকে একত্র করতে পারে, আমরা পারি হাজার হাজার। হাতির কাছে যেমন পিঁপড়ে, আমাদের কাছে তেমনি তারা। কিন্তু পিঁপড়েও তো প্রতিশোধ নেয়। একটা সীমা পর্যন্ত কোনো অপরাধের দায়িত্ব ব্যক্তির; সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখন সে দায়িত্ব সমস্ত সমাজের ওপর বর্তায়। আমরা ছজন মানুষ, যাদের প্রাণ এই ব্যাধদের হাতে, এ কথা বলে কিছুতেই অপরাধমুক্ত হতে পারি না যে, আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করি নি। মানুষ সাপ দেখামাত্র মেরে ফেলে। কিন্তু কখনও কি চিন্তা করে, ঐ সাপটা তার কোনো ক্ষতি করে নি? ঠিক তেমনি আমাদের সমগ্র বস্ত্রধারী সমাজ এই ব্যাধদের কাছে অপরাধী। কারণ, আমাদের সমাজের লোকেরাই তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করেছে।

ভিক্ষু উদার ভাবনা নিয়েই তো মানুষ ভিক্ষু হয়! তাই সবাই মন দিয়ে বুদ্ধিলের কথা শুনছিলেন। কিন্তু উপাসক গভীর রাত্রি পর্যন্ত কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন ঘুম ভাঙতেই আবার কাঁদতে শুরু করে দিলেন। সিংহলী ভিক্ষু তাঁকে অনেক বোঝালেন, কেঁদে কোনো লাভ নেই, এখন আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

কিন্তু বেচারা উপাসক কোন্ আশায় ধৈর্য ধরবেন! তিনি বললেন: তলোয়ারের এক আঘাতে যদি এরা আমাদের শেষ করে দিত তাহলে ধৈর্য হারাতাম না। কিন্তু এরা আমাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে। শরীরের মধ্যে বল্লম ঢুকিয়ে দেবে, এক-একটি করে অঙ্গ কেটে ফেলবে কিংবা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেবে।

উপাসক ব্যাধদের সম্বন্ধে যা যা শুনেছিলেন, বলে গেলেন। বলতে বলতে তিনি আরও ভীত হয়ে পড়লেন। আবার কাঁদতে লাগলেন।

বুদ্ধিল বললেন: অন্তত এদের সামনে আমাদের দীনতা দেখানো উচিত নয়। যদি এরা মনে করে আমরা ভীরু তাহলে আরও নিষ্ঠুরভাবে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।

উপাসক কোনো কথা শোনার জন্য তৈরি ছিলেন না। আমাদের মধ্যে বুদ্ধিলই সবচেয়ে শান্ত। যেন কিছুই হয় নি, হবেও না।—এমনি ভাব তাঁর। আমি কিন্তু অত দৃঢ় নেই। তবু আমার মৃত্যুভয় নেই। জীবনে আমি-আমার

-সাময়িকের জন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। তাই ভাবছিলাম, আগে থেকে চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে লাভ কী! যখন চিন্তা করার তখন করব। আমি গুহাদ্বারে বসে-থাকা তরুণ ব্যাধদের দেখছিলাম। তারাও আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন আমাদের সব কথাই বুঝতে পারছে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর প্রহরী বদল হচ্ছে, গুহার ভেতর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাইরে অজ্ঞ মানুষের আওয়াজ। আমার ভারি ইচ্ছা করছিল, দেখি তারা কী করছে। কিন্তু গুহার মুখে যাবার সাহস ছিল না, হয়তো বল্লম বসিয়ে দেবে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে আমার জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হ'ল। একদল ছেলে আর এক ঝাঁক স্ত্রীলোক আমাদের দেখতে এল। ছেলেদের হাতে হরিণ কিংবা খরগোশের মাংসযুক্ত হাড়। স্ত্রীলোকদের মুখেও হাড় অথবা অন্য কিছু। তারা আমাদের দেখতে এসেছে। তাদের কাছে আমরা তামাশার জিনিস। আমাদের কোনো নগরে যদি এই উলঙ্গ কালো মূর্তির দল যেত তাহলে তারাও আমাদের কাছে এই রকম তামাশার জিনিস হ'ত।

কিছুক্ষণ পরে গুহার দরজার সামনে যেখানে খানিকটা জায়গা খালি ছিল সেখানে বৃদ্ধ আর বয়স্কদের একটা দল এসে বসল। একজন বৃদ্ধ বসল আমাদের দিকে মুখ করে। সবার মুখের ভাবে আর আচরণে মনে হ'ল, তারা এই বৃদ্ধকে খুব শ্রদ্ধা করে। সবাই চিৎকার করে কথা বলছে।. আমরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ মাথা নাড়ছে আর তার মাথায় জল-না-পাওয়া কালো কালো চুল দাঁড়িয়ে উঠছে। তার চোখ লাল। ঘন কালো দাড়িওয়ালা মুখে অসংখ্য বলিরেখা তাকে আরও ভীষণ করে তুলছে। কিছুক্ষণ সে নেশার ঘোরে কিংবা পাগলের মতো চিৎকার করে কী সব বলে গেল। তারপর গুহার ভেতর ঢুকে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। শুধু তাই নয়, মাথায় পিঠে আর হাতে হাত ঠেকিয়ে দেখল। উপাসকের তো প্রাণ উড়ে গেছে। তাঁর কাতর মুখ দেখে বৃদ্ধ তাঁর পিঠে একটা লাথি মারল, তারপর কী যেন বলল।

বৃদ্ধ বাইরে যেতেই দলটা উঠে চলে গেল। আমাদের খুব খিদে পেয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর মুখে তা মাথাচাড়া দিতে পারে নি। পিপাসায় তালু শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রহরীদের কাছে জল চাওয়া বৃথা। কিন্তু আশ্চর্য, একটু পরেই একজন পুরুষ চামড়ার খোলে করে জল নিয়ে এল। আমরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। তখনই সে আমাদের মধ্যে থেকে উপাসককে ধরে নিয়ে গেল।

উপাসক বাধা দিলেন, ছটফট করলেন, না যাবার চেষ্টা করলেন। ফলে তিনি আরও দু-চারটে বেশি লাথি-ঘুষি খেলেন।

বুদ্ধিল বললেন : তাহলে ইনিই প্রথম বলি হলেন।

—দেবতার সামনে বলি?

—হ্যাঁ, দেবতার সামনেও বলি হতে পারে। আমার ভয় হয়, উপাসকের এই ভীরুতা প্রদর্শনের ফল খুব খারাপ হবে। ব্যাধেরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে। তারা যত বন্যই হোক, আমাদের আর তাঁর মধ্যে যে প্রভেদ তা তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। আমাদের পীতবসন আর উপাসকের শ্বেত। উপাসকের মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ আর আমরা মুণ্ডিত মস্তক। তারা নিশ্চয় ভেবেছে, এই প্রভেদের কোনো-না-কোনো কারণ আছে। আমাদের লোকেরা প্রতি বছর কয়েক শ' ব্যাধ বন্দী করে নিয়ে যায়, তার মধ্য থেকে হয়তো কেউ কেউ পালিয়ে চলে এসেছে। তাদের ভাষা আছে, যদিও সে ভাষা সমৃদ্ধ নয়, সে ভাষায় শাস্ত্র আর ধর্মচর্চা হয় না। তবু আমাদের সম্বন্ধে সব কথা তো তারা বলতে পারে।

সিংহলের ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে প্রৌঢ় এবং জ্ঞানে আর বুদ্ধিতে অনেক গম্ভীর, তিনি এ সময় আশ্চর্য রকম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন : আমাদের দাস-ব্যবসায়ীরা তরুণ-তরুণী আর প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ব্যাধদেরও ধরে, তাদের কাবেরীপত্তন, কাঞ্চী কিংবা অন্য কোনো দূরদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সিংহলের লোকেরা কেবল তাদের শিশুদেরই কেনে। কারণ খুব স্পষ্ট, তরুণ কিংবা প্রৌঢ় ব্যাধেরা স্বচ্ছন্দ বন্য জীবনের লোভে সুযোগ পেলেই জঙ্গলে পালিয়ে আসে। যদিও সিংহলে রূপে-রঙে তাদের মতো দেখতে এমন লোকের অভাব নেই, তবু তাদের চালচলনে লোকে চিনে ফেলে। অনুরাধপুর থেকে যেসব ব্যাধ পালিয়ে যায় তারা বড় জোর দু-চারটে গ্রাম যেতে পারে। তারপরই ধরা পড়ে যায়।

আমি বললাম : আমাদের মধ্যে পাঁচ-সাত বছর থাকার পর তারাও তো আমাদের ভাষা শিখে নেয়। সে-রকম যদি কেউ থেকে থাকে এদের মধ্যে!

—তার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ শিশুদেরই সিংহলে রাখা হয়। তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের সমাজকে ভুলে আমাদের ভাষা, রীতিনীতি, বেশভূষা, খাওয়াদাওয়া সব শিখে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সমাজের

লোকেদের হীন অবস্থাকে ঘৃণা করতে শেখে। তবু যদি কেউ পালিয়ে যাবে বলে সন্দেহ হয় তাহলে তাকে বিদেশী দাস বণিকের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মাত্র এক-আধজনই জঙ্গলে পালিয়ে আসতে পারে।

এই সব শুনে আমি ভাবছিলাম, যদি তেমন কাউকে পেতাম তাহলে হয়তো আমাদের ভাগ্যের কথা আরও বেশি করে জানতে পারতাম। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন হাস্যকর।

উপাসককে নিয়ে যাবার পর দুজন তরুণ ভিক্ষুকে তারা এক সঙ্গে নিয়ে গেল। আর আমরা তিনজন যমদূতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার মনে হ'ল, এই পৃথিবীতে আমাদের আয়ু আর সামান্য কিছুক্ষণ। সিংহল-স্থবিরকে আমি কোনো বুদ্ধসূত্র পারায়ণ করতে বললাম। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ধর্মপদের কয়েকটি গাথা গাইলেন। তারপর মহাপরিনির্বাণের জন্য ভগবান তথাগতর রাজগৃহ থেকে পাটলিগ্রাম আর বৈশালী হয়ে কুশীনগর পর্যন্ত যাত্রা এবং শেষ সংস্কার বর্ণনা করে যে সূত্র আছে তা পারায়ণ করলেন। এতে আমরা অনেক সান্ত্বনা পেলাম। তবু ভয় হচ্ছিল, পাছে শেষ করতে না পারি। পারায়ণ শেষ হবার একটু পরেই আবার তারা এসে আমার বাকি দুই সঙ্গীকে একসঙ্গে নিয়ে গেল। আমার দুঃখ হ'ল, বুদ্ধিল আর আমাকে একসঙ্গে নিয়ে গেল না বলে। আমরা একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলাম যে, জ্ঞানবৈরাগ্যের কথা বললেও আমাদের বিচ্ছেদব্যথা সহ্য করতে পারতাম না।

এখন গুহার ভেতরে একা আমি। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ব্যাধেরা তাঁদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। এবার তাঁদের ঠিকমতো বসাল। তাঁদের পরে নিয়ে যাবার কারণ হয়তো তাঁদের প্রতি বিশেষ দয়াপ্রদর্শন, তলোয়ারের এক আঘাতে ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কল্পনা আমার দৌড়োচ্ছে। মনে হচ্ছে, সারাটা দিন কেটে গেছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু আসলে সে আমার ভ্রম। সংকটের মুহূর্তগুলি বড় দীর্ঘ হয়। আমার এখন একটিমাত্রই বাসনা, আমাকে যেন তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়। আমি দেখলাম, গুহাদ্বারে এখন মাত্র একজন প্রহরী রয়েছে।

সন্ধ্যার আগে প্রহরী এসে আমাকে গুহার বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে এক ঝাঁক স্ত্রী-পুরুষ আর শিশু আমাকে ঘিরে ধরল। আমার সঙ্গীদের গায়ের রঙ তাদের মতো ছিল না। বিশেষ করে, বুদ্ধিল আর দুই ভিক্ষুর। কিন্তু আমি তাদের কাছে এক জন্তুবিশেষ। হয়তো তারা কখনও আমার মতো

গৌরবর্ণ মানুষ দেখে নি। ছোট ছোট ছেলেরা আঙুলে থুথু মেখে আমার গা ঘষে দেখল, আমি কোনো রঙ মেখেছি কিনা। রঙ মাখা আর স্থায়ী-অস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করার কথা তারাও জানত। যাই হোক, তারা দেখল, আমি কোনো রঙ মাখি নি। আমার নীল চোখ, আর তার চেয়েও বিচিত্র আমার সোনালী ভুরু। সাতদিন আগে কামানো মাথায় ছোট ছোট চুল ছিল, তাও সোনালী। দেহের গঠন তাদের চেয়েও বড়। তারা নিজেদের মধ্যে আমাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করে হাসাহাসি করল। তারা আমার শরীর নিয়ে খেলা করতে কোনো দ্বিধা বোধ করছে না, কিন্তু কোনো কষ্টও দিচ্ছে না। অন্ধকার হবার আগেই তারা এক টুকরো পোড়া মাংস আর চামড়ার খোলে করে জল এনে আমার সামনে রাখল। হঠাৎ একটা ছুরি এসে যেন আমার বুকে বিঁধল! এরা কি আমাকে মারতে চায় না? বুদ্ধিলের মতো বন্ধুকে হারিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে? আমার বুক কাঁপতে লাগল। সারাদিন অভুক্ত থাকার ফলে খিধেয় পেট জ্বলছে। তবু সন্ধ্যায় আহার করে ভিক্ষুনিয়ম ভঙ্গ করতে আমি রাজী হলাম না। তাই পিপাসা নিবারণের চেয়েও বেশি করে জল খেয়ে নিলাম। রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। সেই অন্ধকার আমার কাছে অনন্ত নিবিড় বলে মনে হচ্ছে। মনে আমার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। সব শূন্য।

এক প্রহর রাত্রি কেটে গেল। আমার মনে হ'ল, যেন এক যুগ। এমন সময় কে যেন সিংহলী ভাষায় আমাকে ডাকল: ভন্তা (স্বামী)!

এমন সম্বোধনের লোক আমি নই। তাই বার বার শুনেও বুঝতে পারলাম না, সত্যিই কেউ আমাকে ডাকছে কি না। আমি এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে, স্বপ্ন আর জাগরণের সীমারেখা মুছে গেছে। ঘুম আসবে কী করে? মানসিক চিন্তা ভুলবার জন্য প্রার্থনা করছি: নিদ্রাদেবী, তুমি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসে আমার দু চোখে আবাস করো। কিন্তু সে সৌভাগ্য কোথায়! তবু যখন সিংহলী কথা শুনলাম তখন মনে হ'ল, স্বপ্ন দেখছি। দু-চার ডাকেও যখন আমি উত্তর দিলাম না, তখন সে হয়তো ভাবল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই জোরে জোরে আমার হাত ধরে ঝাঁকাল। আমি শুয়ে ছিলাম, উঠে বসলাম। লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না—যদিও চাঁদের আলো ছিল। তবু বুঝলাম, সে সিংহলী নয়। তার নগ্ন দেহই তার প্রমাণ। তার সব কথা বোঝা আমার পক্ষে মুশকিল। কারণ, তখনও

মিথ্যাবী· তাহার সঙ্গে আমার তত পরিচয় হয় নি। তবু মধ্যমণ্ডলের ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত থাকার দরুন তার কথার ভাবার্থ বুঝতে পারলাম। তার প্রথম কথা : তোমাকে হত্যা করা হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আমার সঙ্গীদের কী হয়েছে?

—অনেকক্ষণ আগেই তারা মরে ভূত হয়ে গেছে। তাদের দেহ দূরের নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—আমাকে কেন জীবন্ত ছাড়ছ? আমাকেও মেরে ফেলো। বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

—না, তুমি আমাদের শত্রু নও। এদেশের লোকই নও তুমি। তোমাকে তাই আমরা মারব না। আমরা কোনো নিরপরাধকে মারি না।

—তাহলে আমাকে নিয়ে তোমরা কী করবে?

—কাল আমরা তোমাকে সব চেয়ে কাছের কোনো গ্রামে ছেড়ে দিয়ে আসব। তুমি ফিরে গিয়ে আমাদের শত্রুদের বলবে, আমরা তাদের মতো নীচ নই। আমরা নিরপরাধ। তবু তারা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মানুষ থেকে পশু বানায়। আমরা যদি তার প্রতিশোধও নিই তাহলে তোমাদের মতো সারা জীবন পশুর মতো অত্যাচার করে নয়। তাড়াতাড়ি চটপট।

তার কাছ থেকে আমার আরও কয়েকটা কথা জানার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার ব্যবহারে মনে হ'ল, আমার সঙ্গে সে বেশি কথা বলতে চায় না। আবার এ-ও হতে পারে যে, বেশি কথা বলার মতো ভাষা তার জানা নেই।

সে বলল : কাল সূর্যোদয়ের পর আমরা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসব।

খাবার কথাও জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম : যাবার সময় দিয়ে দিও।

সে রাত্রে বুদ্ধিলের শান্ত মুখখানা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জানি না, কখন ঘুম এসে গেল। আমি বুদ্ধিলকে দেখছিলাম। প্রসন্নবদন, মুখে হাসি। প্রথমে 'প্রমাণ সমুচ্চয়' থেকে ব্যাখ্যা করে শোনালেন। বুদ্ধিল যে জায়গাটা সরল করে বিশদভাবে বোঝাচ্ছিলেন সেই জায়গাটাই আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। কপিশা, জেতবন কিংবা মহাবিহার—এর কোনো এক জায়গায় আমরা কথা বলছিলাম। বুদ্ধিল যাত্রার কথা বললেন—আমরা আগে যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম : সিংহল থেকে এবার আমাদের যেতে হবে। এবার আমাদের দীর্ঘপথের যাত্রা। মহাচীন যাব। কিন্তু তার আগে একবার আমাদের নিজেদের জন্মভূমি দেখে যাওয়া উচিত। এবারে

থেকে আমরা দক্ষিণাপথে কয়েকটি বিহার দেখে উজ্জয়িনী যাব। কালিদাসের উজ্জয়িনী, আমার জন্মভূমি উজ্জয়িনী, আমার বড় প্রিয় উজ্জয়িনী। জন্মভূমি কার না প্রিয়? সেখান থেকে আমরা দুজনে যাব তোমার জন্মভূমি দেখতে। তারপর জম্বুদ্বীপ থেকে শেষবারের মতো বিদায় নেব। হিমবানের উত্তুঙ্গ শিখরগুলি পার হয়ে মহাচীন যেতে হবে। সমুদ্রপথে জাহাজে করে যাওয়া আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

জানি না, বুদ্ধিল কতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখন আমি গতকালের কথা সব ভুলে গিয়েছিলাম। যেন সত্যি সত্যিই জাগ্রত অবস্থায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এদিকে কখন সূর্যোদয় হয়েছে টের পাই নি। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে এসে আমায় ডেকে তুলল। আমি উঠে বসলাম। বড় একখণ্ড পোড়া মাংস, কিছু শুকনো ফল আর জলের একটা মশক ছিল পাশে। লোকটা বলল: খেয়ে নাও, এখনই যেতে হবে। পথে ক্ষিধে পেয়ে যাবে।

আমার কথামতো আমায় সে নদীর ধারে যেতে অনুমতি দিল। মাংস-খণ্ড আর জলের মশক সে-ই বয়ে নিয়ে চলল। নদীর ধারে গিয়ে আমি হাত-মুখ ধুলাম। তারপর মাংসখণ্ড খেয়ে জল খেলাম। লোকটা বলল, সে আমাকে এখানেও ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু এই ঘন জঙ্গলে পথ পাওয়া কষ্ট। তাছাড়া ভয় আছে, অন্য ব্যাধের দলের হাতে পড়তে পারি।

আমার সঙ্গে তিনজন ছিল। তার মধ্যে সেই ভূতপূর্ব দাসও ছিল। তাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল। পথ চলতে চলতে সে নিজের কথা বলছিল—

অনুরাধপুরের এক ব্রাহ্মণ আমাকে কিনেছিল। আমাকে যখন ধরেছিল তখন আমি বেশ বড়ই ছিলাম। সব কথাই আমার মনে আছে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর আমিই একমাত্র দাস ছিলাম। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। যদিও আমাকে দাসের মতো কাজ করতে হ'ত, তবু তারা আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করত। আমাকে তারা খুব ভালোভাবে রেখেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে ধমকাত, কিন্তু কখনও মারত না। আসলে তারা আমাকে দাসের মতো দেখত না, বরং এক স্বাধীন কর্মচারীর মতো দেখত। আমার ওপর তাদের খুব বিশ্বাস ছিল। আমি নগর-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তাতে আনন্দও পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার নিজের লোকদের, বিশেষ করে আমার মা'র কথা মনে পড়ত। জঙ্গলের স্বচ্ছন্দ জীবন অনুরাধপুরের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি

আকর্ষণীয় মনে হ'ত। আমি যখন যুবক হলাম তখন সে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। ব্রাহ্মণী মারা যেতে ব্রাহ্মণ ঘরদোর সব আমার ওপর ছেড়ে দিল। আমার পালিয়ে যাবার পথে কোনো বাধাই ছিল না। বহুদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে সংযত করে রেখেছিলাম। যদিও ব্রাহ্মণ আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল, তবু আমার পূর্বজীবন আমাকে টানছিল। আমার মতো রঙরূপের লোক সেখানে অনেক ছিল। আমার বেশভূষা আর কথাবার্তা থেকে কেউ বলতে পারত না, আমি ব্যাধ-দাস। ব্রাহ্মণ আমাকে এত বিশ্বাস করত যে, আমি পালিয়ে যাব এ আশঙ্কা তার মনে কখনও জাগে নি। একবার সে একটি কাজে এক সপ্তাহের জন্য আমাকে সমুদ্রতীরের পত্তনে পাঠাল। আমি সে রাস্তা ছেড়ে সোজা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। ভয় হচ্ছিল, সীমানা পার হব কী করে। আমাদের কোনো সীমানা নির্ধারিত ছিল না। উঁচুনিচু গভীর জঙ্গল আমাদের দখলে, বাকি জায়গা বস্ত্রধারীদের দখলে। আমি তখন বস্ত্রধারী। কাপড় পরে আমাদের ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে বিপদের কথা। আবার যদি বস্ত্রধারীদের নাগালের মধ্যে বস্ত্র পরিত্যাগ করি তাহলে তারা আবার আমাকে দাস করে নেবে। আমি আন্দাজ করে রাত্রিবেলায় সীমানার ধারে গিয়ে পৌঁছুলাম। অন্ধকারে সব জিনিস ফেলে দিলাম, শুধু রাখলাম আমার মালিকের বাড়ি থেকে আনা একখানা খড়্গ। দুরু দুরু বুকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলাম। হাতির ভয় ছিল, অন্য শ্বাপদ জন্তুর ভয় ছিল। আমি জানতাম না, আমার নিজের লোকেরা আমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে। আমাদের ব্যাধেদের মধ্যেও তো আলাদা আলাদা দল আছে! তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি করে। তার ভয়ও ছিল। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো। নিজের দলের লোকের সঙ্গেই পথে দেখা হয়ে গেল।…

লোকটার বয়েস এখন পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। খুব সম্ভব কুড়ি বছরও হবে না, সে তার দাস-জীবন পেছনে ফেলে এসেছে। অর্থাৎ, গত পনের বছর সিংহলী ভাষায় কথা বলার সুযোগ তার হয় নি। কিন্তু যেমন-যেমন সে কথা বলছিল তেমন-তেমন ভুলে-যাওয়া শব্দগুলি তার মনে এসে যাচ্ছিল। তার প্রভু নিষ্ঠুর ছিল না। তাই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। হয়তো এই কারণেই সে আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখাল। তার নিজের কথা সে আরও খুলে বলল।

মধ্যাহ্নের পরও দু দণ্ড কেটে গেল। লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল: আর আমি আগে এগুব না। কেননা, সামনে বজ্রধারীদের দেশ।

ছোট্ট একটা পাহাড়ের টিলায় উঠে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল: ঐ যে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী টিলা দেখছ, তার কিছু আগে একটা ফসলের ক্ষেত পাবে। তার পাশেই পাবে একটা গ্রাম।

নয়

বুদ্ধিলের মর্মান্তিক বিয়োগ আমার মনটাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেল। চারজন ভিক্ষুকে হারিয়ে আমার বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল। জনসমাজের মধ্যে ফিরে এসে আমি সব কথা বললাম। তারা কয়েকদিন শোক প্রকাশ করল। তারপর সব শান্ত হয়ে গেল—সরোবরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যেমন হয়। কিন্তু মনে আমার শান্তি কই? বর্ষা এসে গেল। বর্ষাবাসের জন্য সিংহলে থেকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, নইলে আমি পালিয়ে যেতাম নতুন কোনো জায়গায়। তিনটি মাস আমাকে বিক্ষিপ্তভাবে কাটাতে হ'ল। সব কিছুই চলল যন্ত্রের মতো। বেশির ভাগ সময় আমার কাটল মহাস্তূপ আর স্তূপারাম পরিক্রমায়। আমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষায় যেতাম। পরম বৈরাগ্যের জন্য ভিক্ষা নয়, নিমন্ত্রণ আর বিহারের ভোজন যথাশক্তি এড়িয়ে আমি ভিক্ষায় যেতাম, মনটাকে কোনো কাজে ব্যাপৃত রাখার জন্য। মনে মনে আমি কেবলই বলতাম, কবে মহা-প্রাবারণা আসবে, কবে আমি এখান থেকে চলে যাব।

দুপুর পর্যন্ত কোনো রকমে কেটে যেত, কিন্তু তার পর বিকেল আর সারা-রাত আমার কাছে পাহাড়ের মতো ভারী মনে হ'ত। চোখে আমার ঘুম আসত না। নিদ্রাদেবী সে সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছিলেন। আমি তখন সূত্র আর জাতকের পারায়ণ করতাম। আমার মানসনেত্রে তখন ভেসে উঠত বুদ্ধিলের শান্ত করুণ মূর্তি। যদি কখনও ঘুমিয়ে পড়তাম বুদ্ধিলের সঙ্গে দেখা হ'ত স্বপ্নে। এমন দিন খুবই কম গেছে, যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আমি বড় সান্ত্বনা পেতাম। মনে হ'ত, এই স্বপ্ন যদি শেষ না হয়, যদি আমার সারাটা জীবন এমন স্বপ্নেই কেটে যায় তাহলে কত ভালোই না হয়!

অনুরাধপুরে দেশ-দেশান্তর থেকে ব্যাপারীরা আসে। তাদের [illegible]

কুঠি আছে এখানে। আমি ভাবতে লাগলাম, কোন্ পথে ফিরব। আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম, বুদ্ধিলের সঙ্গে যে যাত্রার সংকল্প করেছি তা পূরণ করতেই হবে। আমার আর তাঁর জন্মভূমি দেখে সে যাত্রার পথে আমি পা বাড়াব। আগে হলে আমরা দুজনে দক্ষিণাপথের বহু জনপদ দেখতে দেখতে অবন্তী আর উদ্যানে যেতাম। কিন্তু সে সাহস এখন আর আমার নেই। আমি শুধু ভাবছিলাম, কী করে উজ্জয়িনী দেখে উদ্যানে পৌছুব, আর তারপর সেখান থেকে অজানা মানব-সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

আমার আচরণে আর ব্যবহারে শ্রদ্ধালু নরনারীরা আকৃষ্ট হ'ত, তা আগেই বলেছি। কয়েকদিন ভিক্ষাটনের সময় এবং বিহারেও লাট (গুজরাত) দেশীয় এক সার্থবাহের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমার রূপ-রঙের বিভিন্নতাও আমার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার অন্য এক কারণ ছিল। তিনি আমাকে দু-একবার আহারে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি বললাম: নিমন্ত্রণের অন্ন আমি গ্রহণ করি না।

তিনি বললেন: তাহলে ভিক্ষাটনের সময় আমার দরজায় একবার চরণধূলি দিয়ে পবিত্র করে যাবেন।

এ নিমন্ত্রণ আমি স্বীকার করলাম। শ্রেষ্ঠী ছিলেন মধ্যবয়েসী। তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে দেখে আমার কৌশাম্বীর সেই শ্রেষ্ঠী-দম্পতির কথা মনে পড়ল।

শ্রেষ্ঠী বললেন: আমি লাট দেশের ভরুকচ্ছ নগরের অধিবাসী। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই বর্ষার আগে এখান থেকে ফিরতে পারিনি। বর্ষা শেষ হলেই আমরা দেশে ফিরে যাব।

সব দেশের প্রৌঢ়া শ্রেষ্ঠীনীদের মতো এই শ্রেষ্ঠীনিও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সিংহলে ধর্মস্থানগুলি দর্শন করবার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। আমি তাদের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি বলে তাঁর মনে বড় দুঃখ ছিল। প্রতিদিন অপরাহ্ণে তিনি স্বামীর সঙ্গে আমাদের বিহারে আসতেন। সঙ্গে নিয়ে আসতেন দ্রাক্ষা কিংবা অন্য কোনো ফল। আমি তাঁর অনুরোধে তথাগতভাষিত সূত্রাবলী শোনাতাম। এতে আমার মনটাও ভালো থাকত। এমনি করে আড়াই মাস কেটে গেল। একদিন তাঁরা বললেন: আপনিও আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চলুন।

তাঁদের এ অনুরোধ রক্ষা করা মানে সারা দক্ষিণাপথ ছেড়ে সমুদ্রপথে

ভরুকচ্ছে পৌঁছুনো। কিন্তু উজ্জয়িনী যেতে হলে এর চেয়ে সহজ পথ আর হতে পারে না। তাড়াতাড়ির পথও না। তাই আমি তাঁদের অনুরোধ স্বীকার করে নিলাম।

মহাপ্রাবারণার পাঁচদিন পর আমরা অনুরাধপুর ত্যাগ করলাম। শ্রেষ্ঠী খুব বড় সার্থবাহ ছিলেন। ভরুকচ্ছ থেকে তাঁর বণিক্‌পোত সিংহল, যবদ্বীপ আর পশ্চিমের বহু দেশে যেত। উজ্জয়িনীতেও তাঁর কুঠি ছিল। তাব বৈভব কোনো রাজার চেয়ে কম ছিল না। অনুরাধপুর থেকে পশ্চিমে সমুদ্রতীর্থে তাঁর কয়েকটা বিশাল পোত দাঁড়িয়েছিল। সেখানে পৌঁছে আমাদের দিনকয়েক অপেক্ষা করতে হ'ল। কারণ, পোতগুলিতে তখনও পণ্যদ্রব্য বোঝাই করা শেষ হয়নি। যদি আমি প্রকৃতিস্থ থাকতাম তাহলে সিংহল ছেড়ে চলে যাবায় সময় আমার খুব দুঃখ হ'ত। সে দুঃখ আমার হয়নি, বরং সিংহলতট ছাড়বার পর মনের ভার আমার কিছুটা হাল্কা হ'ল। সিংহলভূমিতে বুদ্ধিলের স্মৃতি আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। কেননা, সেখানেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনকে হারিয়েছি।

সমুদ্রপথে দু' মাস কেটে গেল। শ্রেষ্ঠী সোজা ভরুকচ্ছে গেলেন না। সমুদ্রতীরে বহুপত্তনে তাঁর ব্যবসা ছিল। সেইসব জায়গায় পণ্যদ্রব্য ওঠানো আর নামানোর জন্য বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে হ'ল। শ্রেষ্ঠী নিজের ব্যবসাপত্র দেখার জন্যে খুব কমই এদিকে আসেন, তাই তাঁর কর্মচারীরা এখন সমস্ত কাজকর্ম তাঁকে দেখাতে ও বোঝাতে লাগল। আমাকেও শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে নামতে হ'ল। ঐ সব জায়গায় কোনো যোগ্য ভিক্ষু থাকলে নিশ্চয়ই আমি তাঁকে দেখতে যেতাম। দু-চারদিনের মধ্যেই সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠল। আমার ওপর তার প্রভাব পড়ল—কয়েকদিন আমি খেতে পারলাম না।

তালপাতার পুঁথি দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু আমাদের উদ্যানে ভূর্জপত্রেই পুঁথি লেখার প্রথা ছিল। গরম দেশে ভূর্জপত্র বেশি দিন থাকে না, তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। তালপাতা সব জায়গায়ই শক্ত থাকে। বোঝা বাড়াব না বলে আমি আর বুদ্ধিল অল্প কয়েকখানা বই সঙ্গে রেখেছিলাম। এখন বুদ্ধিলের বইগুলিও আমার কাছে। সিংহলে ভালো তালপাতা পাওয়া যায়। সিংহলে এসে বুদ্ধিল তাঁর নিজের জন্য তালপাতায় দিঙ্নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়' লিখে নিয়েছিলেন। যেখানে সেখানে টিপ্পনীও লিখেছিলেন। বুদ্ধিলের হাতের লেখা ভারি সুন্দর

ছিল। বুদ্ধিলের সেই পুঁথি আজ চল্লিশ বছর ধরে আমি সর্বদা আমার কাছে রেখেছি—রেখেছি আমার প্রাণের চেয়েও যত্ন করে। আগে যখন তাঁর লেখা পংক্তিগুলি দেখতাম, আমার দু' চোখ ভরে জল আসত। আজও সেই পংক্তিগুলি দেখে মনে আমি সান্ত্বনা পাই।

শীতের মাঝামাঝি আমরা ভরুকচ্ছ এসে পৌঁছুলাম। সম্ভবত দু-একটা শীতের বেশি আমরা এমন দেশে থাকিনি, যেখানে শীত পড়েই না। তবু ভরুকচ্ছে যখন রাত্রে কম্বল গায়ে দিতে হ'ল তখন মন আমার আনন্দে ভরে উঠল—যেন আমার হারানো নিধি ফিরে পেয়েছি। ভরুকচ্ছে আমি উঠেছি শ্রেষ্ঠীর পূর্বপুরুষের তৈরি এক বিহারে। শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে বিহারের ভিক্ষু প্রভাবিত হয়ে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে, আমি এখানে কিছুদিন থাকি। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আমাকে যে এখন দড়ি বেঁধে সামনের দিকে টানছে। স্থল-সার্থরা এখান থেকে বরাবর উজ্জয়িনী যাওয়া-আসা করেন। তাঁদের সঙ্গেই শ্রেষ্ঠী আমাকে উজ্জয়িনী পাঠিয়ে দিলেন।

ভরুকচ্ছ আর উজ্জয়িনীর পুরনো বৈভব এখন আর তত নেই, যেমন ছিল ক্ষত্রপদের রাজধানী থাকা সময়ে। আজ যদি আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর জন্মনগরী উজ্জয়িনীতে আসতাম তাহলে কালিদাসের এই প্রিয়ভূমি দর্শন করে কত আনন্দই না পেতাম। বুদ্ধিলের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা মানে তাঁদের দুঃখ দেওয়া আর আমার পুরনো ঘা-টাকে খুঁচিয়ে তোলা। আর কিছু না। তবু আমি তাঁর আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে দেখা না করে উজ্জয়িনী থেকে চলে যাওয়া ভদ্রোচিত মনে করলাম না। বুদ্ধিলের জন্মগৃহে গিয়ে যখন আমি শুনলাম, তাঁর মা জীবিত আছেন, তখন আমার পা যেন পেছনে সরতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে বুদ্ধিলের ছোট ভাইকে আমার কিছু কিছু বলা হয়ে গেছে। দু-চোখ দিয়ে তার অঝোরে অশ্রু ঝরছে। আমার চোখেও জল ছলছল করে উঠল। বুদ্ধিলের মা প্রথম যখন শুনলেন, আমি তাঁর ভাগ্যবান্ পুত্রের অভাগা বন্ধু, তখন তিনি খুব খুশি হলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য মনে হ'ল, তিনি বুঝি বুদ্ধিলের অনুগমন করেছেন। যাই হোক, একটু পরে তিনি উঠে চোখের জল মুছলেন। ভেতরটা তাঁর ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে প্রকৃতিস্থ। তিনি বললেন: তুমিই আমার বুদ্ধিল। আমি তোমাকেই আমার বুদ্ধিল মনে করি। বুদ্ধিলকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানী

আর সাহসী করে তৈরি করেছিলাম। দশ বছর বয়েস হলে আমি নিজে তাকে সঙ্গে করে কাঞ্চনবন বিহারে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষুসংঘে অর্পণ করেছিলাম। ভিক্ষু-উপসম্পদা পাবার কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত সে এখানেই ছিল। তার বিদ্যা আর বুদ্ধির প্রশংসা শুনে মনে আমার আনন্দ ধরত না। সে যখন দেশদেশান্তরের শোনা কথাগুলি আমাকে উৎসাহের সঙ্গে শোনাত তখনই আমি জানতাম, আমার ছেলেও সেইসব দেশে যাবে। তার দেশভ্রমণে আমি রাজী হয়েছিলাম —যদিও জানতাম, পথে কোথাও বিপদ হতে পারে!

বুদ্ধিলের মৃত্যুতে বৃদ্ধার বুকে যে শেল বিঁধেছে, সারা জীবনেও হয়তো তা বার হবে না। কিন্তু যতদিন আমি উজ্জয়িনীতে ছিলাম, কখনও তিনি আমার সামনে শোক প্রকাশ করেননি। আমার প্রতি তিনি পুত্র-বাৎসল্য দেখাতেও কার্পণ্য করেননি। তিনি বলতেন: আমরা শকেরা উত্তরাপথের দিকে কোনো এর দূর দেশ থেকে এসেছি। আমাদের মধ্যে যারা কম ভাগ্যবান্ তারা সে কথা ভুলে গেছে। ভুলবে না-ই বা কেন? বিশ পুরুষ ধরে এই দেশে বাস করে সে কথা তারা মনে রাখবে কী করে? আমাদের বংশ ক্ষত্রপ-পুরোহিতদের বংশ। আমরাও রাজসিক ঐশ্বর্য ভোগ করার গর্ব করি, গর্ব করি আমাদের বংশের। আমার বড ইচ্ছা ছিল, বুদ্ধিল একবাব আমার শকদের ভূমি দেখে আসে।

আমি তাঁকে বলেছিলাম: বুদ্ধিল শকভূমির কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়েছিলেন; আমাদের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব না হ'ত তাহলে হয়তো তিনি কপিশা থেকে সেখানেই যেতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় আবার তিনি আমার সঙ্গে তার বহু-দেখা দেশে গেলেন। শকভূমিতে যাবার সঙ্কল্প আমরা করেছিলাম। আজ বুদ্ধিল নেই, তাঁর সঙ্কল্প আমি পূরণ করব।

আমি আবার মধ্যমণ্ডলে এলাম। এখানকার গ্রাম, নগর, কথাবার্তা, রীতিনীতি সবই আমার সুপরিচিত। সবাইকে আমার আত্মীয় মনে হ'ল। মৌখরীদের সীমানার ভেতরে পৌঁছুনোর পর আরও সুব্যবস্থা আর শান্তি দেখতে পেলাম। কোথাও গ্রাম, নিগম আর নগর; কোথাও বিহার। একা যেতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। পথে ভিক্ষুযাত্রী পেয়ে গেলাম। বসন্তের আরম্ভ পর্যন্ত রোদ্দুরের জন্ম তত কষ্ট হয়নি। কিন্তু তারপর সকাল-সন্ধ্যায় ছাড়া পথ চলা যেত না। বিদিশায় চৈত্যগিরি আর তথাগতর অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র আর মৌদ্গল্যায়নের ধাতুর ওপর তৈরি চৈত্য দুটি দর্শন করা আবশ্যক

ছিল। সেখানে আমি পাঁচ রাত্রি ছিলাম। চৈত্যের সুন্দর সুন্দর তোরণ আর তার ওপরকার মূর্তিগুলি দেখে আবার আমার বুদ্ধিলের কথা মনে হতে লাগল। কৌশাম্বীর সেই শ্রেষ্ঠীর সামনে এ রকম বেশভূষার মাটির মূর্তি তৈরি করে তিনি বলেছিলেন: একই দেশে একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কোনদিন তথাগতর প্রতিমা গড়া হ'ত না, বোধিবৃক্ষ আর চৈত্যকে প্রতীক করেই তাঁর পূজো হত।

বিদিশা থেকে আমি গোপগিরি হয়ে মথুরার দিকে অগ্রসর হলাম। ঠিক করেছিলাম, মথুরাতেই বর্ষাবাস করব, কিন্তু বর্ষার দু' মাস আগেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। তখন ভীষণ গরম। এতদিন পথ চলার জন্য কিছুটা পরিশ্রান্ত ছিলাম। তার চেয়েও বড় কথা, মনে খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছি। তাই আমি সেখানেই বর্ষাবাস করব স্থির করলাম। মথুরাও শকদের রাজধানী ছিল। আমার কিছুটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শক আর আমাদের উদ্যানবাসী খস একই জাতিভুক্ত। শকদের পুরনো জায়গাগুলি আর তাদের বংশধরদের দেখে এক ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করলাম। তথাগতর প্রতি তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তার পরিচয় বহন করছে কপিশা, নগরহার, তক্ষশিলা, কাশ্মীর, ভরুকচ্ছ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি জায়গায় তাদের তৈরি বিহার আর স্তূপগুলি। মথুরায় তাদের রাজত্বকাল শেষ হয়েছে দেড় শ' বছরের অনেক আগে। কিন্তু এখনও সেখানে কণিষ্ক আর তাঁর উত্তরাধিকারীদেব তৈরি বিহাব বর্তমান আছে এবং ভালো অবস্থায় আছে। তবে শক-প্রাসাদগুলি ভালো অবস্থায় নেই। মথুরার রাজ্যলক্ষ্মী হরণ করে কান্যকুব্জ সমৃদ্ধ হয়েছে। কান্যকুব্জে রাজধানী স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত মথুরার অবস্থা তত খারাপ ছিল না। কণিষ্ক, কদফিস প্রভৃতি শক রাজাদের সুন্দর সুন্দর মূর্তি দেখে আমার মনে হ'ল, যেখান থেকে হেফ্তালরা এসেছিল সেখান থেকেই তাঁরা এসেছিলেন। তুষার আর তার উত্তর থেকে যারা এসেছিল তাদের আমি আমার জন্মভূমি আর কপিশায় দেখেছিলাম। তাদের বেশভূষা অনেকটা একই রকম। উত্তর-দেশের লোকেদের মতো এইসব শক রাজার মূর্তিগুলিতেও হাঁটু পর্যন্ত জুতো ছিল।

বহুদিন থেকে আমি উরুমুণ্ড পর্বতের মহিমা আর পুণ্যের কথা শুনে আসছিলাম। যে সর্বাস্তিবাদ নিকায় আমাকে ভিক্ষু বানিয়েছিল, একসময় তাদের কেন্দ্রস্থান ছিল এই ছোট্ট পর্বতটি। আজও সেখানে আর্য সর্বাস্তিবাদ নিকায়ের ভিক্ষুদের পুরনো বিহার আছে। আমি সেখানে বর্ষাবাস করলাম।

সেখানে সর্বাস্তিবাদের জ্যেষ্ঠ স্থবির শাণবাসের শণের তৈরি এক চীবর রক্ষিত আছে। শাণবাস মহাস্থবির বড় সরল আর অকিঞ্চন ভাবে জীবন যাপন করতেন। তাই তিনি কাপাস তুলোর সূক্ষ্ম বসন ব্যবহার না করে শণের তৈরি রুক্ষ বসন ব্যবহার করতেন। শাণবাস স্থবির কেবল সর্বাস্তিবাদীদেরই পূজ্য পিতামহ ছিলেন না, সিংহলের মহাবিহার আর অন্য সকল স্থবির নিকায় তাঁকে পরম গুরু বলে মানতেন। উরুমুণ্ড পর্বতের চারধারে বহুদূর পর্যন্ত জঙ্গল চলে গেছে। শক-শাসনের অবসানের পর জঙ্গল আরও বেড়েছে। সেখানে আছে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু। আজও এই গভীর জঙ্গলে বিধ্বস্ত গ্রাম আর ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তুলাদণ্ডের একদিকে ভার বেশি হলে অন্যদিক যেমন উঠে যায় তেমনি ওঠা-নামা করে দেশ, গ্রাম আর জাতির ভাগ্য।

বুদ্ধিলকে হারানোর পর এই আমার দ্বিতীয় বর্ষাবাস। অবশ্য এর মধ্যে মন আমার অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে, কিন্তু তবু কোনো কাজে পুরো মন বসে না। ভদন্ত উপগুপ্তর জন্য নট আর বট দুই উপাসক উরুমুণ্ড পর্বতের ধারে এই নট-বট বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। আজ সেখানে তিনশ'রও বেশি ভিক্ষু বর্ষাবাস করছেন। আমার পাশের ঘরে ছিলেন এক চীনা ভিক্ষু। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কতদিন আমরা একসঙ্গে এখানে-সেখানে বেড়াতে গিয়েছি? তাঁরই জন্যে আমার চীন যাবার ইচ্ছা আরও বেড়ে গেল। এখানকার নগরে আর নিগমে কোনো চণ্ডাল এলে তার হাতে থাকত একটা লাঠি। কাউকে কাছে দেখলে মাটিতে লাঠি ঠুকে ঠুকে শব্দ করত, যাতে তার ছায়ার ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে সরে যেতে পারে। চণ্ডালের স্পর্শেই শুধু নয়, তার ছায়াতেও মানুষ অপবিত্র হয়। চীনা ভিক্ষু একদিন কথাটা পাড়লেন। আমার তখন চেতনা হ'ল। সত্যিই তো, মানুষকে এতটা নীচ মনে করা কি ঠিক? তারা আমাদের মতো ভিক্ষুকে দেখেও লাঠি ঠুকে ঠুকে শব্দ করত। কিন্তু আমরা শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু শাক্যমুনির সন্তান। শাক্যমুনি চণ্ডাল আর ব্রাহ্মণকে সমান চোখে দেখতেন। জন্ম থেকে মানুষ মাত্রই সমান—এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়, তিনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালদেরও। সমানভাবে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী করেছেন। নট-বট বিহার আর অন্য সব বিহারে যে সব চণ্ডাল ভিক্ষু ছিলেন, সংঘে তাঁদেরও সমান অধিকার ছিল। এতে চীনা ভিক্ষু খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেখানে রঙের ভেদ ছিল না, জাতিভেদও না। কিন্তু শুধু এতেই চীনা ভিক্ষু সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলতেন: আমাদের এই ভিক্ষুসংঘ তো সমুদ্রের মধ্যে একটি মাত্র বিন্দু।

সেই একটি বিন্দুতে সাম্য থাকলে কী হবে? বাইরে তো চণ্ডাল চণ্ডালই। আমাদের দেশে কিন্তু এমন দেখা যায় না। সেখানে গরিব আছে, ধনী আছে, উচ্চ কুলীন আর নিম্ন কুলীনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু কারও স্পর্শে বা ছায়ায় কেউ অপবিত্র হয় না।

সত্যিই ভাববার মতো কথা। তথাগতর উপদেশের বীজ পড়েছে এক হাজার বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আজও তাঁর জন্মভূমি থেকে জাতিভেদ দূর হ'ল না! আমি যখন ভাবতাম, মনে হ'ত এই ভেদভাব হয়তো কোনোদিনই দূর হবে না। তবে কি তথাগতর চেষ্টা বিফলে যাবে? ভাবতে আমার কষ্ট হ'ত। আমি ভাবতাম, এর কী কারণ থাকতে পারে। আমাদের উত্থানেও তো এমন দেখা যায় না। সেখানে বহু জাতি আছে, তাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র আছে, কুলীন-অকুলীনও আছে। কিন্তু এমন ব্যবহার তো কেউ কারও সঙ্গে করে না। প্রায় সব চণ্ডালই দেখতে কালো, তাই বলে কি তাদের পশুতুল্য ভাবতে হবে? আমি যদি মধ্যমণ্ডলের কোথাও থাকতাম তাহলে এই জাতিভেদ প্রথা দূর করাকেই আমার জীবনের পরম উদ্দেশ্য করে নিতাম। আমি জানি, দু-একজনের চেষ্টায় কিছু হতে পাবে না। কিন্তু যাকে অন্যায় বলে জেনেছি তার প্রতিকার তো করতে হবে!

যমুনা থেকে পশ্চিমে অল্প দূরে উরুমুণ্ড পর্বতে বর্ষাবাস করার সময় কতবার আমার মনে হয়েছে, আর হয়তো বুদ্ধভূমি দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হবে না। গঙ্গা-যমুনার নাম শুনে এ জায়গার কথা বারবার মনে পড়বে। তথাগত এ জায়গা পবিত্র করেছেন। গত হাজার বছর ধরে চারদিক থেকে কত লোকই না আসছে এই পুণ্যভূমি দর্শন করার জন্য। আবার যদি কখনও আমার আসার সুযোগ হয় তাহলে বুদ্ধিলের স্মৃতি তেমনই দুঃখজনক হবে।

মহাপ্রাবারণার পর আমি উরুমুণ্ড থেকে অন্য ভিক্ষুদের সঙ্গে গেলাম মথুরা। সেখানে অশোকের তৈরি তিনটি স্তূপেরই পুজো করলাম। পুষ্পবনে যেখানে তথাগত ছিলেন, সেখানেও পুষ্পার্ঘ দিলাম। তারপর সেখান থেকে উত্তরাভিমুখে চলতে শুরু করলাম। যমুনা চলেছে আমার দক্ষিণে। মাঠ শস্যে সবুজ, গ্রাম সমৃদ্ধিতে ভরপুর। পথে সঙ্গী পেয়েই যেতাম, কিন্তু কাউকে আমি স্থায়ী সঙ্গী করতাম না। এখনও আমার বুকে বন্ধুর বিয়োগব্যথা বাজে। এখনও আমার অন্যের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নিজের ভাবেই ডুবে থাকতে ভালো লাগে।

মথুরা থেকে দু-তিন দিন পর যৌধেয় ভূমি (হরিয়ানা)-য় প্রবেশ করলাম।

সেখানে লোকমুখে শুনতে পেলাম যৌধেয় বীরদের কথা। যখন শুনলাম, আজ থেকে দেড় শ বছর আগে যৌধেয়দের এক শক্তিশালী গণরাজ্য ছিল, সমুদ্রগুপ্ত আর চন্দ্রগুপ্ত সেই গণরাজ্যকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিলেন তখন আমার কপিলাবস্তু আর বৈশালীর কথা মনে পড়তে লাগল। আজ গুপ্ত সম্রাটদের প্রতাপসূর্য অস্তাচলগামী, কিন্তু যৌধেয়দের বিনাশ করবার সময় সমুদ্রগুপ্ত আর চন্দ্রগুপ্ত কি একবারও ভেবেছিলেন যে, তাঁদেরও একদিন বিনষ্ট হতে হবে?

পথে যমুনার তীরে পেলাম ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রাম। 'প্রস্থ' নামের কত গ্রামই না আছে এ দেশে। তার কয়েকটির মধ্য দিয়ে যেতে হ'ল আমাদের। ইন্দ্রপ্রস্থ এক সময় পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। সে সময় হয়তো নগর ছিল, কিন্তু আজ একটা বড় গ্রাম ছাড়া কিছু নয়। যৌধেয়রা তার কোনো গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু পূর্বপ্রান্ত থেকে যখনই তাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে তখনই এই ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের শিবির স্থাপিত হয়েছে। এখন যৌধেয়ভূমির সব চেয়ে বড় নগর স্থান্বীশ্বর (থানেশ্বর)। স্থান্বীশ্বরের রাজা নিজেকে মৌখরীদের সমকক্ষ মনে করেন। সরস্বতীর তীরে অবস্থিত এই বিশাল নগরের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে গুপ্তসাম্রাজ্যের শক্তিহ্রাসের পর থেকে। গণব্যবস্থা হারিয়েও যৌধেয়রা আজও যুদ্ধবীর রয়েছে। পথের মাঝে তারা যদি না থাকত তাহলে হূণদের দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবার পথে কেউ বাধা দিতে পারত না। স্থান্বীশ্বরের পাশেই কুরুদেব ধর্মক্ষেত্র—যেখানে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হয়েছিল। কৌরব আর পাণ্ডবদের কথা তো এখন কেবল গল্পেই শোনা যায়, স্থান্বীশ্বরের রাজাদের হয়তো তাদের কথা মনেই পড়ে না।

স্থান্বীশ্বরের সরস্বতী উপত্যকা হ'ল মধ্যমণ্ডলের সীমা। তার পশ্চিমে উত্তরাপথের মধ্য দিয়ে এখন আমরা চলেছি। আগেও আমরা এখান দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার স্থান্বীশ্বর থেকে শ্রুঘ্ন পৌঁছে পুরনো পথ ধরে অন্য পথে বহু দিন হেঁটে তিনটি বড় নদী আর বহু ছোট ছোট নদী পার হয়ে চন্দ্রভাগার তীরে শাকলা এসে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে ধরলাম পুরনো পথ। সেটা ছিল শীতের মাঝামাঝি। কত বছর পরে আবার আমরা হিমবান্ সাগরে প্রবেশ করলাম। কাশ্মীর নগরীতে কয়েক দিন অবস্থান করতে হ'ল। কারণ, উদ্যানের দিকে যাবার পথ-ঘাট এখন হিমপাতের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে!

বসন্তকালে কাশ্মীর উপত্যকা পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়, সুপ্ত প্রকৃতি আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে হেসে ওঠে। হিমাচ্ছাদিত পথঘাটগুলি খুলতে তখনও দেরি

ছিল। কিন্তু আমি তো হিমভূমির সন্তান। আমার জন্মভূমি হলে এমন ঘাট পার হতে আমি পিছ-পা হতাম না।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পথ খোলার অপেক্ষা করছিলাম। আমি যাচ্ছিলাম আমার জন্মভূমির কাছে। জীবনের সব চেয়ে বড় আর শেষ যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। হিমবানের উত্তরের দেশের কোনো ভিক্ষু কিংবা অন্য কাউকে পেলে তার কাছ থেকে আমি তার দেশের কথা জানার চেষ্টা করতাম। কাশ্মীরের বিহারে কাংস্যদেশ, কূচা আর অন্য বহু দেশের ভিক্ষু পড়তে আসেন। তাঁদের কাছ থেকে আমি কাংস্যদেশ সম্পর্কে কত কথাই না জানতে পেলাম! তাঁরা তাঁদের উত্তরের রক্তপিপাসু জাতিদের সম্পর্কে শোনা অনেক কথাই বললেন। তাদের নিষ্ঠুরতাব কথা বললেন। এসব শুনে কেউ সে দেশে যেতে চাইলে না। কিন্তু যেখানে বিপদ সেখানে যাওয়াতেই তো আমার আনন্দ। এখন পর্যন্ত অবশ্য কোনো যাত্রায় আমি একা ছিলাম না। বেশ কয়েক বছব ছিলাম বুদ্ধিলের ছায়ায় ছায়ায়। তারপর যেখানে-সেখানে যখন তখন পথে সঙ্গী পেয়েই যেতাম। এবার সব শুনে ঠিক করেছিলাম, ভবিষ্যতের যাত্রাপথে কয়েকজন স্থায়ী সঙ্গী নেব। আমি যখন প্রথম আমার জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম তখন আমি নবতরুণ। আমার বাল্যকাল তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এখন দেশ পর্যটন আব বুদ্ধিলের বিয়োগ আমাকে অকালে প্রৌঢ় করেছে। অবশ্য আমার রূপে রঙে তার কোনো প্রভাব পড়েনি, শুধু কথাবার্তায় আর আচার-আচরণে আমি প্রৌঢ়। এতে অবশ্য আমার লাভই হয়েছে। আমার কথার দাম এখন অনেক বেড়ে গেছে।

আমি আগে থেকেই ভাবছিলাম, সিন্ধুনদের দিকে যাবে এমন কোনো সার্থ পেলে খুব সুবিধে হ'ত। হঠাৎ এক কাশ্মীরী শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। আর তার থেকেই কম্বোজযাত্রী এক সার্থের খোঁজ পেয়ে গেলাম। আমার জন্মভূমির পাশেই ছিল কম্বোজদেশ। এ যাত্রার আগে আমি জানতাম না যে, পূর্বদিকেও আর এক কম্বোজদেশ আছে। এখন জেনেছি, সেখানে কেবল আর—একটি কম্বোজদেশই নয়, অন্য একটা গান্ধারদেশও আছে। আসলে মানুষ তার জন্মভূমি থেকে দূরে গিয়ে সেখানকার নদনদী পাহাড়পর্বত আর গ্রামজনপদের নাম নিজেদের জন্মস্থানের নাম অনুসারেই রাখে।

সার্থবাহকে আমার মনের মতোই পেলাম। তবে সে একটু খিটখিটে মেজাজের লোক ছিল। শ্বেতচূর্ণদের জন্য সে তার নিজের দেশ ছেড়ে কাশ্মীরে

ব্যবসা শুরু করেছিল। এখন সে এখানকার একজন মস্ত বড় সার্থবাহ। সীমান্ত অঞ্চলে এখন ক্রূর যাযাবরেরা আক্রমণ করেছে। কিন্তু তবু সেখানে যাবার মতো সাহস এই সার্থবাহের আছে।

আমরা কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুদিন পর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁছুলাম। এই আমার শেষ সিন্ধুদর্শন। এই সেই সিন্ধু, যার নাম অনুসারে পশ্চিমের দেশগুলি আমাদের দেশের নতুন নাম দিয়েছে। পারসীকেরা আমাদের দেশকে বলেছে হিন্দু (সিন্ধু) দেশ; আর তাদের কাছে শুনে মহাচীনের লোকেরা বলেছে ইন্দু।

দশ

সাত বছর তীর্থযাত্রা করে উনতিরিশ বছর বয়সে আবার আমি উদ্যানভূমিতে ফিরে এলাম। এতদিন আমি ভারত আর সিংহলভূমিতে শুধু পর্যটনই করি নি, যেখানে গিয়েছি সেখানেই পড়াশোনা করেছি। উদ্যানে হীনযানের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ভারত আর ভারতের বাইরে যেভাবে মহাযানের ঢেউ এসে লেগেছে তার ছোঁয়া থেকে উদ্যান নিজেকে বাঁচাবে কী করে? আমার ওপরই তো মহাযানের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। আমি প্রথমে পাহাড়ীঘাট আর পরে সুবাস্তনদী পার হয়ে যে জায়গায় পৌঁছুলাম সেখানে আমাদের গ্রামবাসীরা শীত কাটিয়ে থাকে। গ্রামের পুরনো বন্ধুরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, সেখানে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করল। শীতের মাঝামাঝি হলেও সুভূমি বিহারের পথ তখন বন্ধ ছিল না, কিন্তু তবু আমি রয়ে গেলাম। জ্ঞাতি-বন্ধুদের কথা এড়াতে পারলাম না।

সাত বছর ধরে আমি গরম দেশে ঘুরেছি। তার প্রভাব পড়েছে আমার রূপ-রঙের ওপর। তথাগতর পবিত্র ধাতুগুলি আর তার চরণধূলির স্পর্শে পুণ্য স্থানগুলি দর্শন করে নিজেকে আমি কৃতার্থ মনে করেছি। কিন্তু তবু উদ্যানকেই আমার ভালো লাগল—ঠিক যেন মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। সাত বছর এমন কিছু বেশি দিন নয়। কিন্তু এরই মধ্যে কত পরিচিত মানুষ চলে গেছে। এখনও অবশ্য যেথাদের শাসন চলছে। এক বছর আগে রাজা মিহিরকুল মারা গেছে। আগে যেখানে মিহিরকুলের শাসন ছিল সেখানে আমি তার নিষ্ঠুরতার কথা শুনেছি, কিন্তু উদ্যানে তার এক কামুকবৃত্তি ছাড়া আর কিছু

দেখিনি। কামুকতা তো রাজা আর সামন্তদের মধ্যে কমবেশি সব জায়গাতেই থাকে। মিহিরকুলের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রার কথাও এসে পড়ে। কিন্তু সে এখন আমার কাছে এক অপরিচিতা নারীর মতো।

দেশে ফিরে কী করব, সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ ভাবিনি। কিন্তু বিহারে যাবার কথা ঠিক করেছিলাম। আমার গ্রামবাসীদের ইচ্ছা ছিল, আমি পয়ারে তাদের ঘরে বর্ষাটা কাটাই। শৈশবের সেই পয়ার আজ আমার কাছে বড় আকর্ষণীয়।

একটা একটা করে শীতের দিনগুলো কেটে যেতে দেরি হ'ল না। উত্তানীরা সরে ফেরার তোড়জোড় করতে লাগল। আমাদের গ্রামের লোকেরা চলল সুবাস্তুনদীর ধারে। পথে আশেপাশের কয়েকটি পবিত্রস্থান আবার দর্শন করলাম। মহাবন বিহার দর্শনের জন্য দুদিনের পথ পাড়ি দিতে হ'ল। ঘুরতে ঘুরতে বর্ষারম্ভের এক মাস আগে স্বভূমি এসে পৌছুলাম। এখানে এসে শুনলাম, এই শীতে মহাস্থবির গুণবর্ধন এবং আমার গুরু তথা কাকা ভদন্ত জিনবর্মা দেহত্যাগ করেছেন। বিহারের নতুন নায়ক স্থবির শীলবন্ধ আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করলেন। তবু আমি বর্ষোপনায়িকার আগেই পয়ারে আমার গ্রামবাসীদের শিবিরে চলে এলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ধর্মযশ আর তিনজন ভিক্ষু। এত বছর গরম দেশে থেকে তিনমাসের পয়ারবাস আমার কাছে স্বর্গবাসের মতো মনে হ'ল।

গৃহস্থরা ভিক্ষুদের দেবতার সম্মান দেয়। তারা আশা করে, দৈববলে ভিক্ষুরা তাদের দুঃখকষ্ট দূর করে দেবেন। লোকের এই যে ভাবনা, সব জায়গাতেই প্রায় একই রকম। দুঃখকষ্ট কোথায় নেই? আসলে সুখ তো দুঃখের অনন্ত সাগরে ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো কখনও-সখনও দেখা যায়।

মানুষকে মেরে রেখেছে তার দুর্বলতা। তাই তাকে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে হয়, যাতে তার রুচি নেই। গৃহস্থরা আমার কাছে আসত রোগমুক্তির জন্য। চিকিৎসায় আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তার ওপর আমার বিশ্বাসও ছিল পুরো মাত্রায়। তাই তাতে অসুবিধে হ'ত না। কিন্তু যখন তারা বাধা দূর করার জন্য আমাকে মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করতে বলত তখনই হ'ত অসুবিধে। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর আমার আস্থা ছিল না, তবু আমি তাদের অসহায় অবস্থা দেখে 'না' বলতে পারতাম না। সে বড় নিষ্ঠুরতা বলে মনে হ'ত। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল, তাতে তারা মনে সান্ত্বনা পেত। তাই

আমি আমার যাত্রাপথে মগধ আর অন্যান্য জায়গার প্রসিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদের কাছ থেকে কিছু কিছু মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম। আগে এইসব মন্ত্র প্রয়োগ করতে মনে বড় সঙ্কোচ হ'ত, কিন্তু এখন আর হয় না।

আমরা পাঁচ ভিক্ষু তিনমাস বর্ষাবাসের জন্য পয়ারে রয়ে গেলাম। পয়ার-প্রবাসীরা রোজ সন্ধ্যায় একত্র হ'ত। আমাকে তখন উপদেশ দিতে হ'ত। আমার যাত্রাপথে উপদেশের যে রীতি দেখেছিলাম তার সঙ্গে আমাদের উদ্যানেব পুরনো রীতির কিছুটা পার্থক্য আছে। এবং সেটা থাকবেই। কারণ, মহাযানের ঢেউ এসে উদ্যানভূমিতেও আঘাত করেছে। তথাগতর মানবোচিত চরিত্রেব চেয়ে বোধিসত্ত্বের আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলোই লোকের বেশি প্রিয়। আমি একথা বলি না যে, তথাগতর মানবোচিত চরিত্র আমার প্রিয় ছিল না, কিন্তু কেবল নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা, অর্হৎ হয়ে সংসার ত্যাগ করা—এ আমার কাছে ভালো মনে হ'ত না। অবদানের গল্প আমার ভালো লাগত। মানুষ তার নিজের সুখ আর মুক্তির জন্য জীবন ধারণ না করে অন্যের হিতেব জন্য নিজের হিত ভুলে যাবে—এই হবে মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। আমার দীর্ঘ যাত্রাপথে আমি নালন্দার মতো বড় বড় বিহারে থেকেছি, যে সব বিহারের পণ্ডিতদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র স্বীকৃত। কত ধ্যাননিষ্ঠ ভিক্ষুর পাহাড়ের গুহায় গিয়েছি আমি। সব জায়গায় সেই একই কথা শুনেছি, বোধিসত্ত্বের পথই একমাত্র মহান পথ—মহাযান। কেবল নিজের মুক্তির উপায় সন্ধান করা হ'ল হীনযান। এ বিষয়ে আমি বহু গ্রন্থ পড়েছি, বহু বাগ্মীর উপদেশ শুনেছি। দেখেছি, মহাযানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমারও ধারণা হয়েছে, মহাযানই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।

এই বর্ষাবাসে পয়ারে আমি যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাতে বোধিসত্ত্ব আর তাঁব পথ নির্দেশের কথাই ছিল বেশি। কিন্তু উদ্যানের অবস্থান দেখে আমি বলি নি উপাসক আর উপাসিকাদের মাংস ভক্ষণ সর্বদা পরিত্যাজ্য।

উপদেশ ছাড়া পয়ারে প্রতিটি রোগীর চিকিৎসাব ভার ছিল আমার ওপর। সব চেয়ে অপ্রিয় কাজ ছিল, ভূত প্রেত তাড়ানো আর মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করা। যাদের এতে বিশ্বাস আছে তারা তর্ক আর যুক্তি মানে না। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিংবা দিনের পর দিন যুক্তিতর্কের আসর না বসিয়ে কয়েকটা মন্ত্র জপ করাই ছিল ভালো। কাজ হ'ল তো খুব ভালো আর না হ'ল তো কেউ কিছু বলবে না।

আমার এখন পূর্ণ যৌবন। সারা শীতকাল উদ্যানে আর কিছুকাল পয়ারে

থাকার ফলে আমার রূপ, রঙ আর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। আমাদের উদ্যানে ভিক্ষু থেকে আবার গৃহস্থ হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। ভিক্ষুজীবনের ভিক্ষা আর পড়াশোনা গৃহস্থ জীবনে তত কাজে লাগে না ঠিক, কিন্তু ভিক্ষু থেকে যাঁরা আবার গৃহস্থ হন তাঁদের মূল্য বেড়ে যায়। সে তাঁদের শিক্ষার জন্যে। উদ্যানের সুন্দরীরা তরুণ ভিক্ষুদের আকর্ষণ করায় এক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে। শিকারী যেমন শিকার পেলে খুশি হয়, সুন্দরীরা তেমনি খুশি হয় তাদের উদ্দেশ্য সফল হলে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল আমার চেয়ে বড়—বয়স আর উপসম্পদা দু-দিক থেকেই। কিন্তু আমার বিদ্যা আর অভিজ্ঞতার জন্য আমাকেই প্রধান বলে গণ্য করা হ'ত। এক শককুমারীর প্রেমপাশের বন্ধন থেকে আমি সামান্যর জন্য বেঁচে গেলাম। কাষায় বস্ত্র প্রেমফাঁদের হাত থেকে রক্ষা পাবার পক্ষে বড় সহায়ক। অঙ্গে ধারণ করলে গৃহস্থ, বিশেষ করে নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। নৃত্যগীত বর্জিত হয়, সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া নিষিদ্ধ হয়, একান্তে সেবাও হয় অসম্ভব। কিন্তু এতই যদি অসম্ভব তাহলে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে কী করে?

আমাদের গ্রামের লোকেদের শিবিরের পাশেই ছিল যেথাদের একটি শিবির। যেথাদের প্রায় সবাই ছিল যাযাবর। শক আর খসদের মতো তখনও তাদের কোনো স্থায়ী গ্রাম ছিল না। তবু তারা আচারে-ব্যবহারে শিক্ষায়-দীক্ষায় অন্য সবার মতো এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে তখন তথাগতর ধর্মের প্রচার ছিল। উদ্যানের মতো তথাগতর একান্ত ভক্তের দেশে তারা তখন আমাদেরই মতো হয়ে গেছে। কাশ্মীরে আমি দেখেছি যেথা-সর্দারদের সূর্য আর মহেশ্বরের পূজো করতে, গোপগিরিতে দেখেছি মিহিরকুলের পিতা তোরমাণের তৈরি পাথরের সূর্যমন্দির।

আমাদের পাশের শিবিরে এক যেথাকুমারী বহুদিন থেকে ভূত-পীড়িত ছিল। কয়েক জায়গায় আমার মন্ত্রতন্ত্রের সাফল্য দেখে তার বাড়ির লোকেরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। যেথাকুমারীর বয়স আঠারোর বেশি ছিল না। ভূতে পাবার জন্য তাকে কৃশ দেখাচ্ছিল। তাই বলে তার রূপের ছটা এতটুকুও কমেনি। তাকে দেখে আমার ভদ্রার কথা মনে পড়ল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমি পালিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু কোনো অছিলা পেলাম না। এক উপাসক-কন্যার এমন কষ্ট দেখে তার কোনো ব্যবস্থা না করে আমি যাই-বা

কী করে ? আমাকে শেষে মন্ত্র পড়তে হ'ল। মেথাকুমারী প্রথমে অন্তমনস্ক-ভাবে চোখ নীচু করে বসেছিল, খানিক পরে আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। তার নীল চোখের ছুটি তারা জলজল্ করে উঠল, কপালের ওপর থেকে হলুদ বর্ণ চুলের রাশ সরে গেল। লোকে মনে করল, এ আমার মন্ত্রের জোর। পরের দিন আবার আমার ডাক পড়ল। মেয়েটি আগের চেয়ে অনেকটা প্রকৃতিস্থ। আমি যখন গেলাম তখন তার মা ছিল সেখানে। আমাকে দেখে কাজের অছিলায় মা চলে গেল। এখন ঘরের এক কোণে কেবল আমরা দুজনই আছি। আমার বুক কাঁপছে। মন্ত্র পডতে পারছি না। কোনো মতে গুনগুন্ করে মন্ত্র পড়তে পড়তে মনে মনে খালি বলছি, 'ওর মা যেন শীগগির চলে আসে। কিন্তু এল না। আমার চোখে বোধ হয় উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কিংবা হয়তো সে আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব বুঝতে পেরেছিল। কিছুক্ষণ সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মন্ত্রবলেব ওপর আমার তত বিশ্বাস ছিল না, তবু দেখলাম মেয়েটির আগেব সেই ভাব কেটে গেছে, মুখ হয়েছে আনন্দোজ্জ্বল। আজ তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে দেখলাম অসাধারণ স্নেহ। তার সঙ্গে মিশে আছে একটুখানি করুণা। যেন সে তার মূক মুখে আমার কাছে কী ভিক্ষা করছে। আমার দিক থেকে কোনো উত্তর বা সঙ্কেত না পেয়ে সঙ্কোচ সরিয়ে সে নিঃসঙ্কোচে বলল: আপনার উপদেশ যত সুন্দর. আপনার মন তত সুন্দর নয়।

আমি চমকে উঠলাম। জবাব দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। সেজন্য আমি তৈরিও ছিলাম না। মেয়েটির কথা শুনে ভেতরটা আমার দপ্ দপ্ করে উঠল। আমি বুঝলাম, একথার অর্থ কী। বুঝলাম, এমন উৎসর্গ আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও না। কিন্তু তবু আমাকে একটা জবাব দিতে হবে তো, যাতে সে আঘাত না পায়! জবাব দিতে আমার একটু দেরি হ'ল। আমি যতদূর সম্ভব কোমল স্বরে বললাম: আমি খুশি হয়েছি, তোমার অসুখ সেরে গেছে।

—অসুখ সেরে গেছে বলবেন না. আপনি আসায় মাত্র কিছুক্ষণেব জন্য সেরে গেছে। আপনি যদি আমার কাছ থেকে চলে যান তাহলে আবার আমার অসুখ করবে।

—আমি মন্ত্র পড়ে ভূত তাড়িয়ে দিয়েছি। আর সে তোমার কাছে আসবে না।

—আপনি তো খুব বোকা! আমি শুনেছিলাম, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক লেখাপড়া শিখেছেন! আমার ভূত এমন করে যাবে না।

সব স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। তবু আমি ধরা দিলাম না, এড়িয়ে গেলাম। জবাব দিলাম না।

সে বলল: ভদ্রার সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রেমের স্রোতটাও কি শুকিয়ে গেছে? রূপের দিক দিয়ে আমি ভদ্রার সমকক্ষ নই, কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমি যে তার মতো হব না সেটা ঠিক।

আমি বললাম: তুমি অনর্থক ভদ্রাকে দোষ দিচ্ছ।

—ভদ্রা যদি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসত তাহলে এত সহজে সে অন্যের অঙ্কশায়িনী হ'ত না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনার গুণের কথা আমি অনেক শুনেছি, অনেক দিন থেকেই মনে মনে আপনাকে চেয়েছি। আমার বাড়ির লোকেরা এতে বাধা দেবে না।

—তুমি ঠিকই বলেছ সুমুখী, প্রেমের স্রোত সত্যিই আমার শুকিয়ে গেছে। আমি যদি এখন প্রেমের ভান করি, তাহলে তোমার আর আমার দুজনেরই অকল্যাণ হবে।

—আমি কিন্তু হঠাৎ আবেগের বশে আপনার কাছে প্রেম নিবেদন করি নি। আমি অপেক্ষা করব। আপনি শুধু বলুন, আমার ভালোবাসা অগ্রাহ্য করবেন না। ভেবেচিন্তে পরে জবাব দেবেন। তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

আমি তখনই 'না, বলতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। বললাম: হ্যাঁ, আমি ভেবে বলব।'

তারপর আমি চলে এলাম সেখান থেকে।

মেয়েটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে দেখে আমার মন্ত্রের ওপর সবার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু আমার পক্ষে আর একটি দিনও সেখানে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। অথচ সঙ্গের আর চারজনকে ছেড়ে আমি বর্ষাবাস ভঙ্গই বা করি কী করে? উপদেশ দেবার সময় প্রতিদিন মেয়েটিকে আমি দেখতাম। একদৃষ্টে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তার মুখে চিন্তার কোনো লেশ না দেখে আমার বড় আত্মগ্লানি হ'ত—সে হয়তো আমাকে বিশ্বাস করেছে, আর আমি তাকে প্রতারণা করে চলেছি।

মহাপ্রাবারণার আর এক মাস মাত্র বাকি। মহাপ্রাবারণার দিনটি যত

কাছে আসছে ততই যেন আমার বুকের বোঝা হাল্কা হচ্ছে। আবার অন্যদিক দিয়ে সে বোঝা বাড়ছে, যখন ভাবছি আমার এত বিচার-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে প্রতারণা করছি। বোধিসত্ত্বের পরোপকারময় জীবন সম্বন্ধে এখন আর আমি আগের মতো উৎসাহ নিয়ে বলতে পারি না। মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করাই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েটার হৃদয়বেদনা দূর করার চেষ্টা করছি না কেন? কিন্তু তাতে কি বোধিসত্ত্বের ব্রত পালন করা হবে? সকলের হৃদয়বেদনা দূর করা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া এর ফল কী হবে? হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মতো আমিও একজন গৃহস্থ হয়ে যাব, সন্তান-সন্ততি আর আত্মীয়স্বজন প্রতিপালনে সারাটা জীবন কেটে যাবে। তাহলে আমি মনপ্রাণ দিয়ে বোধিসত্ত্ব ব্রত পালন করব কখন? এতএব সীমারেখা টানতেই হবে। আমার মন বলতে লাগল, এ রকম নিঃসীম বোধিসত্ত্ব ব্রত পালন সর্বনাশের কারণ হতে পারে। আমি অন্ধ্রদেশে দেখেছি, বোধিসত্ত্বের পরোপকারময় জীবনের আড়ালে উন্মুক্ত কামনা চরিতার্থ করা হয়। কে জানে, মানুষের এই প্রবৃত্তি তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে! তাকে দিয়ে কোন্ কাজ করাবে।

পয়ারে থাকবার বাকি একটা মাসই নয়, তার পরেও কতদিন আমি ভেবেছি, শীল আর সদাচার বোধিসত্ত্বের নিঃসীম ব্রতপালনের আবশ্যক কিনা। নারীকামুকতা, স্বার্থলিপ্সা আর এই ব্রত আলাদা আলাদা ভাবে পালন কী করে সম্ভব? তথাগত সর্বদাই শীল, সমাধি আর প্রজ্ঞা এই তিন স্কন্ধ পালনের ওপর জোর দিয়েছেন। কামবৃত্তি প্রতিরোধ করা আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করা, বিশেষ করে যৌবনে, আমাব কাছে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হ'ত। আবার ভাবতাম, তাহলে এমন অসম্ভব জিনিসের ওপর এমন জোর দেওয়া হয়েছে কেন। আমি ভালো করেই জানি, মহৎ ব্রত আর পরোপকারময় জীবন যাপনের পথে গৃহী হওয়া মস্ত বাধা। সন্তান-সন্ততি থাকলে অন্য সবার সঙ্গে সমদর্শিতা আসবে কী করে? তাছাড়া আপনজনের দায়িত্ব যত বেশি হয়, অন্যের বেলায় তত তো হয় না! আপন-পর এই কথার ঊর্ধ্বে উঠতে হলে গৃহী-জীবন পরিত্যাগ করতে হবে। এখন যেমন কারও অসুখ করলে সারা সময় আমি মনপ্রাণ দিয়ে তার সেবা করতে পারি, চার সন্তানের পিতা হলে কি তা পারতাম? আমাকে তখন জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হ'ত। কিন্তু একার বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না, যেমন-তেমন করে ভিক্ষায়ে দিন চলে যায়।

এখন আমি আমার প্রয়োজনগুলোকে সঙ্কুচিত করতে পারি, কিন্তু গৃহী হলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, বোধিসত্ত্বের পরোপকারময় জীবনকে সীমাহীন না করে আমার একটা মধ্যপথ বেছে নেওয়া উচিত। সেইটেই মানুষের পক্ষে সম্ভব। অথচ ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি নি—যদিও আমি তা পালন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি এবং অনেকটা সফলও হয়েছি। যদি সফল না হতাম তাহলে আমি এতদিন এই মুক্ত যাযাবরের জীবন যাপন করতে পারতাম না। যাযাবরের জীবন আমার ভারি ভালো লাগে। কিন্তু আজ সত্তর বছরের এই হাড়গুলো অনেক ক্ষয়ে গেছে, পা দুটো হয়েছে শক্তিহীন। এই পা দুটো একদিন দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত আর অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাকে গ্রাহ্য করত না।

মহাপ্রাবারণার দিন পয়ারের উপাসক আর উপাসিকারা আমাদের পাঁচজন ভিক্ষুকে নানারকম খাবার দিয়ে গেল। নিজেদের হাতের তৈরি সূক্ষ্ম পশমের চাদর দিল। আর বিহারের সবার জন্য দিল মাখন, মাংস আর বিভিন্ন জিনিস।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি আমরা স্বভূমি বিহারে ফিরে এলাম। আমার আচার্য উপাধ্যায় গুণবর্ধন ও জিনবর্মা এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু অন্য ভিক্ষুরা আমায় আত্মীয়ের মতো স্নেহপাশে আবদ্ধ করলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, যে বিহারে আমি শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছি তার ঋণ শোধ করব। তাই বিহারে ফিরে অধ্যাপনার কাজ নিলাম।

আমার খ্যাতি জ্ঞানের জন্য যতটা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল মধুর ব্যবহারের জন্য। আমার কাছেই সব চেয়ে বেশি বিদ্যার্থী আসত। ছোট ছোট শ্রামণের থেকে শুরু করে মহা মহা বিদ্বান্ পর্যন্ত সবাইকে পথ দেখিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া আমার পরম কর্তব্য বলে মনে করতাম। বিহারের সত্তর-আশি বছরের জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে আমি কতটুকু! কী-ই বা আমার যোগ্যতা! কিন্তু তবু আমাকে সবাই বলত অজাতশত্রু। যে কলহ-বিবাদের মীমাংসা কেউ করতে পারত না তার মীমাংসার ভার দেওয়া হ'ত আমার ওপর। কেননা, তাতে আমি সর্বদাই সফল হতাম।

বিহারের ভিক্ষুদের সেবার জন্য সব সময় আমি তৎপর থাকতাম। আবার নদীর ওপারের গ্রামের লোকেরা অসুবিধায় পড়লে আমার কাছেই আসত।

আগেই বলেছি, চিকিৎসাশাস্ত্রে আমার জ্ঞান ছিল অতি সাধারণ। স্বভূমি বিহারে আমার সেই গুরু বৃদ্ধ চিকিৎসক তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর হাতযশও ছিল। তাঁর দু-তিনজন শিষ্য কৃতবিদ্য বৈদ্য ছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা সবার আগে ছুটে আসত আমার কাছে। তাদের বিশ্বাস, ঔষধির চেয়ে আমার আশীর্বাদেই কাজ হয় বেশি। আমি তাদের সেই বিশ্বাসে আঘাত দিতাম না।

অতি কষ্টে দু বছর আমি বিহারে ছিলাম। তারই মধ্যে আমার নামযশ আর প্রভাব অনেক বেড়ে গেল। আমার কাছে ভেটপুজো আসত। আমি তা সংঘের ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিতাম। যতদিন আমি বিহারে ছিলাম আর ওপারের গ্রামের লোকেরা শীতের জন্য নিচে নেমে যায় নি ততদিন আমি ভিক্ষান্নে দিন যাপন করেছি। ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে আর আমি এগুতাম না। ভিক্ষাও গ্রহণ করতাম না। লোকে তা জানত। তাই কেউ জোর করত না। সবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি এক-একদিন গ্রামের এক-একদিকে ভিক্ষায় যেতাম। আমার কাছে সম্মানের চেয়ে স্নেহের মূল্যই ছিল বেশি। তাই আবালবৃদ্ধবনিতার সেই অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করার জন্য আমি সব সময় চেষ্টা করতাম।

আমি আগেই বলেছি, উদ্যানের অন্য সব বিহারের মতো আমাদের স্বভূমি বিহারও ছিল এক সর্বাস্তিবাদী, অর্থাৎ হীনযানী বিহার। কিন্তু মহাযান সেখানে অনুপ্রবেশ করেছিল। সেবার এখানে এসে আমি ভেবেছিলাম, মহাযান প্রচার করব, স্বভূমি বিহারকে তার ঘাঁটি করব। কিন্তু পয়ারে যেথা-সুন্দরীর সঙ্গে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, তারপর মহাযান সম্পর্কে কিছু বলতে সঙ্কোচ হতে লাগল। দু বছর এই বিহারে থাকা কালে কখনও আমি মহাযান সম্পর্কে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপদেশ দিই নি। এমনি পড়ানোর সময় মহাযান সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছি। কিন্তু আমার চেষ্টা ছিল হীনযান আর মহাযানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। আমার বিদ্যার্থীরা অন্য সব অধ্যাপকের চেয়ে আমার ওপরই বেশি সন্তুষ্ট ছিল—যদিও আমি সব সময় বলতাম তাঁদের তুলনায় আমার জ্ঞান অনেক কম। আমার চেয়ে যাঁরা বয়েসে বড় তাঁরা জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় না হলেও তাঁদের আমি সম্মান করতাম। বিনম্রভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতাম। ফলে, কেউ আমার প্রতি ঈর্ষা করত না।

মাঝে মাঝে দেশপর্যটনের জন্য মন আমার উতলা হয়ে উঠত। কিন্তু আস্তে আস্তে আমার চারধারে মাকড়সার জালের মতো স্নেহজাল ছেয়ে গেল।

ভিক্ষু আর উপাসকদের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল, আমার পায়ে সোনার বেড়ি পড়ে গেছে। সে বেড়ির বাঁধন দিনের পর দিন শক্ত হচ্ছে। আমার ডানা ছুটো কাটা হচ্ছে। আর হয়তো আমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারব না। কিন্তু সব কিছু তো আর পরম্পরা মেনে চলে না। নৈয়ায়িক আর স্থিরতাবাদীদের কথামতো, কার্যকারণের নিয়মও থাকে না। কে জানত, একদিন এই সোনার বেড়ি, এই স্নেহজাল আপনা থেকেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আবার আমার ডানা জোড়া লাগবে!

একদিন আমি বিদ্যার্থীদের পড়ানোর পর সন্ধ্যাবেলায় মূল বিহার থেকে দক্ষিণে দ্রাক্ষা উদ্যানে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন তিন-চারজন তরুণ ভিক্ষু। তাঁরা শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন। এমন সময় আমাদের দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণের ঘন জঙ্গলে। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়া বেশি না হলেও আমরা বুঝতে পারলাম, বনে আগুন লেগেছে। দেখে ভয়ের কিছু মনে হ'ল না। বিহারে ফিরে এসে ধোঁয়ার কথা আমরা ভুলেই গেলাম। রাত্রে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে জোরে বাতাস বইতে লাগল। কিন্তু কীকরে জানব যে, সেই আগুন দ্রুতবেগে আমাদের বিহারের দিকে ধেয়ে আসছে? রাত্রি যখন দু-তিন দণ্ড বাকি তখন ভীষণ কোলাহল শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরে এলাম। দেখলাম, দিনের আলোর মতো চারদিক আলোময়। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। দেখলাম, বিহারের পশ্চিমদিকের জঙ্গলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ভিজে গাছ যে এমন করে জ্বলতে পারে তা আমি আগে জানতাম না। অগ্নিবাণের মতো গাছের জ্বলন্ত শাখাগুলি দূরে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। তাতে আগুন আরও বেশি জ্বলছে। দ্রাক্ষা উদ্যানে দ্রাক্ষালতার মাচায় আগুন ধরে গেল। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা আর তা নিয়ে ভাবার সময় নেই। আগুন এত কাছে এসে গেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে বিহারকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। যা কিছু বাঁচাবার, এখনই বাঁচাতে হবে। আমরা দু জন ভিক্ষু যখন একটা খাটিয়ার ওপর এক রাশ বই আর অন্য কিছু জিনিস নিয়ে নদীর ওপারের গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম তখন গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সবাই ছুটল বিহারের জিনিসগুলি রক্ষা করতে। একদিকে আগুন আর বাতাস, অন্যদিকে বিহার আর গ্রামের লোকেরা। সবাই বুঝতে পারছে, বিহার রক্ষা করা যাবে না। এক প্রাচীন স্তূপ ছাড়া বিহারের সমস্ত বাড়িটাই কাঠের তৈরি, তা-ও বহু

শতাব্দীর শুকনো। সেই আগুনের মধ্য দিয়ে আমরা বিহারের জিনিসগুলি বয়ে বয়ে ওপারের সেই গ্রামে নিয়ে যেতে লাগলাম। আমরা যখন অষ্টধাতুর তৈরি একটি প্রতিমা সরানোর ব্যবস্থা করছিলাম, ঠিক তখনই প্রতিমাগৃহের চালের ওপর একটা জলন্ত শাখা এসে পড়ল। আমরা ভাবছিলাম, কয়েক হাজার মন ভারী এই প্রতিমা সরাতে পারব কিনা, সে ভাবনার এখন অবসান হ'ল, আমরা মুক্তি পেলাম। একের পর এক বিহার জলতে লাগল। ওপারের গ্রামে গিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

যা হয়ে গেছে তার জন্ত চিন্তা করা কিংবা বিলাপ করা আমার স্বভাবে নেই। তবু আমার দুঃখ এই যে, অতি প্রাচীন এই বিহার আর তার ভেতর সংরক্ষিত বহু প্রাচীন সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এই দাবদাহ কি কোনো রকমেই নিবারণ করা সম্ভব নয়।

এগার

দেখতে দেখতে প্রাচীন সুভূমি বিহার একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। তার সঙ্গে বহু জিনিস নষ্ট হল। কিন্তু ভিক্ষুদের জীবনযাত্রায় কোনো কষ্ট হ'ল না। ভাণ্ডার থেকে কিছু খাবার জিনিস বাঁচানো গিয়েছিল। তাছাড়া সে সব জিনিস গ্রামেও সুলভ ছিল। আর দূরের লোকেরা যখন শুনল, তাদের পবিত্র বিহার পুড়ে গেছে তখন তারা সকল রকমভাবে সাহায্য করতে লাগল। আমরা যদি পুরনো বিহারের জায়গায় কাঠ-পাথরের একটা সাধারণ বাড়ি চাইতাম তাহলে তা তৈরি করতে কোনো অসুবিধাই হ'ত না। প্রাচীন পাষাণ-চৈত্যের খুব কমই ক্ষতি হয়েছিল। শুধু তার চূড়ার কাঠের অংশটুকু পুড়ে গিয়েছিল আর কোথাও কোথাও কয়েকটা পাথরের চটা উঠে গিয়েছিল। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই মেরামত করা হ'ল।

কাঠ-পাথরের সাধারণ বিহার আমরা চাই নি, আমরা সুভূমি বিহারকে আগের মতো দেখতে চেয়েছিলাম। আমাদের বিহারের মহাস্থবিরই শুধু নন, সারা দেশের উপাসক-উপাসিকারাও তাঁদের বিহারকে আরও সুন্দর করে গড়তে চেয়েছিলেন। উদ্যান আর এখন কপিশা, গান্ধার, কাশ্মীর বা অন্ত দেশের মতো কোনো বড় মহারাজার অধীন ছিল না। যদি থাকত আর এ ঘটনা তোরমাণের সময় ঘটত তাহলে শুধু তাঁর হুকুমের অপেক্ষা

মাত্র—সঙ্গে সঙ্গে সুভূমি বিহার আগের চেয়েও সুন্দর করে তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু সে সম্ভাবনা যখন নেই তখন সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। সুভূমি বিহারে কম্বোজ, তুষার, সোগ্দ, কাংস্ত আর কুচাদেশের ভিক্ষুও থাকতেন। আমি তাঁদের কাছে তাঁদের দেশ সম্বন্ধে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করতাম। তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেই আমি জেনেছি, সেসব দেশে সোনা আর হীরার বড় বড় খনি আছে। আমি ভাবলাম, তাঁদের দেশে গিয়ে দ্রব্য সঞ্চয় করি না কেন। আমার কথা বিহারের উচ্চ অধিকারীদের পছন্দ হ'ল। একদিন আমি চারজন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে সুভূমি থেকে রওনা হলাম।

এই পৃথিবী অসীম, না আর্যভটের মতো জ্যোতিষীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সসীম তা আমি জানি না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু জানি যে, আমাদের দেশ থেকে দশ-বিশ দিনের পথে অবস্থিত ভূভাগও আমাদের কাছে বড় অচেনা আর অদ্ভুত। আমরা মনে করি, সেখানে আমাদের মতো মানুষ থাকে না, দেবতা বা অসুরদের মতো অন্য একরকম প্রাণী বাস করে। সেখানকার গাছপালা আর অন্য সব জিনিস আমাদের এখানকার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কান আর চোখের মধ্যে মাত্র চার আঙুল দূরত্ব, কিন্তু চোখে দেখেই সব ভালো করে বোঝা যায়, কানে শোনা কথায় অনেক কিছু অস্পষ্ট থাকে।

হিমালয়ের ওপারে উত্তরের দেশটা কী রকম তা লোকের কাছে শুনে শুনে খানিকটা ধারণা করেছিলাম। এবার চলেছি নিজের চোখে দেখতে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কম্বোজদেশের এক ভিক্ষু। আর সবাই ছিলেন উদ্যানের। অন্য দেশের ভিক্ষুরাও যদি থাকতেন তাহলে অনেক সুবিধা হ'ত।

সুভূমি বিহার থেকে আমরা কিছুটা নিচে নামলাম। তারপর পথ চলল ওপর দিকে। উদ্যানের এক নগরী চিতরাল (চিত্রালয়)-এ পৌঁছুনোর আগে কুনরনদী পার হতে হ'ল। এর পর পথ আমাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে। দুদিন পর্যন্ত ছোট্ট এক নদীর ধার বেয়ে ওপরের দিকে এগুতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যেন কোনো পয়ারের দিকে যাচ্ছি। যতই উঁচুতে উঠছি ততই ক্লান্তি বোধ করছি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখানে কেবল দেবদারু জাতীয় গাছেরই প্রাধান্য। সীমান্তের অনেক আগেই গাছপালা সব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু চড়াই শেষ হয় নি। কম্বোজ-ভিক্ষু সুমন বললেন, এর পরে আর গাছপালা দেখা যাবে না। সীমান্তে ডাকাতের ভয় আছে। তবে আমরা ভিক্ষু, ডাকাত

আমাদের কিছু করবে না। কারণ, আমাদের কাছে তো ধনরত্ন কিছু নেই। কিন্তু এই দুর্গম পথে লোকে দল বেঁধে যাওয়া-আসা করে। আমাদের দলে পঞ্চাশ জনেরও বেশি লোক ছিল আর ছিল মাল বোঝাই অনেকগুলো ঘোড়া আর গাধা। সন্ধ্যার আগেই আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছুলাম। এখানে উদ্যানীদের কয়েকটা কুঁড়েঘর ছিল। রাত্রিবাসের জন্য আমরা সেখানে রয়ে গেলাম। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই যাত্রা করতে হবে।

রাত্রে কিছু বরফ পড়ল। কিন্তু তৃতীয় প্রহরে আমরা যখন রওনা হলাম তখন আকাশ মেঘমুক্ত। চাঁদের আলো দুধের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্রাম নেবার ফলে চড়াইয়ে ওঠার উৎসাহ আমাদের কিছুটা বেড়ে গেল। শিরায় শিরায় যৌবনের তাজা রক্ত নেচে উঠল।

আমাদের ঘরের কাছে অতি সামান্য বরফ পড়েছিল। কিন্তু পথে এগিয়ে দেখলাম, বেশ পুরু বরফ পড়েছে। সুভূমি বিহারে শীতকালে যেমন শীত পড়ে এখানে তেমন শীত। আমরা শীতের জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলাম। আমাদের মুণ্ডিত মস্তক আর কান ঢেকে ছিল মোটা পশমের কণ্টোপ। সারা শরীর ঢেকে নিয়েছিলাম পশমের সংঘাটী আর চীবরে। বিশেষ সাবধানতার জন্য তুলাজিনের অংসকূটও ছিল গায়ে। পায়ে ছিল দু-ভাঁজ চামড়ার জুতো। এই পোশাকে ভীষণ শীতের মধ্য দিয়েও যাওয়া যায়। আমরা চলছি আস্তে আস্তে, যাতে দলের লোকেরা তাড়াতাড়ি এসে আমাদের ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও পশুদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম না। আমরা বোধ হয় অনেক আগেই রওনা হয়েছিলাম। বরফ এখন অনেক পুরু হয়ে গেছে। টাটকা বরফ না পড়লে হয়তো আমরা পথের সন্ধান পেতাম। কম্বোজ-ভিক্ষু তিন বছর আগে এই পথে এসেছিলেন। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। আমরা পাঁচজন একসঙ্গে পথ চলার চেষ্টা করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার চোখে পড়ল, আমরা চারজন চলেছি। আর একজন কই? সুমন বললেন: এখানে দৈত্যদের খুব উৎপাত। তারা পথিকদের পথ ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে যায়। তারপর তাদের খেয়ে ফেলে।

আমরা তাড়াতাড়ি নিচের দিকে ফিরে এলাম। কয়েক পা যাবার পর ডানদিকে একজনের চিৎকার শুনতে পেলাম। ছুটলাম সেদিকে। আর একটু দেরি হলে আর ওঁকে পেতাম না। তাঁকে দানবে ধরেছিল। আমি গিয়ে

মন্ত্র পড়লাম। হয় মন্ত্রের বলে কিংবা আমাদের সকলকে কাছে দেখে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমরা ওপর দিকে উঠতে শুরু করলাম। খানিক পরে এক পাথরের কাছে এসে ভিক্ষু বললেন: এখানেই আমি দেখেছিলাম, চারজন লোক অন্য পথে যাচ্ছে। আমিও তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলাম। একটু দূরে গিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার তখন সুমনের কথা মনে পড়ল। ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমরা আমাদের সঙ্গীকে ফিরে পেয়েছি সত্যি, কিন্তু বিপদ এখনও কাটে নি। আমরা শুনেছিলাম, এখানে দৈত্য আর ডাকাতের ভয় আছে। আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা, জানি না। সুমন বলতে পারলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দলের পশুদের ঘণ্টার শব্দ কিংবা মানুষের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পেলাম না। আগে বেরিয়ে পড়ার জন্য অনুশোচনা হ'ল। কিন্তু এখানে বসে থাকলে তো কোনো ফল হবে না। দলের লোকেরা যদি আগে চলে গিয়ে থাকে তাহলে তারা ওপরে উঠে আমাদের জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করবে না, আমাদের খোঁজখবর নেবার জন্য নিচে লোকও পাঠাবে না। তাই আমরা আবার ওপর দিকে উঠতে লাগলাম। সুমন আন্দাজে ভর করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

রাস্তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম। পূব আকাশে তখন লাল রঙ, সূর্য উঠছে। পর্বতশিখর থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে জায়গাটাকে আমরা অনেক উঁচু মনে করেছিলাম সে জায়গাটা তত উঁচু নয়। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকে কেবল বরফাচ্ছন্ন পর্বতচূড়া, সূর্যের আলো পড়ে সোনালী রঙ ধরেছে। আমি শুনেছিলাম, পড়েওছিলাম, উত্তর দিকের সুমেরুপর্বত সমস্তটাই সোনার। কিন্তু সুমেরু তো একটামাত্র সোনার শিখর, আর এখানে কয়েক শ সোনার শিখর দেখা যাচ্ছে। আমরা উদ্যানবাসীরা জানি, হিমাচ্ছন্ন পর্বতশিখরে সূর্যের আলো পড়লেই তা সোনা-রূপো হয়ে যায়। সত্যিই যদি এই শিখরগুলো সোনার হ'ত আর আমরা কোনো রকমে প্রাচীন অর্হৎদের মতো আকাশপথে সেখানে পৌঁছুতে পারতাম তাহলে বিহার তৈরির জন্য সোনা খুঁজে খুঁজে আর হয়রান হতে হ'ত না।

সুমনকে আমাদের পথপ্রদর্শক করেছিলাম। কিন্তু তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না, কোথা দিয়ে নিচের দিকে নামা যায়। আর কতক্ষণ আমরা এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকব? রোদ্দুর বাড়লে বরফ নরম হয়ে যায়, তখন

ধস নামবার ভয় থাকে। তাই আমরা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিলাম। বুদ্ধির বদলে চোখ আর পায়ের সাহায্যে পথ চলতে শুরু করলাম। বোধ হয় এক দণ্ডও হয় নি, জনকয়েক লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভারি আনন্দ হ'ল। এইবার আমরা দলের লোকদের পেয়েছি! কিন্তু এ কী? লম্বা লম্বা তলোয়ার আর তীর-ধনুক হাতে দশ-বারজন লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। সুমন তাদের ভাষা জানতেন। তিনি বললেন: এরা কম্বোজদেশের ডাকাত। আমরা পাঁচজন পথভ্রষ্ট ভিক্ষু জেনে তারা খুব হতাশ হয়েছে।

সুমন তাদের বললেন: আমাদের কাছে অতি সাধারণ কাপড়চোপড় আর ভিক্ষাপাত্র ছাড়া কিছুই নেই। কোনো ধনসম্পদ না।

ভিক্ষুদের দৈবশক্তি আর মন্ত্রবলের ওপর ডাকাতদের গভীর বিশ্বাস। তাই তারা আমাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করল না। তাদের সর্দার তার অসুস্থ স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য মন্ত্র পড়তে অনুরোধ করল, মাদুলি চাইল। ভূর্জপত্র আর দোয়াত-কলম আমাদের সঙ্গেই ছিল, আমরা তাকে মন্ত্র লিখে মাদুলি তৈরি করে দিলাম। ডাকাতের দল বলল, আমরা পথ ছেড়ে বহু দূরে পশ্চিমে চলে এসেছি। তবে উদ্যানপ্রদেশের সীমায় তপ্তকুণ্ডের পথ এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। তপ্তকুণ্ডের কাছ দিয়েই গেছে আমাদের পথ। কিন্তু আমাদের তো দলের লোকদের ধরতে হবে। আমাদের খাবার-দাবার তাদের সঙ্গেই রয়েছে।

সর্দার দুজন লোক দিল সঙ্গে—পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে। দু দণ্ড পর আমরা আমাদের রাস্তায় এসে পৌঁছুলাম। রাস্তায় বরফের ওপর দেখতে পেলাম অনেকগুলো মানুষ আর পশুর পায়ের সদ্য ছাপ। ডাকাত দুজন আমাদের রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমরা তাদের আশীর্বাদ করলাম। দু-দুটো সঙ্কট থেকে আমরা রক্ষা পেলাম।

সূর্য এখন আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। দিনের আলোয় বরফাচ্ছন্ন ভূমি পার হবার পর মনে বল এল। এক প্রহর বেলায় আমরা একটা নদীর ধারে খোলা জায়গায় এসে বসলাম। সুমন বললেন: বনের গাছপালা আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

শরতের শেষ। তাই সারা পর্বতস্থলীতে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। বর্ষায় এক হাত দেড় হাত উঁচু যে ঘাস জন্মেছিল তা-ও শুকিয়ে গেছে! আরও অনেকটা

এগিয়ে গিয়ে আমরা দলের লোকদের পেলাম। তারা তখন কেউ কেউ তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছে, কেউ-বা খোলা আকাশের নিচে মালপত্র নিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে তারা খুব খুশি হ'ল। আমাদের জন্ত তারা খুবই চিন্তিত ছিল। ভেবেছিল, দৈত্যরা আমাদের পাঁচজন ভিক্ষুকেই মেরে খেয়ে ফেলেছে। তাদের দোষ কী? তারা তো বারবার বলেছিল একসঙ্গে রওনা হতে। তারা যখন শুনল, একজন ভিক্ষুকে আমরা দৈত্যের মুখ থেকে কেড়ে এসেছি তখন তাদের বিশ্বাস হ'ল, এতদিন তারা যা চোখে না দেখে বলে এসেছে তা সত্যি। আমাদের দৈবশক্তির ওপরও তাদের আস্থা বেড়ে গেল—দৈত্যের মুখ থেকে মানুষ ছিনিয়ে আনার ক্ষমতাও আমাদের আছে।

কাশ্মীরের গৃহপতিরা সেদিন গন্ধশালী চালের সুস্বাদু ভাত রান্না করল। উড্ডানীরা রান্না করল মাংস। মধ্যাহ্নে আমাদের পাঁচজন ভিক্ষুকে বসিয়ে যেভাবে তারা খাওয়াল তাতে মনেই হ'ল না যে, আমবা কোনো নির্জন পার্বত্য দেশে আছি। আজকের যাত্রা বড় কঠিন, বড় পরিশ্রমের—মানুষের এবং পশুরও। তাই সারা দিন আর রাত আমরা বিশ্রাম নিলাম। পরের দিন রওনা হলাম। পাহাড় দেখতে সবই এক রকম—বনজঙ্গল গাছপালা কিছু নেই, আছে কোথাও কোথাও হলদে-হয়ে-যাওয়া ছোট ছোট ঘাস। পাহাড়ে পাথর কম, মাটি বেশি। আমরা নদীর ধার দিয়ে চলেছি নিচের দিকে। যেদিকে তাকাই, একই দৃশ্য। কোথাও আলাদা করার কিছু নেই।

নিচে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছুলাম, যেখানে দুটো পথ দুদিকে গেছে—ডানদিকে কাংস্যদেশ, বাঁদিকে কম্বোজ। আমরা সবাই কম্বোজের পথ ধরলাম। নদীর ধারে ধারে চলেছি। নদীর জল নীল, তাই হয়তো তার নাম নীলাপ। নদীর একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে কোথাও কোথাও গ্রাম। এত দরিদ্র গ্রাম আমি আর কখনও দেখি নি। শুধু মাটি আর অসমান পাথরের ঘরবাড়ি। পাহাড় আর এইসব ঘরবাড়ি দূর থেকে একই রকম মনে হয়। কম্বোজবাসীরা আমাদের উড্ডানবাসীদের চেয়েও ফর্সা। দারিদ্র্যের জন্ত কারও কারও শরীরে রক্তমাংস কম থাকলেও রূপে তারা কারও চেয়ে কম নয়। কম্বোজদেশের ঘোড়া খুব প্রসিদ্ধ। যেমন লম্বাচওড়া তেমনি সুপুষ্ট। দেখতেও খুব সুন্দর। এমন দরিদ্র পার্বত্যভূমিতে এত সুন্দর ঘোড়া জন্মায় কীকরে? সুমন বললেন: বিশ্ববিজেতা যবনরাজ অলিকসুন্দরের ঘোড়ার বংশধর এরা। উড্ডানের ব্যাপারীরা বলল:

এরা হ'ল শ্যামকর্ণ ঘোড়া, চীন আর পারস্য দেশে এই ঘোড়ার খুব চাহিদা আছে।

পথে কম্বোজবাসীদের গ্রাম ছাড়া যেথাদের ঘরবাড়িও দেখতে গেলাম। আমাদের উদ্যানেও যেথারা আছে, কিন্তু এখানকার যেথারা একেবারে বর্বর। দয়ামায়া বলে তাদের কিছু নেই। তারা ঘোড়ার লোমের তৈরি তাঁবুতে বাস করে। তাদের ওপর নাগরিক কিংবা গ্রামীণ জীবনের কোনো প্রভাব পড়ে নি। তাদের সর্দারদের ঘরে চীনা রেশম, ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র আর একাধিক বিলাস-সামগ্রী। লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দর্শন কিংবা উচ্চ জ্ঞানের সঙ্গেও না।

কম্বোজপুরীতে আমরা এলাম আমাদের বিহারের জন্য পদ্মরাগ আর অন্যান্য রত্ন সংগ্রহের জন্য। কম্বোজ এক সময় রত্নখনির জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকাব পদ্মরাগমণি সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। লোহা, সীসা, তামা, ফটকিরি, গন্ধক প্রভৃতি বহু জিনিসের খনি এখানে। কিন্তু শাসনের নামে যদি কেবল লুটপাটই চলে তাহলে লোকে পরিশ্রম করে ধন উৎপাদন করতে যাবে কেন?

রাজবিহারের ভিক্ষুরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ভারতীয় পণ্ডিত ভিক্ষু জেনে আমাদের তাঁরা মাথায় করে রাখলেন। দেশের দুর্দশা, বিশেষ করে বিহার আর ভিক্ষুদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা বললেন। দেশে রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল না। রাজশক্তি ছিল যেথাদের হাতে। এক যেথা সেনাপতিই ছিল কম্বোজপুরী আর কম্বোজদেশের সর্বেসর্বা। আমরা এসেছি শুনে যেথা সামন্ত একদিন আমাদের ডেকে পাঠাল। আমি আজ পর্যন্ত যত দেশে গিয়েছি, সেখানকার সামন্ত কিংবা রাজা ·তিনি বুদ্ধভক্তই হোন অথবা তীর্থিকদের অনুযায়ী—ভিক্ষুদের দেখে আসন থেকে উঠে অভিনন্দন আর অভিবাদন করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এই যেথা সর্দার তার ধার দিয়েও গেল না। সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল। তার এক অনুচর নিচে একটা আসন দেখিয়ে আমাদের বসতে বলল। আমরা এ সবের জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিলাম। বিহারের এক ভিক্ষুর মন্ত্রবিদ্যার জন্য কিছুটা খ্যাতি ছিল। তিনি আমার গুণকীর্তন করলেন। সুমন দৈত্যের মুখ থেকে সেই ভিক্ষুকে রক্ষা করার কথা বললেন, যাতে সে আমাদের যোগ্য সম্মান দেয়।

হেফ্‌তাল সামন্তকে রাজার দরবারে একটু নিচু ভাবা হ'ত, যদিও সে তার সৈন্যদের নিরঙ্কুশ রাজা ছিল—রাজা না বলে লুটেরাদের সর্দার বলাই ভালো।

হেফ্‌তাল রাজা দুর্বল হলেও তার যথেষ্ট শক্তি ছিল। হেফ্‌তাল সেনাপতির তাই রাত্রে ঘুম হ'ত না। সে আমাদের অনিষ্ট-শান্তি করতে বলল। বাধ্য হয়ে আমাদের কিছু পুজো-আচ্চা করতে হ'ল। আমাদের আসার উদ্দেশ্য শুনে সে-ও কিছু পদ্মরাগ কণা দিল, কম্বোজরাজাও কিছু দিলেন। উদ্যানের কয়েকজন সার্থবাহকে এখানে পেয়ে তাদের হাতে রত্নখণ্ডগুলো সঁপে দিয়ে বললাম, সেগুলো যেন তারা সুভূমি বিহারে পৌঁছে দেয়।

আমরা এখান থেকে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। রাজবিহারের ভিক্ষুর খুব ইচ্ছা, শীতকালটা আমরা এখানেই থেকে যাই। তিনি বললেন, সামনে শীত, এই সময় কাংস্যদেশে যাবার সার্থ পাওয়া যায় না। একা কিংবা দুজনে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখে পড়া। সামনের দিকে লোকেরা নিজেরাই শীতে কষ্ট পায়, তাদের ওখানে আরামে থাকার কোন ব্যবস্থাই হবে না।

কিন্তু মন যখন বসছে না তখন থাকব কীকরে? আমরা তাড়াতাড়ি রওনা হব ঠিক করলাম, কারণ পরে শুধু শীতেই নয়, বসন্ত পর্যন্ত পাঁচ-ছ মাস কোনো সার্থ পাওয়া যাবে না বলে খুব কষ্ট হবে।

এবার আমরা পামীরের দিকে যাব—লোকে যাকে অর্ধেক আকাশের টাঙ্গা বলে। নীলাপনদী বক্ষুনদীতে পড়েছে। বক্ষু, সিন্ধু আর সীতা এই তিনটি হল পৃথিবীর বড় নদী। আমাদের উদ্যানবাসীরা তো সব নদীকেই সিন্ধু বলে। কম্বোজপুরী থেকে আমরা বক্ষুনদীর বড় ধারার দিকে যাব। নিচের দিকে গেলে অবশ্য অনেক সুবিধা হ'ত। বেশি গ্রাম পেতাম, চড়াইয়ের বদলে পেতাম উতরাই। কিন্তু আমাদের তো যেতে হবে বক্ষুর উদ্‌গমস্থলের দিকে। সিন্ধু আর বক্ষুর মতো সীতাও এক মহানদী। সীতা বয়ে চলেছে কাংস্যদেশ আর কুশদ্বীপের মধ্য দিয়ে। আমরা বক্ষুক্ষেত্র থেকে সীতাক্ষেত্রে যাব। বক্ষু আর সীতা এই দুই মহানদীর সীমান্তে বহু বিস্তৃত সুউচ্চ এক মাঠ আছে। তাকেই বলে পামীর। চীনারা বলে চুঙ্‌লিঙ্‌, অর্থাৎ পলাণ্ডুগিরি। হিমালয়ের মতো এই পর্বতশ্রেণীরও বহু দূর চলে গেছে। হিমালয় পার হতে আমাদের কম কষ্ট হয় নি, কিন্তু পামীর পার হতে যে কষ্ট হ'ল তা বর্ণনাতীত।

বক্ষুতটে অবস্থিত বক্ষুগ্রাম পর্যন্ত এক সঙ্গী পেয়ে গেলাম। বক্ষুগ্রামেরই অধিবাসী। তাই পথ ভুল হবার ভয় ছিল না। বক্ষুনদীর বহু শাখা আছে। সব শাখার তীরের অধিবাসীরাই নিজেদের নদীকে মূল বক্ষুনদী বলে।

আমরা একদিন বক্সুগ্রামে এসে পৌছুলাম। এই অঞ্চলের নিম্নভাগে বক্সুগ্রাম। গ্রামটি এদিককার সবচেয়ে বড় গ্রাম। স্থানীয় রাজার রাজধানী। এই পার্বত্য অঞ্চলে যার অধীনে দু-এক শ ঘর প্রজা আছে সে-ই রাজা হবার অধিকারী। এ কোনো ধনধান্যেভরা দেশ নয়। হেফ্‌তাল লুটেরারা তাই এদিকে খুব কম আসে। স্থানীয় রাজা তাদের কাছে ভেড়া, পোস্তীন আর অন্য সব জিনিস ভেট পাঠায়। এখানকার লোকেরা নামেই চাষ-আবাদ করে। তাদের মুখ্য জীবিকা ভেড়া-ছাগল পালন। এক-এক ঘরে পাঁচ-ছ শ ভেড়া থাকা খুব সাধারণ ব্যাপার।

শীতের চার-পাঁচ মাস এই গ্রাম থেকে আগের দিকে যাওয়ার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই যতদিন পর্যন্ত-না ব্যাপারীদের সার্থ চলতে শুরু করে ততদিন পর্যন্ত আমরা কাংস্যদেশে যাত্রা স্থগিত রাখলাম। এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে কয়েক দিনের পথে সুবর্ণসবোবর। নাম সুবর্ণসরোবর হলেও জল নীলাপনদীব মতো নীল। গরমকালে লক্ষ লক্ষ হাঁস আর নানারকম জলপাখি এসে বাস করে। বরফ গলে গেলেই সর্বত্র ঘাস জন্মায়। বার যোজন লম্বা আর সাত যোজন চওড়া এই সরোবর। সরোবরে বহু অর্হতেব বাস। সুবর্ণসরোবর সম্পর্কে এত কথা শুনে ঠিক কবলাম, সরোবরটা দেখে আসব। অর্হতের কথা তো এমন অনেক শুনেছি, কিন্তু কোথাও তাদের দেখা পাই নি। বক্সুগ্রামেও একটি বিহার আছে। এই উপত্যকার লোকেরা জীবনযাত্রায় অনেক পিছিয়ে আছে। নাগরিক বিলাসের কোনো সামগ্রীই তাদের নেই। তাদের রাজাও চামড়ার পোশাক পরেন। তথাগতর প্রতি তাদের খুব ভক্তি। তাদের কাছে যা-ই থাকুক না কেন, তা-ই দিয়ে তারা ভিক্ষুদের সৎকার করে।

বিহারের এক ভিক্ষু খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের পথ চিনিয়ে সুবর্ণ-সরোবরে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। রাস্তার খাবার-দাবার আমরা বেঁধে নিলাম। তার জন্য রাজা আমাদের তিনটি গাধা আর চারজন লোক দিয়েছিলেন। পথ দুরূহ। তবু একদিন আমরা সরোবরের তীরে পৌছে গেলাম। শীত পড়ে গিয়েছিল। তাই কোনো জনপ্রাণী দেখতে পেলাম না। গরমকালে এখানে খুব ঘাস জন্মায়। কঙ্কালসার ঘোড়াও কুড়িদিনের মধ্যে এত মোটা হয়ে যায় যে, তার চামড়া ফেটে যাবার ভয় থাকে। নিচে থেকে কোনো অসুস্থ লোক যদি এখানে আসে, জাদুমন্ত্রে যেন তার অসুখ সেরে যায়। আমি

উদ্যানের পয়ারজীবন দেখেছি, তাই পামীরের এই অতিশয়োক্তি সহজেই বুঝতে পারি।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা স্বর্ণসরোবরে এসে পৌঁছুলাম। তখন জোরে বাতাস বইছিল। বাতাসে সরোবরের জলে বড় বড় ঢেউ উঠছিল। সেই ঢেউ দেখে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, সিংহলদ্বীপের সমুদ্রের কথা। পরের দিন সকালে বাতাস ছিল শান্ত, সরোবরের স্থির অতিনীল জল মরকতমণির মতো সুন্দর। আমরা সরোবর দেখেই বক্ষুগ্রামে ফিরে এলাম। অর্হৎ দর্শনের সৌভাগ্য এবারও হ'ল না। সারা শীতকালটা আমাদের বক্ষুগ্রামে থাকতে হ'ল।

উপত্যকার লোকেদের জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ। অল্প একটু ছাতু কিংবা রুটি আর বেশ কিছু মাংস—এই হ'ল খাবার। শরৎকালেই লোকে পাঁচ-ছ মাসের খাবার হিসাবে পশু মেরে মাংস জমা করে রাখে। মাঝে মাঝে অবশ্য শিকার করতেও যায়, কারণ তারা চেষ্টা করে সঞ্চিত মাংস যেন তাড়াতাড়ি শেষ না হয়। শীতের দরুণ মাংস পচে যাবার ভয় থাকে না। এখানে শেয়াল আছে অনেক। তারা ভেড়া ধরে ধরে নিয়ে যায়। শেয়ালের চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করে লোকেরা পরে। এখানকার লোকেরা সত্যবাদী। তারা বাণ চালাতে সিদ্ধহস্ত, কুশলী শিকারী। যুদ্ধে তারা ভয় পায় না। পুরুষদের পোশাক চামড়ার। স্ত্রীদেরও তাই, তবে তাদের অন্তর্বাস স্থতোর। এক-একটা অন্তর্বাসে এক-এক থান কাপড় লাগে। যার অন্তর্বাসে যত বেশি কাপড় সে তত বেশি ধনী, তত বেশি সুন্দরী। কাপড়ের পর কাপড় পরে তারা বিকট-নিতম্বা হতে চায়। এখানে সুন্দর মুখের চেয়ে সুন্দর নিতম্বেরই কদর বেশি।

বাক্ষু

শীতে সত্যিই খুব কষ্ট হ'ল। আমরা যদি কম্বোজপুরীতে থেকে যেতাম তাহলে ভালো হ'ত। কিন্তু এখন সে কথা ভেবে লাভ নেই। দারুণ শীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি আর সুমন এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গী ভিক্ষুর সে সাহস হ'ল না! সবার তো আর অজানা দেশ দেখার ইচ্ছা আর অনভ্যস্ত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না। তার ওপর যদি অসুখবিসুখ হয় তাহলে সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙে যায়।

যালোরে এক-এক করে আমাদের তিন সঙ্গীর পেটের অসুখ হ'ল। আরও এগিয়ে দেখা দিল রক্ত আমাশা। তিনজনেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একজনকে মৃত্যুর সঙ্গে যেতেই হ'ল। হেমন্তর পর সে বছর যদি বসন্ত তাড়াতাড়ি না আসত তাহলে বাকি দুজনের প্রাণ রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ।

সামনের দিকে রাস্তা আরও কঠিন। আমাদের দুই ভিক্ষুর ইচ্ছা থাকলেও শরীরের অবস্থা এমন ছিল না যে, যাত্রা শেষ করতে পারেন। শরীর একটু ভালো হলেই তাঁরা আর না এগিয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইলেন।

এ দেশ সত্যিই খুব ছোট আর দরিদ্র। বাণিজ্যের জন্য পর্যাপ্ত ধন-সম্পদের প্রয়োজন। তা এ দেশের লোকেদের নেই। তাই তারা বাণিজ্য করতে নিজেদের দেশের বাইরে যায় না। কেউ কেউ ভৃত্য কিংবা পথপ্রদর্শক হয়ে সার্থের সঙ্গে যায়। কাংস্যদেশে যাবার জন্য আমাদের কম্বোজ, তুষার, বহ্লীক, কপিশা প্রভৃতি দেশের সার্থবাহের প্রতীক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু সব সার্থই যে আমাদের সঙ্গে নেব, এমন আশা ছিল না। কারণ, আমরা তো তাদের কাছে বোঝা ছাড়া আর কিছু না। আমরা তাদের কোনো কাজে সাহায্য করতে পারতাম না। উল্টে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ভার তাদের ওপরই পড়ত। অবশ্য বেশির ভাগ সার্থই বুদ্ধভক্ত। তাদের বিশ্বাস, ভিক্ষুর সঙ্গে থাকলে দেবী আর মানবীর দিক থেকে কোনো বিপদ হয় না, বরং পুণ্যার্জন হয়।

প্রথম সার্থ বহ্লীকদেশ থেকে এল। তাদের সঙ্গে এক ভিক্ষুও ছিলেন। আমার মতো বহু-পর্যটিত এবং কিছুটা-শিক্ষিত ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন। তাঁরই সাহায্যে সার্থবাহের সঙ্গে আমাদেরও পরিচয় হয়ে গেল। নবপরিচিত সার্থবাহ বলল: কাংস্যদেশ পর্যন্ত আমরা আপনাদের ভালোভাবেই পৌঁছে দেব। সেখানকার লোকেরা ভিক্ষুদের খুব শ্রদ্ধা করে।

আর আমাদের কোনো চিন্তা রইল না। যে দুজন ভিক্ষু দেশে ফিরে যাবেন, পথ চলার জন্য তাঁদেরও সঙ্গীর প্রয়োজন। কম্বোজপুরী যাবার লোকও পাওয়া গেল। তাঁদের বিদায় দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

এবার আমরা বহ্লীক-সার্থের সঙ্গে বক্ষুনদীর এক শাখা ধরে পূবদিকে এগিয়ে চললাম। ছোট ছোট সব নগ্ন পাহাড়। সুবিস্তৃত উপত্যকায় নদীর ধারাগুলো সরু রেখার মতো। আমাদের সার্থ বেশ কিছু পশু ভাড়া নিয়েছিল

বোঝা বইবার জন্ত। চড়াই খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু কোথাও কোথাও পথ এমন জায়গা দিয়ে গেছে, যেখানে নদীকে পাথর ভেঙে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এইসব পথ বড় সংকীর্ণ আর দুর্গম। এ রকম জায়গা এড়াবার জন্ত অনেক সময় আমাদের বহুদূর ঘুরে যেতে হ'ল, কোথাও-বা সবাই মিলে নতুন রাস্তা তৈরি করতে হ'ল। দুদিন পথ চলার পর জনবসতি শেষ হয়ে গেল। আগে আর কোনো গ্রাম নেই।

এখন পর্যন্ত যে ভ্রমণ আমি করেছি তা শুধু ভ্রমণের প্রস্তুতি, আসল ভ্রমণ নয়। এবার শুরু হ'ল সত্যিকারের ভ্রমণ। পথে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আজ যদি বুদ্ধিল আমার সঙ্গে থাকতেন তাহলে এই পথযাত্রা কতই না আনন্দের হ'ত! সুমন আমাকে সত্যিই ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর কাছে আমার কিছু শেখার নেই। তাছাড়া তাঁকে আমি আমার সমস্যাগুলো খুলে বলতেও পারি না। পাঁচ-সাতদিন একসঙ্গে থাকার পর বুঝতে পারলাম, বহ্লীক-ভিক্ষুও সুমনের মতো সুপ্রকৃতিব। ভ্রমণপথে সঙ্গীদের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা দরকার, তবেই ভ্রমণ সুখের হয়। আমার দুই সঙ্গী ভিক্ষুর মধ্যে সেই গুণগুলি ছিল। কিন্তু তাঁরা আমাকে গুরুর মতো দেখতেন। গুরুশিষ্যে আর পিতাপুত্রে যে পার্থক্য, আমাদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। এটা আমার পছন্দ নয়। এই পার্থক্যটা আমার মনের মধ্যে সব সময় বিঁধছে আর বুদ্ধিলের কথা মনে পড়ছে।

রাজার রাজ্যের মতো নদীরও আপন রাজ্য থাকে। বক্ষুনদীর রাজ্য পার হয়ে এবার আমরা সীতানদীর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলাম। পথ চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। দুপুরের পর জোরে বাতাস বয়। তখন ঠাণ্ডা লাগে খুব বেশি। সকালে পথ চলার সময় যেখানেই জল দেখি সব জমাট বাঁধা। দুপুরের কাছাকাছি গলতে শুরু করে। আকাশ থেকে কখনও কখনও যে ফোঁটা পড়ে তা-ও জলের বদলে বরফ। জনবসতি ছেড়ে আসার পর তিন-চার দিন পর্যন্ত শুধু চড়াইয়ের রাস্তা পেলাম। তারপর এলাম ছোট্ট এক নদীর তীরে। এই নদীর তীর ধরেই চললাম কিছু দূর। খানিকটা গিয়ে নদী গেল উত্তরের দিকে বেঁকে। আমাদের ডাইনে পুবদিকে দেখতে পেলাম হিমাচ্ছন্ন শিখরশ্রেণী—ঠিক আমাদের উদ্যানের উত্তরে যেমন আছে। এই শিখরশ্রেণীকে বলে খসগিরি। হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমাদের জাতির লোকেদের সঙ্গে নাকি এই পাহাড়ের সম্বন্ধ আছে! বহুদিন পর্যন্ত খসগিরির

ধার দিয়ে দিয়ে নির্জন ভূমিতে হেঁটে চললাম। কখনও কখনও মেষপালকের কুটির চোখে পড়ে। তাদের কাছে শুধু মাংসই পাওয়া যায়। অন্য খাবার জিনিস খুব কমই থাকে তাদের কাছে। যা-ও বা থাকে, কোনো দামেই তারা দিতে চায় না। আরও আগে বাঁ দিকে একটা সরোবর। স্বর্ণসরোবরের কাছে এই সরোবর যেন একটা পুষ্করিণী। তবু এই জলরাশি দেখে আমার বড় আনন্দ হ'ল। সরোবরে বহু জলপক্ষী সাঁতার দিচ্ছে। তাতে বুঝতে পারলাম, মধ্যমণ্ডলে এখন আগুনের মতো গরম বাতাস বইছে। আবার আমাদের পথ চলল নদীর ধারে ধারে। আবার এক বিরাট সরোবর পেলাম। তার নাম শিলাপতি। দুদিন আগে থেকেই ঠাণ্ডা কমে গেছে। সরোবরের তীরে স্পষ্ট গ্রীষ্মঋতু। আরও এগিয়ে বড় একটা গ্রাম পেলাম। খসগিরি নগর আর বেশি দূর নয়। নগরে কিছু খাবার জিনিস কিনতে হবে। তাছাড়া এতটা পথ হাঁটার পর পশুদেরও কিছু বিশ্রাম দরকার। তাই সার্থবাহ সেখানে পাঁচদিন থাকবে ঠিক করল।

আমার বড় আনন্দ যে, দুর্লঙ্ঘ্য হিমবান্ পার হয়ে এবার আমরা কাংস্যদেশে পৌঁছে গেছি। সার্থ যেখানে থেমেছে সেখান থেকে কিছু দূরে সরোবরের তীরে একটি বিহার দেখতে পেয়ে আমাদের বড় ইচ্ছা হ'ল, একবার সেখানে যাই। পরের দিন আমরা তিন ভিক্ষু গেলাম সেখানে। ভারতীয় ভিক্ষু জেনে তাঁরা আমাকে স্বভাবতই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কাংস্যদেশের লোকেদের ভক্তির প্রশংসা আগেই শুনেছিলাম, এবার তার প্রমাণ পেলাম। বিহারে ভিক্ষুদের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হ'ল। দেখলাম, তাঁরা খুব বিদ্যানুরাগী। তাঁরা বিহারে এসে থাকার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধ আমরা এড়াতে পারলাম না। সেদিনই সার্থবাহের কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলাম। বিহারটি খুবই ছোট। কাজেই সেখানকার লোকেরা যদি আমাকে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত মনে করে তাহলে আর আশ্চর্য কী!

আমার কাংস্যদেশে আসার একটি উদ্দেশ্য, দগ্ধীভূত সুভূমি বিহারকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ধনসংগ্রহ। কিন্তু দেশের যে পরিস্থিতি তাতে সে আশা নেই। না-ই বা হ'ল ধনসংগ্রহ। সেটাই তো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমাকে এখানে টেনে এনেছে আমার দেশভ্রমণের আকর্ষণ। উদ্যানের ভিক্ষুরা দেশে ফিরে গিয়ে ভালোই করেছেন। তাঁরা থাকলে ধনসংগ্রহই আমার মূল চিন্তা হ'ত। সুভূমি বিহারের জন্য যদি আমি দু-চার

তোলা সোনা কিংবা অন্য কোনো জিনিস সংগ্রহ করতে পারি তাতে বড় কিছু হবে না। আমার এখন একটি মাত্র উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি আর বুদ্ধিল বছরের পর বছর আলোচনা করেছি।

শিলাপতি বিহারে দু-তিন সপ্তাহ থাকার পর বর্ষা নামল। কাংস্তদেশে এবার বর্ষাবাস শুরু হবে। ভিক্ষুরা আমাদের থেকে যেতে বললেন। কিন্তু আমরা খসগিরিতে গিয়ে বর্ষবাস করব ঠিক করেছিলাম। খসগিরি এখান থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে। দুদিন হেঁটে আমরা খসগিরি পৌঁছুলাম। খসনদীর তীরে খসগিরি নগর। এখানকার শিল্পীরা বড় কুশলী। তাদের হাতে কাপড়, ধাতু কিংবা পাথরের জিনিস সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলে খসগিরির সমৃদ্ধি কিন্তু তার কাপাস, আঙুর আর শিল্পকলার জন্য নয়। সারা পৃথিবীর ব্যাপারীদের এখানে দেখা যায়। চীনের মহার্ঘ রেশমী বস্ত্র আর অন্যান্য বহুমূল্য জিনিস এখান দিয়ে পশ্চিমের দূর দূর দেশে যায়। এখান থেকে সোগ্দ যাবার আলাদা রাস্তা আছে। উত্তরে যাযাবরের দেশেও এখান থেকে বাণিজ্য-সার্থ যাওয়া-আসা করে। আমি কখনও আশা করি নি যে, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের পেছনে এমন একটা নগর পাব, যেখানকার লোকেরা এত উদার, এত শিক্ষিত, এত বিদ্যানুরাগী। কাংস্তদেশে বহুধর্মের লোক আছে, তবে তথাগতর ধর্মের প্রাধান্যই বেশি।

এখানে কারও মনে সংকীর্ণতা নেই। এখানকার রাজা আর রানীর বেশভূষা জম্বুদ্বীপের রাজারানীর মতো নয়, খানিকটা যেথা সামন্তদের মতো। এখানকার মেয়েরা মাথায় রঙ-বেরঙের সুতী কিংবা জরির কাজ করা টুপি পরে। পরনে তাদের পাজামা—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামায় ঢাকা। জামাটা গলার কাছে এতটা খোলা যে, ভেতরের কঞ্চুকের ওপর বহুমূল্য অলংকার দেখা যায়। জামায় আবার সুন্দর হাতের কাজ। মাথায় তাদের উত্তরীয় থাকে না, তাই শরীর আঁটসাঁট মনে হয়। রাজা আর সাধারণ মানুষের পোশাক প্রায় একই রকমের। তফাত শুধু দামে।

খসগিরির সবচেয়ে প্রাচীন আর বড় রাজবিহারে আমরা বর্ষাবাসের জন্য উঠলাম। বর্ষাবাসের দুমাসে এখানকার ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়ে গেল। সীতা উপত্যকায় কিন্তু অনেক ভাষা চলে। তাই কোনো একটিমাত্র ভাষায় সব জায়গার কাজ হয় না। বিহারে মধ্যমণ্ডলের প্রাকৃত ভাষা জানা লোকও পেলাম। এখানকার লিপিও প্রায় মধ্যমণ্ডলের মতো। খসগিরি নাম জন্যেই

আমার সন্দেহ হয়েছিল, এ নিশ্চয় খসদের ভূমি। এখানকার কিংবদন্তী সে সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণ করল। আমাদের পূর্বপুরুষ খসরা এক সময় এখান থেকে দক্ষিণের দিকে গিয়েছিল। এখানকার বিহারে কণিকের তৈরি একটি স্তূপ আছে। এতে মনে হয়, কপিশা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত যে ধর্মরাজার কৃতিগুলি দেখেছিলাম তাঁর শাসন এখানেও ছিল। খসগিরি নগরে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অনেক ধুমধাম করে মহোৎসব হয়। সে সময় তথাগতর অস্থিধাতুর শোভাযাত্রা বার হয়। সারা দেশ থেকে লোক আসে সেই অস্থিধাতু দেখতে। বিহারে কয়েকজন চীনা ভিক্ষুর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাঁরা বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বললেন, চীনদেশে বুদ্ধের শাসন প্রসার লাভ করছে, ভারতীয় ভাষা থেকে গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হচ্ছে। এ কথা শুনে আমার চীনে যাবার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠল।

বর্ষাবাস শেষ হলে পরে আবার আমরা অগ্রসর হলাম। সীতা উপত্যকা এক বিরাট দেশ। তার দক্ষিণ, পশ্চিম আর উত্তরে উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যেকার জমি খুব উর্বর। কিন্তু আরও এগিয়ে কয়েকদিন হাঁটার পর কেবল বালি আর বালি। স্থাণ্বীশ্বরের সরস্বতীনদীর মতো সীতা আর আর কত শাখা নদীও এমনি শুষ্ক মরুভূমিতে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। খসগিরি, ইয়ারকন্দ, কুস্তন কিংবা কূচী সবই মরুভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত। তাদের অনেকটা অংশ মরুভূমি থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজা আর প্রজারা মিলে নদী থেকে খাল কেটেছে। খালের জলে সেচ দিয়ে মরুভূমিকে শস্যশ্যামলা ফসলের ক্ষেতে পরিণত করেছে। এখানে মানুষে-মরুতে দারুণ সংগ্রাম। মানুষ যদি এতটুকু শিথিলতা দেখায়, খাল সংস্কার ছেড়ে দেয় তাহলে সন্দেহ নেই, মরুরাক্ষস এইসব শস্যশ্যামলা গ্রাম ও নগর গ্রাস করে ফেলবে। খসগিরি থেকে কিছু দূরে গিয়ে আমরা মরুভূমিতে প্রবেশ করলাম। মরুভূমি পার হয়ে পৌঁছুলাম ইয়ারকন্দ। মরুভূমির পাশেই শুধু নয়, ভেতরেও যেখানে সুযোগ হয়েছে, জনবসতি গড়ে উঠেছে। এদেশে ছোট ছোট গ্রামেও বিহার এবং প্রত্যেক বাড়ির সামনে পূজার স্তূপ। এদেশের লোক ভিক্ষুদের আদর-আপ্যায়ন করে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যাবার সময় মনে হয়, যেন বেড়াতে বেরিয়েছি।

কুস্তনের প্রশংসা আমি আগেই শুনেছিলাম। কুস্তন মানে পৃথিবীর স্তন। নাম শুনে মনে হয়, এখানে এক সময় দুধের নদী বইত। তবে এ দেশ যে এখন

সম্বন্ধ তাতে সন্দেহ নেই। বুদ্ধশাসনের সম্মান খসগিরি থেকেও এখানে বেশি। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো এক জায়গায় নয়, আকাশে ছিটানো তারার মতো এখানে-ওখানে ছড়ানো। এতে প্রমাণ হয়, সাধারণ দস্যুর ভয় নেই এখানে। এখানেও প্রত্যেক বাড়ির সামনে স্তূপ আছে। তবে ছোট—কুড়ি হাতের বেশি উঁচু হবে না। পর্যটক কিংবা ভিক্ষুরা এলে এখানকার লোক মনপ্রাণ দিয়ে অতিথিসৎকার করে। অভ্যাগতদের থাকার জন্য প্রতিটি বিহারের পাশে একটা করে বাড়ি। নগরের গোমতী বিহার বহু পুরনো। এ বিহার রাজকীয়। গোমতী বিহার ছাড়া নগরে আরও তিনটি বড় সংঘারাম আছে। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে নগরটিকে সুন্দর করে সাজানো হয়, রাজপথে জল ছিটানো হয়। নগরের মুখ্য দ্বারে রাজারানী আর তাঁদের পরিচারক এসে বসেন। সেদিন গোমতী বিহার থেকে তথাগতর শোভাযাত্রা বার হয়। বাদ্যভাণ্ড সহযোগে আনন্দমঙ্গল উদ্‌যাপিত হয়। দলে দলে লোক ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে। মূর্তি স্থাপনের জন্য নগরের এক ক্রোশ দূরে তিরিশ হাত উঁচু এক রথ সাজানো হয়। ছোটখাটো একটা রাজপ্রাসাদের মতো এই রথ। রথের ওপর থাকে রেশমের চাঁদোয়া। বহুমূল্য রত্নখচিত রথের মাথায় রেশমের পতাকা ওড়ে। রথের মাঝখানে থাকে তথাগতর মূর্তি। তাঁর দুই পাশে দুই বোধিসত্ত্ব—অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রী। গোমতী বিহার যদিও বিনয়ে সর্বাস্তিবাদী, তবু সেখানে অনেক মহাযানপন্থী ভিক্ষু আছেন। তাই হয়তো বুদ্ধমূর্তির দুপাশে সারিপুত্র আর মৌদ্‌গল্যায়নের মূর্তি না রেখে রাখা হয় দুই বোধিসত্ত্বের মূর্তি। পরিচারক হিসেবে আরও চোদ্দ-পনেরটি দেবমূর্তি রথে থাকে। শিল্পকলার দিক দিয়ে ভারি সুন্দর এই মূর্তিগুলি।

রথ যখন নগরদ্বারের এক শ পা দূরে চলে আসে তখন রাজা তাঁর রাজমুকুট খুলে নতুন সাদা কাপড় পরে হাতে পুষ্পগন্ধ নিয়ে খালি পায়ে রথের ধারে যান। তাঁর পেছনে দুই সারিতে যায় তাঁর পরিচারকবৃন্দ। তথাগতর মূর্তির কাছে গিয়ে রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজা আর পুষ্পবৃষ্টি করেন। রথ যখন সিংহদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করে তখন রথের ওপর রানীরা আর তাঁদের পরিচারিকারা চারদিকে পুষ্পবর্ষণ করেন। গোমতী বিহারের রথের পরদিন আসে অন্য বিহারের রথ। এমনি করে চতুর্দশী পর্যন্ত উৎসব চলে। তারপর রাজারানী প্রাসাদে ফিরে যান।

এদেশের বহু নগরে ভারতীয় নরনারীর দেখা পেলাম। তাদের মধ্যে

অনেকে বহুপুরুষ ধরে এখানে বাস করছে। তারা জানেই না, কবে তাদের কোন্ পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছিল। প্রায় মধ্যমণ্ডলের ভাষার মতোই তাদের ভাষা। মধ্যদেশের অনেক প্রভাব দেখা যায় এখানে। প্রভুকে এরা বলে প্রস্তু, তিনকে বলে ত্রে, ত্রয়োদশকে ত্রোদশ। উপাধিতেও তাদের মধ্যদেশের ছাপ।

কুস্তনে আমরা একমাস ছিলাম। এক সহযাত্রী পেলাম সেখানে। তাঁর নাম সংঘিল। ভিক্ষু সংঘিলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। সংঘিল ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তাই তিনি ভারতে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। আমার কাছে তিনি প্রমাণশাস্ত্রের কিছুটা পড়েছিলেন। সামনের পথযাত্রায় এবার আমরা তিনজনের বদলে চারজন হলাম। এর মধ্যে আমরা জেনে নিয়েছি, সীতানদীর মুখ্য ধারা খসগিরি থেকে পূর্বদিকে উত্তরের পর্বতমালার কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে। সেখানে আছে কূচার নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী। ধর্ম বিষয়ে খুব খ্যাতি আছে এই নগরীর। তখন আবার তুরস্কদের যুদ্ধের খবর আসছিল, তাই আমরা চীনের দিকে যাবার জন্ত উত্তরের পথ না ধরে মরুভূমির পথ ধরলাম। মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে গেছে পথ। দক্ষিণের হিমবান্ থেকে যেসব নদী বেরিয়েছে সেইসব নদীই এই শস্তশ্যামলা দেশের প্রাণ বাঁচিয়েছে। বেশির ভাগই আমাদের মরুভূমি থেকে সরে গ্রামের পথ দিয়ে চলতে হচ্ছে, অবশ্য মরুভূমির মধ্য দিয়েও রাস্তা গেছে কোথাও কোথাও।

পথে দশদিন পর্যন্ত সবুজ গাছপালা দেখতে পেলাম। তারপর সবুজের চিহ্ন মুছে গেল। শীত এসে গেছে। শীতকাল কাজ থেকে বিশ্রামের সময়। তখন উৎসব আর পূজাপার্বণই বেশি। যখন-তখন যুদ্ধের খবর আসে। তাই আমরা আস্তে আস্তে পথ চলতে লাগলাম। এমনি করে একদিন কৃষ্ণানদীর তীরে কৃষ্ণানগরে এসে পৌছুলাম। কৃষ্ণানগরে এসে মনে হ'ল সামনের রাস্তা হয়তো একেবারে বন্ধ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত-না পথের ওপর দেয়াল খাড়া দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গতি রুদ্ধ হবার নয়। চারজন নিয়ে আমাদের এক সৈন্তদল গড়ে উঠেছিল। সশস্ত্র না হলেও আমাদের মধ্যে সাহস কারও কম ছিল না। আমরা চার দেশের চারজন, স্বভাবে পার্থক্য থাকলেও বন্ধুত্বে ফাটল ছিল না। আমি উপাধ্যায়, আর বাকি তিনজন আমার অন্তেবাসী (শিষ্য)। যেখানে মন চাইত, এক সপ্তাহ কি দু সপ্তাহ থেকে যেতাম; আবার মন করলে

চলতে শুরু করতাম। আমাদের তো তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, তাই রোজ এক যোজনের বেশি পথ চলতাম না। আমরা ভেবেছিলাম এমনি করেই হয়তো যুদ্ধটা কাটিয়ে দিতে পারব। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, মহাচীনের পথও খুলে যাবে।

আমরা তখন যে নদীর তীরে ছিলাম সে নদী পূবদিকের এক বিশাল ক্ষারসরোবরে গিয়ে মিশেছে। নদীর তীরে হলুদ সবুজ নানা রঙের স্ফটিক-পাথর পাওয়া যায়। এই পাথর দিয়ে চষক আর অন্যান্য ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর পাত্র তৈরি হয়। নদীর দুই তীরে বহুদূর পর্যন্ত হয় ফসলের ক্ষেত, নয় নলখাগড়ার বন। নগরের সংঘারামে আমরা পনের দিন ছিলাম। এখানেই আমি প্রথম কয়েকটি চীনা পরিবার দেখলাম। আগে শুধু চীনা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীই দেখেছিলাম।

দেশভ্রমণের নেশা আমাদের টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই বিপদ-আপদের কথায় কান দিতাম না। কিন্তু ব্যাপারীরা আমাদের মতো জীবনের প্রতি আসক্তিহীন না হলেও ধনলাভের জন্য বিপদসমুদ্রে পাড়ি দিত। এমন সব সঙ্কটপূর্ণ জায়গা দিয়ে তাদের যেতে হ'ত, যেখানে সশস্ত্র রক্ষীদল ছাড়া এক পা-ও যাওয়া যায় না। এইসব সার্থের সার্থবাহকে কেবল ব্যাপারীদের সর্দারই নয়, সেনাদলের সেনাপতিও হতে হয়। কখনও কখনও তাদের বিরাটসংখ্যক দস্যুর মোকাবিলা করতে হয়। তাতে যুদ্ধের কলাকৌশলও অবলম্বন করতে হয়।

মহাচীনের সীমা আর তার মহাপ্রাচীর এখনও মাসখানেকের পথ। সেখানে একবার পৌঁছুতে পারলে আর ভয় নেই—বিপদ কেটে গেল। কিন্তু তার আগে খুনী যাযাবরদের মাটির ওপর দিয়ে যেতে হবে। সেখানে পদে পদে প্রাণ যাবার ভয়। আমি ভাবতাম, দেশ-দেশান্তরের পণ্যবস্তুতে বোঝাই পশুর দল নিয়ে বণিকেরা চলেছে মহাচীনের পথে, এই পণ্যবস্তুর বদলে সেখান থেকে তারা নিয়ে আসবে বহুমূল্য চীনাংশুক আর অন্য কত জিনিস। অল্প দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করবে। এমনি করে লাভের ধন দিয়ে স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিয়ে সুখে জীবনযাপন করবে। আমরা দেশভ্রমণের নেশায় চলি আর তারা চলে সুখের নেশায়। কিন্তু দুয়েরই পথ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু কণ্টকাকীর্ণ। আর এইজন্যই হয়তো সার্থ আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে। এই চের্চেন নগরে এক সোগ্দী সার্থ বিনা অনুরোধেই আমাদের নিমন্ত্রণ জানাল,

আমরা যেন তাদের সঙ্গে চীন পর্যন্ত যাই। আমি তাকে বললাম: তুমি কি জানো না, পথে অনেক বিপদ আছে?

সে বলল: পৃথিবীতে এমন কোন্ জায়গা আছে, যেখানে বিপদ নেই? কেউ হয়তো ঘরে আরামে রয়েছে, রোগে ধরল কিংবা মাথার ওপরকার শক্ত, মজবুত ছাদ ধসে পড়ল। হয়তো নদীতে স্নান করতে গেছে, ডুবে মরল। যাই হোক, এখানে এই হল কৃষ্ণানদী, আর আমাদের সোগ্দর উত্তরের কৃষ্ণানদী এর চেয়ে কত বড়, কত গভীর, আর কত বিরাট! তাই তার জল দেখায় কালো। এমন নদী হয়তো আপনি কখনও দেখেন নি।

আমি বললাম: না, আমি তোমাদের কৃষ্ণানদী দেখি নি। কৃষ্ণা খুব বড় নদী হতে পারে, তবে হিন্দুদেশের সিন্ধু (হিন্দু), গঙ্গা প্রভৃতি নদীর মতো বড় নয় নিশ্চয়!

—আমি এ কথা মানতে পারি না। চীন থেকে রোমক রাজ্যের সীমা পর্যন্ত আমি বাণিজ্য করতে যাই। কৃষ্ণানদীর মতো এত বড় নদী আমি কোথাও দেখি নি—অবশ্য চীনদেশের পীতনদী (হোয়াং হো) ছাড়া।

—তোমাদের ওখানে বৃষ্টি বোধ হয় খুব বেশি হয় না!

—আমাদের কাংস্তদেশের মতো বৃষ্টি আর কোথায় হয়?

আমি বুঝলাম, সে কখনও অতিবৃষ্টির দেশে যায় নি। আমার যাত্রাপথে আমি দেখেছি, যে দেশে কম বৃষ্টি হয় সে দেশে লোকে মাটির ছাদ তৈরি করে। কাশী আর পাটলিপুত্রের দিকে মাটির ছাদ দেখা যায় না। সেখানকার বৃষ্টিতে মাটির ছাদ একদিনও টিকতে পারে না।

সার্থবাহকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমাদের ওখানে ঘরের ছাদ বোধ হয় এখানকার মতো মাটির, তাই না? আর তা-ও বোধ হয় দু-তিন আঙুলের বেশি মোটা নয়!

—হ্যাঁ, আমাদের ওখানে সাধারণ লোকের ঘরের ছাদ মাটির। দু-তিন আঙুলের বেশি মোটা হয় না। তবে ধনী লোকেরা পাথর কিংবা অন্য জিনিস দিয়ে ছাদ তৈরি করে।

—জানো, গঙ্গানদী এমন সব দেশের মধ্য দিয়ে গেছে, যেখানে ভয়ঙ্কর বৃষ্টির জন্য মাটির ছাদ একদিনও টিকতে পারে না। তোমাদের দেশে বরফগলা জলের ওপরই নদীগুলিকে নির্ভর করতে হয়, আর সেখানে বছরে তিন মাস আকাশ থেকে সমানে জল ঝরে।

সার্থবাহ বুঝল, আমি দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছি, অনেক দেখেছি। তাই সে আমার কথার আর প্রতিবাদ করল না। সঙ্গীদের পরামর্শমতো গোপ্তী সার্থবাহের সঙ্গে আমরা চীনদেশে যাব ঠিক করলাম।

পাঁচ-ছ'দিন চলার পর মরুভূমি। মরুভূমির ওপর দিয়ে একা যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা সার্থের সঙ্গে যাব ঠিক করেছিলাম। ক্ষারসরোবর পর্যন্ত পথ কৃষ্ণানদীর ধারে ধারে। ক্ষারসরোবরের পাশে বড় একটা নিগম আর দুর্গ পেলাম। আগে কিছুদূর পর্যন্ত সরোবরের উত্তর দিক দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সেখানকার মাটি বালুকাময়। নোনা জলে কি মানুষ, কি পশু কারও পিপাসা মেটে না, তাই সার্থ এমন জায়গায় থামত, যেখানে মিষ্টি জলের কুয়ো আছে। আমি ভাবতাম, এই মরুভূমির অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে মিষ্টি জল আসবে কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হ'ত, মিষ্টি জল যদি না-ই থাকবে তাহলে এখান দিয়ে পথ যাবে কেন। ক্ষারসরোবরের আগে প্রায় মাসখানেকের রাস্তা এমনি মরুভূমির ওপর দিয়ে। শীতকাল, তবু রোদ্দুরে খুব পিপাসা পেত। তাই সার্থ কেবল রাত্রেই পথ চলত। সারাটা দিন পশু-প্রাণীরা কোনো কুয়োর ধারে পড়ে থাকত।

মরুভূমি সম্পর্কে নানারকম গল্প শুনলাম। হাজার বছর ধরে যত মানুষ হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে এই মরুভূমির ওপর দিয়ে গেছে তাদের মধ্যে বহু মানুষ এখানে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তারা ভূত হয়ে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথিক যারা আসে তাদের তারা মেরে ফেলে দলে টানতে চায়। আমাদের সার্থবাহ আর অন্তরা তাই গম্ভীর স্বরে আমাদের বলল: সার্থ ছেড়ে আগে-পিছে থাকবেন না। রাতের বেলা মরুভূমিতে একবার পথ ভুললে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভূতেরা সব সময় মানুষ তাক করে থাকে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কাছে ডেকে নেয়। মনে হয়, আমাদের সার্থেরই কেউ। সবাই তাই গায়ে গা লাগিয়ে চলবেন।

তারা বলল: মরুভূমির ভূত কেবল রাত্রেই নয়, দিনেও এবং একা নয়, জন পঞ্চাশেক—বাজনা বাজিয়ে আসে। বলে, 'ভয় পেয়ো না', 'ভয় পেয়ো না'। তারপর পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায়; মাংস খেয়ে হাড় ফেলে দেয়।

রাস্তায় বহু পশুর কঙ্কাল আর কয়েকটা নরকঙ্কাল দেখতে পেলাম। সঙ্গীরা বলল, ভূতে খেয়েছে। আমার সঙ্গী ভিক্ষুরা রাত্রিবেলায় মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে পথ চলতেন, আর আমি কোনো সূত্র পাঠ করতাম। জানি না, সে

ভূত তাড়ানোর জন্য, না পথশ্রম লাঘব করার জন্য। সূর্যাস্তের সময় গোটা পৃথিবী যখন সারা রাত্রি ধরে বিশ্রামের কথা চিন্তা করত, আমরা তখন যাত্রা আরম্ভ করতাম। প্রতি রাত্রির পথ চলা শেষ হলে পথপ্রদর্শক কিছু চিহ্ন রেখে দিত, যাতে আমরা বুঝতে পারি, কোন্ দিকে আমাদের যেতে হবে। মরুভূমির কোনো দিক নেই, চারদিকই এক রকম—বালি আর বালি। বালির সমুদ্র। সমুদ্রে যেমন ধ্রুবনক্ষত্র কিংবা অন্য কোনো তারা দিয়ে দিক্‌নির্ণয় করা হয় তেমনি এই মরুভূমিতেও।

সূর্যোদয়ের আগে, কখনও-বা তারও আগে, সামনের মিষ্টি জলের কূয়োর ধারে আমরা পৌঁছে যেতাম। সার্থ কখনও পথপ্রদর্শকের কথা লঙ্ঘন করত না। বড় সম্মান তাদের। যেখানে তারা থামতে বলত সেখানেই সমস্ত পশু-প্রাণী থেমে পড়ত। সামনে মিষ্টি জলের কূয়ো কত দূর তা-ও কেউ জিজ্ঞাসা করত না।

কারসরোবরের দূর্গ থেকে যাত্রা করে দশ দিন পর আমরা এক নদীর তীরে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে শিবির স্থাপন করা হ'ল। এমন সময় কয়েকজন পলায়নরত নরনারী আমাদের কাছে এসে বলল: তুরুস্করা নগরের পর নগর লুট করছে। আগুন জ্বালাচ্ছে। ভীষণভাবে মারধোর করছে। অবারদের আমরা প্রভূ বলে মানতাম, এখন তুরুস্কদের মানতে রাজী আছি। কিন্তু তারা কোনো কথাই শুনতে চায় না।

খবর শুনে সার্থবাহ তার লোকজন ডেকে সলাপরামর্শ করল। আমাকেও জিজ্ঞাসা করল। প্রাণসংশয় না হলে সার্থ কখনও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এখন তো ধনপ্রাণ সবই যাবার পথে। তাই ঠিক হ'ল, পশ্চাদপসরণ করতে হবে। পশ্চাদপসরণ করে পাচ ক্রোশ দূরের সেই ছেড়ে-আসা কূয়োর ধারে সেইদিন দুপুরেই আবার আমরা ফিরে এলাম।

এই প্রত্যাবর্তন আমার কাছে একেবারে দিক্‌পরিবর্তনের হেতু হ'ল। চীনে যাবার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হ'ল—অন্তত যতদিন-না তুরুস্করা দৃঢ়ভাবে তাদের রাজ্য স্থাপন করতে পারে। আগের রাস্তা দিয়েই আবার আমরা কৃষ্ণানদীর তীরে সেই নগরে ফিরে এলাম, যেখানে আগে কিছুদিন ছিলাম। আমার মনে হ'ল, কুস্তন থেকে কূচা যাবার পথ হয়তো খোলা আছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কূচায় এখন শান্তি বিরাজ করছে, কোনো গোলমাল নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা কুস্তন রাজবিহারে ফিরে এলাম। আগের বার আমরা

রথোৎসব দেখতে পাই নি। তাই আমি খেয়াল রেখেছিলাম, যাতে আষাঢ় মাস শুরু হবার আগেই আমরা কুস্তন পৌঁছুতে পারি।

রাজধানী থেকে দেড় ক্রোশ পশ্চিমে 'নতুন রাজবিহার'। আমরা সেখানে থাকব ঠিক করলাম। নতুন মানে, নতুন তৈরি নয়। তবে গোমতী বিহারের চেয়ে নতুন নিশ্চয়। প্রায় আড়াই শ বছর আগে এক রাজা এই বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর দশ-এগারজন রাজা এসেছেন, গেছেন। বিহারের চৈত্য আড়াই শ হাত উঁচু, সোনা-রূপোর সুন্দর কারুকার্য করা। এর নির্মাণ-কার্যে বহুমূল্য সব জিনিস অকৃপণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই মহাচৈত্যের পেছনে প্রতিমাগৃহ। প্রতিমাগৃহটিও সমান সুন্দর। তার স্তম্ভ, দ্বার, গবাক্ষ সবই স্বর্ণমণ্ডিত। ভিক্ষুদের আবাসগুলিও সুরুচি আর মুক্তহস্তে অর্থ-ব্যয়ের পরিচয় বহন করছে।

এখানকার রাজাদের নামের আগে বিজয় কথাটা থাকে। আমরা যখন এখানে আসি তার পাঁচ শ বছর আগে রাজা বিজয়সম্ভব এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অভিষেকের পঞ্চম বর্ষে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর গুরু ভিক্ষু বৈরোচন ভারতীয় লিপি থেকে অক্ষর তৈরি করেছিলেন, যা আজও কুস্তনী ভাষা লিখতে ব্যবহার করা হয়। এখানে রাজকুমার আর রাজকুমারীরাও ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হয়ে সংঘে প্রবেশ করে। এখানকার লোকের ওপর তথাগতর ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। তাদের ব্যবহার সুন্দর। তারা ন্যায়নিষ্ঠ, সাহিত্যানুরাগী। মেলা-উৎসবে তাদের আনন্দ, নৃত্যগীতে তাদের গভীর অনুরাগ। কয়েক শতাব্দী আগে চীনের এক রাজকন্যা বিবাহ করে এখানে এসেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এ দেশে চীনাংশুকের প্রচার করেছিলেন।

তের

চার মাস কুস্তনে থেকে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে আমার ধারণা হয়েছিল যে, তাদের মতো অতিথিবৎসল আর মধুরস্বভাবের লোক আর কোথাও নেই। কিন্তু কুচীতে এসে দেখলাম, এ দেশের লোকও কিছু কম যায় না। আতিথেয়তায় আর মধুর ব্যবহারে এ দেশের লোকেরাই বরং অদ্বিতীয়। খসগিরি থেকে সীতানদী হয়ে সহজেই কুচীতে যাওয়া যায়। কিন্তু কুস্তনবাসীরা কুস্তননদীর ধারে ধারে মরুভূমির ভেতর দিয়ে সীতা আর কুস্তননদীর সংযোগস্থলে পৌঁছুনোর অন্ত এক রাস্তা করে নিয়েছে। এখানকার লোকেরা রাজধানীর নাম অনুসারে নদীর নাম রাখে। তাই কুস্তননগর নাম অনুসারে কুস্তননদী। বিদ্যা ও বৈভবে কাংস্যদেশের সবচেয়ে বড় নগর কুস্তন। কুস্তননদী রাজধানী থেকে সোজা উত্তরের দিকে বয়ে গেছে। নদীর জলধারা ধরে পুরো একটা দিন হাঁটলে দুধারে দেখা যাবে অনন্ত বালিরাশি। বালি চাইছে নদী শুকিয়ে ফেলতে আর নদী তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে উত্তরাভিমুখে এগিয়েই চলেছে! বালি আর নদীর এই অবিরাম সংগ্রামে মানুষ তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। নদী থেকে খাল কেটে এনে বহু পতিত জমি চাষ-আবাদের উপযুক্ত করে তুলেছে। কুস্তননদীর জলধারা সম্মুখপথে ক্রমশ ক্ষীণ হয়েছে। শেষে যেখানে ইয়ারকন্দনদীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে আরও শীর্ণকায়া হয়েছে। এই সঙ্গমস্থল থেকেই কুস্তননদীর নাম হয়েছে সীতা। তার অপর নাম তরিম। এখান থেকে উত্তরে দেখা যায় হিমাচ্ছন্ন শৈলশিখর, দক্ষিণে অনন্ত মরুভূমি। উত্তরের পাহাড় থেকে নেমে এসে শ্বেতনদী (অক্-স্থ্) যেখানে সীতানদীর সঙ্গে মিশেছে সেই সংযোগস্থলে আমরা নদী পার হলাম। নদীর তীরে তীরে এগিয়ে চললাম। মূল ধারা থেকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই মরুভূমি দূরে সরে যাচ্ছে। এমনি করে করে আমরা এলাম বালুকানগরীতে। বালুকানগরী থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বণিক্-পথ দুর্গম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের মতো বিশাল এক সরোবরের ধারে চলে গেছে। এমন শীতের জায়গাতেও শীতকালে এই সরোবরে জল জমে না। তাই লোকে এর নাম দিয়েছে তপ্ত সরোবর। বড় রমণীয় এই সরোবর। কিন্তু আমাদের যেতে হবে কুচীনগরী। তাই তপ্ত সরোবর দেখার ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। বালুকানগরী আর তার আশপাশের জনপদ অন্ত এক রাজার অধীন। কুচীজাতিকে হীনবল করবার জন্ত চীন

দেশটাকে দু ভাগে ভাগ করেছিল। নইলে আগে এ এক অখণ্ড কূচীরাজ্যই ছিল।

বালুকাপুরীর বিহারে পাঁচ-সাত দিন থাকার পর আমরা পূর্বদিকে যাত্রা করলাম। বাঁ দিকে উত্তরের পাহাড়টা আমাদের একেবারে কাছে মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে মোটেই কাছে নয়। শরৎ আর হেমন্তের নির্মেঘ আকাশের পটভূমিতে বহুদূরের জিনিসকেও কাছের বলে ভ্রম হয়। বালুকাপুরী থেকে কূচী নগরী এক শ ক্রোশের বেশি হবে না। কিন্তু আমাদের তাড়া ছিল না বলে এক মাসে পৌঁছুলাম সেখানে। তখন অঘ্রাণ মাস শেষ হয়ে গেছে, শরতের পরে হেমন্ত শুরু হয়েছে। আমরা তখন একবারও ভাবিনি যে, এদেশে আমাদের দু-দুটো বছর থাকতে হবে। এদেশে প্রচুর ধান, গম আর বাজরা হয়। তার চেয়েও বড় কথা, এদেশ দ্রাক্ষা, ডালিম, খোবানি, নাসপাতি প্রভৃতি ফসলের জন্য প্রসিদ্ধ। সোনা, তামা, লোহা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু এখানকার উত্তরের পাহাড়ে পাওয়া যায়। দেশ সমৃদ্ধ হবার এ-ও এক প্রধান কারণ। এদেশের মতো সুশিক্ষিত, বিদ্যানুরাগী আর সত্যনিষ্ঠ লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নৃত্যগীত আর বাদ্যে এমন কুশলী শিল্পী আর কোথাও দেখা যায় না। চীনের রাজদরবারে তাই এখানকার শিল্পীদের বড় চাহিদা। এখানকার লোকেদের চেহারায় একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের মাথার পেছন দিকটা বেশ চ্যাপ্টা। লোকে বলে, মা তার সদ্যোজাত শিশুর মাথা চেপে চেপে এমন চ্যাপ্টা করে তোলে।

রাজধানীতে এত দেরি করে পৌঁছুনোর একটা ফল হ'ল এই যে, আমাদের আসার খবর সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ভারতীয় পণ্ডিতভিক্ষুর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। কূচীদেশে এক শ'রও বেশি সংঘারাম আছে। সব মিলিয়ে ভিক্ষুর সংখ্যা হবে পাঁচ হাজারেরও বেশি। তাঁরা বেশির ভাগই রাজধানীর আশেপাশের বিহারে থাকেন। রাজবিহার এখানকার সবচেয়ে বড় আর সমৃদ্ধ বিহার। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। মহাযান তার ভিক্ষুদের মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু সর্বাস্তিবাদ, মহাবিহার আর অন্য প্রাচীন হীনযান নিকায়ের বিনয়ে ত্রিকোটি-পরিশুদ্ধ মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়। খাবার জন্য যে পশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় নি তারা তাকে অন্নের সমান মনে করে। বহু বিহার মহাযান গ্রহণ করার পর যেমন মাংস বর্জন করেছে, কূচীর বিহারগুলি তা করে নি। এখানকার ভিক্ষুদের আহার্যের মধ্যে

মাংসও আছে। বিনয় পালনেও এখানকার ভিক্ষুরা বেশ তৎপর। নগর থেকে ছ যোজন দূরে পাহাড়ের ধারে দুটি প্রাচীন সংঘারাম আছে। সংঘারাম দুটিতে খুব সুন্দর সুন্দর বুদ্ধপ্রতিমা আছে। পূর্ব বিহারের উপস্থানশালায় হলুদ রঙের এক পাথর আছে। পাথরের ওপর চোদ্দ আঙুল লম্বা আর ছ আঙুল চওড়া বুদ্ধের চরণচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। আমরা চরণচিহ্ন দর্শন করতে গেলাম। সিংহলের এক পর্বতশিখরে তথাগতর এমনি চরণচিহ্ন আছে শুনেছিলাম। সেখানে আমরা যাবও ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এক দুর্ঘটনার জন্য শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। বুদ্ধিল বলেছিলেন, অতি প্রাচীনকালে তথাগতর প্রতিমা তৈরি হ'ত না। লোকে তখন চৈত্য, পীঠাসন কিংবা বোধিবৃক্ষের পূজা করত। হয়তো সেই সময়ই চরণপূজা শুরু হয়েছিল। মূর্তিপূজা শুরু হয়েছিল কণিষ্কের সমসাময়িক কালে। তাই এখানে তথাগতর শ্রীপাদ দেখার পর আমার মনে হ'ল, হয়তো এদেশে এ-ই সবচেয়ে প্রাচীন পূজা—প্রতীক। কিন্তু যে মহার্ঘ আর দুর্লভ পাথরে শ্রীপাদ অঙ্কিত আছে তাতে ভয় হয়, এর ওপর আবার কারও লোভাতুর দৃষ্টি না পড়ে।

রাজধানীর পশ্চিমদ্বারের বাইরে রাস্তার দু পাশে ষাট হাতেরও বেশি উঁচু বুদ্ধের দুই বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব হয়ে থাকে। এই মহোৎসব শরৎপূর্ণিমার সময় দশদিন ধরে চলে। তাতে সারা দেশের নরনারী এসে মিলিত হয়। এমনিতে প্রতি বছরই দশদিন ধরে উৎসব হয়। কুস্তনের মতো এখানেও রথের ওপর বুদ্ধমূর্তি বসিয়ে প্রত্যেক সংঘারাম থেকে শোভাযাত্রা বার করা হয়। এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে নদীর ধারে আশ্চর্যবিহার। কূচীদেশের ভিক্ষুরা নিজেদের ভাষা ছাড়া জম্বুদ্বীপের ভাষাতেও ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেন। এখানে কেবল পিটকই নয়, পাণিনির ব্যাকরণসূত্র আর ব্যাকরণ মহাভাষ্যের মতো গ্রন্থেরও ভালোরকম পঠনপাঠন হয়। মধ্যমণ্ডলের বিহারগুলির বাইরে আর কোথাও কিন্তু এমনটা দেখা যায় না। এ থেকেও এখানকার ভিক্ষুদের বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণেই দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এখানে বিনয় পিটক আর অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসে।

কূচীকে কুচী কিংবা কুশও বলা হয়। আসলে এখানকার লোকেরা চ আর শ-য়ের উচ্চারণভেদ ঠিকমতো করতে পারে না।

কূচীদেশের লোকেরা খেলাধুলো আর আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়েই জীবন

অতিবাহিত করে। একদিকে তারা যেমন বিলাসী, অন্যদিকে তেমনি মস্ত বীর। নগর-গ্রাম নির্বিশেষে এদেশের সমস্ত যুবক আর প্রৌঢ়ই যোদ্ধা।

কুচীপুরীতে থাকার সময়েই আমি এখানকার এক মহাপণ্ডিত কুমারজীবের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছিলাম চীনে গিয়ে। প্রায় দু শতাব্দী আগে এই মহাপুরুষ এই কুচীনগরীতে এক রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃভূমি কাশ্মীর আর কুচীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েছিলেন। কুচী মহারাজার গুরু হয়ে তিনি কুচীদেশেই ছিলেন। তাঁর খ্যাতি চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনের রাজা তাঁকে এমনিতে না পেয়ে যুদ্ধ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুমারজীব আমাদের বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন চীনা ভাষায়। চীন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যের সম্মান দিয়েছে।

কুচীদেশের লোকেরা সংগীত আর নাট্যানুরাগী। তাই তারা নিজেদের ভাষায় অনেক নাটক লিখেছে। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদও করেছে অনেক। 'নন্দ প্রব্রজন', 'নন্দ বিহার পালন' প্রভৃতি নাটক আছে কুচীভাষায়। মৈত্রেয় বুদ্ধের জীবননাটক মহোৎসবের সময় বেশ কয়েকদিন ধরে অভিনীত হয়।

রাজবিহার আর আচার্যবিহার দুইয়েরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আচার্যবিহারে আমি সেখানকার ভিক্ষুদের অনুরোধে একটা বর্ষাবাসও করেছিলাম। ভিক্ষুদের ইচ্ছা ছিল, আমি সেখানেই থেকে যাই। কিন্তু যে-যাত্রার সংকল্প আমি করেছি, এত শিগ্‌গির তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে আমার মন চাইছিল না। কুচীদেশে আর-এক প্রথা আছে—এখানে অল্প সময়ের জন্য ভিক্ষু হওয়া কিংবা একাধিকবার গৃহস্থ থেকে ভিক্ষু আবার ভিক্ষু থেকে গৃহস্থ হওয়া যায়। এই প্রথা প্রথমে আমার ভালো লাগে নি। আমার মনে হয়েছিল, এখানকার আমোদপ্রিয় লোকেরা তাদের জীবন নিয়ে যেমন খেলা করে, এ-ও তেমনি। কিন্তু প্রব্রজ্যা নিয়ে খেলা করা মোটেই উচিত নয়।

এখানকার ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা নিয়ে কেন খেলা করেন তা জানতে আমার দেরি হ'ল না। সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার সবকিছুই তাঁদের আছে। সেরকম মনও আছে তাঁদের। এখানকার লোকেদের যদি কিছু অজানা থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে দুঃখপ্রকাশ। অন্যের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে তাঁদের আত্মসম্মানে লাগে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানকার লোকেরা

চারদিকে কেবল আনন্দ আর উৎসবই দেখে। তারা মনে করে, জীবন দুঃখের জন্য নয়, আনন্দের জন্য। আর তাই বোধ হয় তারা এত তাড়াতাড়ি সর্বাস্তিবাদী হীনযান থেকে মহাযানে চলে এসেছে। মহাযানে জীবনটাকে উপভোগ করার সুযোগ আছে অনেক। এখানকার, বিশেষ করে আশ্চর্যবিহারের ভিক্ষুরা বিনয়ের নিয়মপালনে বড় কঠোর। কিন্তু যখনই সে নিয়ম পালন করতে তাঁরা অসমর্থ হন তখনই চীবর ছেড়ে গৃহস্থ হয়ে যান। আসলে অপ্সরা আর দেবকন্যাদের দেশ প্রব্রজ্যার জন্য নয়। তবু এখানে যে পাঁচ হাজার ভিক্ষু আছেন তাতে মনে হয়, এদেশের লোকের ওপর তথাগতর উপদেশের প্রভাব পড়েছে অনেক।

আমি শুনেছিলাম, কুমারজীবের পিতা কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভিক্ষু। এখানে এসে রাজার সান্নিধ্যে থাকতে লাগলেন। রাজকন্যার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চীবর ছেড়ে গৃহস্থ হলেন। এখানে এটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যেখানে সুন্দরীদের খনি রয়েছে, মুক্ত স্বচ্ছন্দ সমাজের চারদিকে প্রেমের অবিরল ধারা বইছে, কুমারজীবের পিতার মতো লোকেদের সেখানে এরকম না করাই আশ্চর্য। আমারও ভয় হচ্ছিল। কিন্তু আমার সম্মুখে বিরাট এক উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য দৃঢ় করতে বুদ্ধিল আমাকে সাহায্য করেছিলেন। যদি আমি সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হই তাহলে তা হবে বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

বহ্লীক ভিক্ষু রেবত ছিলেন প্রতিভাশালী তরুণ। লেখাপড়ার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। আর তাই তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহুগুণসম্পন্ন। অসাধারণ সুন্দর। বহ্লীকদেশের এক কুষাণ সামন্ত-কুলে তাঁর জন্ম। মা-বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বছর কয়েক আগে ভিক্ষু হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে দেশপর্যটনের পিপাসা ছিল। কিন্তু যদি এই পিপাসার বেগ প্রতিরোধ করার মতো অন্য কিছু না থাকত তাহলে হয়তো তাঁকে আমার হারাতে হ'ত না।

রেবতের বংশানুক্রমিক বসবাস ছিল কাংজদেশ আর কূচীদেশের খুব কাছাকাছি। কুষাণরা যে আসলে কূচীদেশেরই অধিবাসী, এ সত্য তাঁর জানা ছিল। তাই কূচীতে এসে এ দেশের প্রতি তিনি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলেন। কূচীবাসীদের সম্বন্ধে জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। কূচীদেশের তরুণতরুণীরা রূপে-রঙে অসাধারণ সুন্দর। রেবত কূচী-রাজধানীর যে কোনো

মুন্দর তরুণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারতেন। ভিক্ষুর চীবর তাঁর সৌন্দর্যে বাধা সৃষ্টি করে নি। রূপ-রঙে তিনি কূচীদের মতোই কাঞ্চনবর্ণ ছিলেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল অতিনীল। দেহ যেন ছাঁচে ঢালাই করা। ছাই যেমন আগুন ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে তেমনি তাঁর অঙ্গের অতি সাধারণ কাপড়ের চীবর তাঁর রূপ ঢেকে রাখার চেষ্টা করত। তিনি যখন চীবর পরে সংঘাটী দিয়ে দেহ আবৃত করে হাতে লোহার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কোনো বীথিতে ভিক্ষা করতে যেতেন, শত শত অতৃপ্ত চোখ তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। চার-পাঁচ ঘর যেতে-না-যেতেই ভিক্ষাপাত্র ভরে উঠত। আমি জানতাম, এর ফল ভাল হবে না। তাই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। তাঁরও ইচ্ছা ছিল, কূচী-রাজধানী ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু তখনও যে চীনের পথ পরিষ্কার হয় নি।

রেবতের মনে কুষাণদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ এত প্রবল হয়ে উঠল যে, তিনি কূচীর এক রাজমন্ত্রীর কাছে গেলেন। রাজমন্ত্রী এখানকার সামন্তদের মধ্যে তাঁর কুল আর বহুজ্ঞতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বললেন, কূচা আর কুষা একই শব্দ; কুষাণরা মূলে এই দেশেরই অধিবাসী ছিল। আরও বললেন, এ দেশ আমাদের বংশেরই এক শাখা খসদের হাতে ছিল। এই খস থেকেই আমাদের এক নগরের নাম হয়েছে খসগিরি। ছ-সাত শ বছর আগে যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা এখান থেকে এক মাসের পথে উত্তরে আর পূর্বে ছড়িয়ে ছিল তখন আজকের অবার আর তুরকদের পূর্বপুরুষদের বলা হ'ত হূণ। তারা খুব দুর্ধর্ষ ছিল। তাদের আক্রমণের রূপ ছিল ভয়ংকর। হ্যাঁ, শকদেরই একটি শাখা কুষাণ। আমাদের উত্তরের পাহাড়গুলিতে যেসব শক থাকত, আগে তাদের বলা হ'ত বুসুন। চীনের লোকেরা নগর আর গ্রামের শান্ত, অচঞ্চল জীবন গ্রহণ করে কোমল প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রায়ই তাদের হূণদের শিকার হতে হ'ত। হূণ-আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চীন হাজার ক্রোশ লম্বা মহাপ্রাচীর তৈরি করেছিল। এক সময় চীন হূণদের সম্পূর্ণরূপে দমন আর বিধ্বস্ত করতে সফল হয়েছিল। সে সময় হূণরা নিজেদের আদিভূমি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যাযাবর জীবন সরোবরের বদ্ধ জল নয়, নদীর প্রবহমান স্রোতোধারা। প্রবাহিত হওয়াই তার জীবনের ধর্ম। নদী যদি একপথে বাধা পায় তাহলে অন্য পথ নেয়। তেমনি হূণরা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হবার পর আমাদের দেশে এল। শকদ্বীপের সুন্দর

চারণভূমিতে শুরু করে দিল নরসংহার, আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেককে করল বিতাড়িত। এই বিতাড়িত শকদের মধ্যেই ছিল কুষ অর্থাৎ কুষাণ। তারা অন্য অনেক দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজমন্ত্রীর কথায় রেবতের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হ'ল। রেবত আগের চেয়ে আরও বেশি করে তাঁর বাড়ি যেতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে মনে হতে লাগল, রাজমন্ত্রীর কোনো হারানো ছেলে যেন অনেকদিন পরে নগরে ফিরে এসেছে। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ল। প্রায়ই আমরা মন্ত্রিগৃহে নিমন্ত্রিত হতে লাগলাম। যেখান থেকে আমাদের জন্য আহার্য ও পানীয়ও আসতে লাগল অনেক সময়।

মন্ত্রী ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তথাগতর অনুশাসনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর এক কন্যা ছিল নবোদ্ভিন্নযৌবনা, কুচী-রাজধানীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। বহুবার সে তার মা'র সঙ্গে আমাদের বিহারে এসেছে পূজা আর সাংঘিক দান দেবার জন্য। এমনি করে একটি বছর কেটে গেল। কুচীবাসীদের সম্বন্ধে রেবতের যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। যদি তাঁর যাবার ইচ্ছা থাকত তাহলে তখনি আমরা পূর্বদিকে রওনা হয়ে যেতাম।

আমি আগেই বলেছি, কুচীবাসীরা নৃত্যগীত আর নাট্যানুরাগী। এমন কোনো তরুণ-তরুণী নেই যে বিভিন্ন কলাবিদ্যা অভ্যাস করে না। মন্ত্রিকন্যা কেবল সৌন্দর্যেই নয়, এইসব কলাবিদ্যাতেও ছিল অসাধারণ পারদর্শিনী। তার শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেল পরের বছর মহোৎসবের দিন। বার্ষিক মহোৎসবের সময় কয়েকদিন ধরে রাত্রে অভিনয় হচ্ছিল। 'নন্দ প্রব্রজন' নাটকের অভিনয়। মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ মহাকাব্য অবলম্বনে কোনো এক কবি কুচীভাষায় এই নাটক রচনা করেছিলেন। তথাগতর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ ছিলেন অসাধারণ সুন্দর। তাঁর পত্নী নন্দা সমগ্র শাক্য গণরাজ্যের জনপদকল্যাণী—সর্বসুন্দরী। এই নবদম্পতির মধ্যে ছিল অসাধারণ প্রেম। এমন সময় সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম আপন জন্মভূমি দেখতে কপিলবস্তু এলেন। নন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করা আপন কর্তব্য মনে করলেন। তিনি সিদ্ধার্থের সেবা করলেন। সিদ্ধার্থ সেবার প্রতিফল দিতে চাইলেন। একদিন নন্দ সম্মান প্রদর্শনের জন্য অন্যদিনের মতো বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়েছিলেন। কেন কে জানে, বুদ্ধের মনে হ'ল, এই হাতদুটি ভিক্ষাপাত্রেরই যোগ্য। নন্দপত্নী তখন ঘরের ছাতে ভিজে চুল শুকোনোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর এক সখী এসে জানাল : দেখো, তোমার নন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে তথাগতর পেছন পেছন চলেছেন।

নন্দা ছাদের ওপর থেকে ঝুঁকে দেখলেন। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। নন্দ মনে মনে চাইছেন, বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাপাত্র ফিরিয়ে নিন আর তিনি ঘরে ফিরে যান। কিন্তু বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র চাইছেন না। তিনি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পশ্চাতে নন্দ। নন্দা এ দৃশ্য দেখে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে উঠলেন : আর্যপুত্র, শীঘ্র চলে আসুন।

কিন্তু আর্যপুত্র এলেন না। চিরদিনের জন্ত তিনি অগ্রজের পথ গ্রহণ করলেন।

এই দৃশ্যের অভিনয়ই সেদিন হচ্ছিল। মন্ত্রিকন্যা হয়েছিল নন্দা। নাটক অন্তিম বিয়োগে পৌছুলে তার অভিনয় উঠল চরমে। সহস্র দর্শকমণ্ডলীর চোখে অশ্রুধারা, অভিনেত্রী স্বয়ং জ্ঞান হারিয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর পড়ে গেছে। ভিক্ষুরা সাধারণভাবে নৃত্য আর নাটক দেখতে যান না। কিন্তু এ তো তথাগত আর তাঁর শ্রাবকের জীবনকাহিনী। তাই এ নাটক দেখায় তাঁদের আপত্তি ছিল না। রঙ্গমঞ্চের কাছে বহু ভিক্ষু বসে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রেবতও ছিলেন। সেদিন তিনি মন্ত্রিকন্যাকে ভালো করে দেখলেন। সেদিন সেই করুণতম মুহূর্তে তার সৌন্দর্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল।

রেবত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আকৃষ্ট হলেন। মন্ত্রিকন্যা আগেই মুগ্ধ হয়েছিল। কূচীদেশে ভিক্ষুদের চীর-চীবর ছেড়ে গৃহস্থ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আর এ জন্ত সেই তরুণী কিংবা তার পরিবারের কাউকে লজ্জিতও হতে হয় না।

মন্ত্রিকন্যা আর রেবতের পরবর্তী প্রেমোপাখ্যান খুবই সংক্ষিপ্ত। মন্ত্রি-কন্যার পিতামাতা তাদের প্রেমের কাহিনী শুনে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। তাঁরা যোগ্য পুত্র পেয়েছেন। রেবত একদিন অশ্রুসজল চোখে সসঙ্কোচে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ভিক্ষুজীবনের অবসান ঘটানোর অনুমতি চাইলেন। চীবর ছেড়ে তিনি মন্ত্রীর গৃহ-জামাতা হলেন।

সুমন ছিলেন কম্বোজনিবাসী। উদ্যানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমার কাছে যে জ্ঞানভাণ্ডার ছিল তার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অন্যসব দেশের মতো আমাদের দেশেও বহু ভিক্ষু অল্পবিস্তর চিকিৎসাশাস্ত্র

অধ্যয়ন করেন। যেখানে ভৈষজ্যগুরু হিসাবে তথাগতর মূর্তি স্থাপিত রয়েছে এবং লোকে ভক্তিভরে ভৈষজ্যগুরুর পূজা করে সেখানে ভৈষজ্য-শাস্ত্রের প্রতি ভিক্ষুদের আকর্ষণ থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কারও দুঃখে যথাশক্তি সাহায্য করাকে ভিক্ষুরা আপন কর্তব্য বলে মনে করেন। সেই কারণেও স্থমন ভৈষজ্যশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের সময় এই বিদ্যার সাহায্যে আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণ দুই-ই করা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকলেই আর কিছু সবাই কুশল বৈদ্য হতে পারেন না, অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগবুদ্ধিও থাকা চাই। সে বুদ্ধি স্থমনের যথেষ্ট ছিল। কূচী নগরীতে পৌঁছুনোর আগেই তিনি কয়েক জায়গায় তাঁর চিকিৎসার আশ্চর্যরকম সাফল্য দেখিয়েছিলেন। রাজধানীতে পৌঁছুনোর পর তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। এক বছরের নিবাস শেষ হতে হতেই আমরা রেবতকে হারালাম আর এরই মধ্যে স্থমন এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য হয়ে উঠলেন। সাধারণ বৈদ্যের মতো তিনি চিকিৎসা করতেন না। মনে হ'ত, তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে এক পবিত্র সাধনায় রত হয়েছেন। কোথাও কারও অসুখের সংবাদ শুনলে না ডাকলেও তিনি সেখানে ছুটে যেতেন।

একদিন এক অস্থি-কঙ্কালসার বৃদ্ধ তাঁর কাছে এসে আত্মসংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেলল। তার কন্যা মুমূর্ষু। স্থমন তখনই চললেন বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধের ঘর নগরীর অপর প্রান্তে। সেখানকার ঘরগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয়, লক্ষ্মী সেখান থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। লুণ্ঠতরাজের রাজত্বে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। তুর্কদের আক্রমণের খবর শুনে বহু অবার এদিক দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় নগরপ্রান্তে অবস্থিত এইসব ঘরবাড়ি নিষ্ঠুরভাবে লুঠ করেছে, বহু লোককে মারধোর করেছে। এখানকার অধিকাংশ লোক তখনই নিঃস্ব হয়েছিল। এই বৃদ্ধও তাই। বৃদ্ধের জোয়ান ছেলে অবারদের তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। অবাররা তার ঘর লুঠ করেই ক্ষান্ত হয় নি, যাবার সময় ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কয়েক মাস পর পুত্রশোকে বৃদ্ধাও প্রাণ ত্যাগ করল। বৃদ্ধের এখন এই একমাত্র কন্যাই সম্বল। সেও আজ অসুস্থ। অসুখ বেড়েই চলেছে। রাজধানীতে যত চিকিৎসক আছেন, সবাইকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ফল হয় নি। অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে।

স্থমন বৃদ্ধের সঙ্গে একটি ভাঙা ঘরে এসে ঢুকলেন। কূচীদেশের অধিকাংশ ঘরই মাটির। মাটির দেয়াল, মাটির ছাদ। কাঠের ব্যবহার খুব কম।

কুচীবাসীরা মাটির ঘর লেপেপুছে রঙ করে আর চিত্রিত করে সাজায়। ভারি সুন্দর দেখায়। বৃদ্ধের সে অবসর নেই। অর্থও নেই যে, কাউকে দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে। ঘরের দিকে তাকিয়ে সুমনের মনটা গলে গেল। দয়ার্দ্র হ'ল। একটিমাত্র ঘর, তার এক কোণে ছেঁড়া ময়লা কাঁথার ওপর অমনি আর-এক কাঁথা মুড়ি দিয়ে কী যেন পড়ে আছে। পাশে বসে আছে এক বৃদ্ধা। ভিক্ষু বৈদ্য আসতেই সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছে তাঁকে প্রণাম করল। প্রণাম করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। কুচীবাসীরা নিজেদের দুঃখে অপরকে দুঃখী করতে চায় না। কিন্তু এই সংযমেরও একটা সীমা আছে। বৃদ্ধা তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মৃতই ধরে নিয়েছিল। তার মুখ দেখে বৃদ্ধের বুকটা কেঁপে উঠল। সুমন কাঁথা সরিয়ে রোগীর দিকে তাকালেন। পিঙ্গল চর্মাবৃত অস্থি-কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। কোটরগত নিমীলিত চোখদুটি দেখে বোঝা গেল না, রোগী জীবিত, না মৃত। মৃত্যুর লক্ষণই বেশি, কিন্তু বৈদ্যরা কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। সুমন গম্ভীরভাবে রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করলেন। নাড়িব গতি অত্যন্ত ক্ষীণ, একেবারে বন্ধ হয় নি। সুমন উৎসাহিত হলেন। বৃদ্ধের হাত থেকে ঔষধির থলিটা নিলেন। তার মধ্যে ছিল কোমল পাতলা মৃগচর্মের কয়েক শ ছোট ছোট থলি। সেগুলোর সঙ্গে বাঁধা হাতির দাঁতের একটা পাতা। তাতে ঔষধির নাম লেখা। সুমন সেই নাম দেখে একটা থলি খুলে ডান হাতের কড়ে আঙুলের লম্বা নখে এক রত্তি ওষুধ তুলে নিলেন। বৈদ্যদের মতো সুমনও তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওষুধ বার করতে দেখে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার মনে আশার সঞ্চার হ'ল। সুমন ভৈষজ্যগুরুকে স্মরণ করে নখের ওষুধটুকু রোগীর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। খানিকটা জলও ঢোকালেন। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই রোগী ওষুধ গিলে ফেলল।

সুমন বললেন: আর ভয় নেই।

কিন্তু যতটা আশ্বাস তিনি তাদের দিতে চাইছিলেন ততটা বিশ্বাস তাঁর নিজেরই ছিল না। তবু তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: আপনার মেয়ে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এই একমাত্র ওষুধ ছিল, যা মৃত্যুর কবল থেকে মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে আনতে পারে। নাগার্জুনের কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরায় এই ওষুধ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।

সুমন রোগীকে জলের সঙ্গে আঙুরের রস মিশিয়ে খেতে দিতে বললেন। আর বললেন, সন্ধ্যার সময় একবার এসে দেখে যাবেন।

মেয়েটার মাথার চুল সব উঠে গিয়েছিল। এখানে-ওখানে যা-ও বা দু-একটা ছিল তা-ও রুক্ষ পিঙ্গল।

সুমন যাবার সময় কেবলই ভাবছিলেন, মেয়েটা যদি আরও এক প্রহর বেঁচে থাকে আর সন্ধ্যাবেলায় তিনি না আসা পর্যন্ত যমদূত তাকে নিয়ে না যায় তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে।

অপরাহ্ণে ভিক্ষুরা নগরের মধ্যে যান না। কিন্তু বৈদ্যরা এ নিয়ম থেকে মুক্ত। সুমন বলেছিলেন, তিনি নিজেই বৃদ্ধের বাড়ি যাবেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা থাকতে না পেরে তাঁর কাছে ছুটে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল না, তার মুখ দেখেই মনে হ'ল, হতাশ হবার কারণ নেই। বৃদ্ধ জানাল, মেয়েটির দেহে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সুমন খুব খুশি হলেন।

মেয়েটিকে দেখে সুমন আনন্দ প্রকাশ করে আরও ওষুধ দিলেন। বললেন: অবস্থা খারাপ না দেখলে আমার কাছে আর যাবার দরকার নেই। আমি কাল দুপুরে আসব।

সুমন বহু বছর তেমনভাবে চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগ করেন নি। এমন অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, এমন রোগও তিনি কখনও দেখেন নি। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর এই জ্ঞানের জন্য তাঁর খুব গর্ব হ'ল। মৃত্যুর হাত থেকে তিনি মেয়েটিকে ছিনিয়ে এনেছেন। অস্থি-কঙ্কালের ওপর চামড়ার গায়ে প্রথম প্রাণের রঙ ঢেউ খেলে গেল। ধমনীতে ধীরে ধীরে শুরু হ'ল রক্তসঞ্চার। অস্থি আর চামড়ার মাঝে জেগে উঠল মাংসের স্তর। কোটর থেকে বেরিয়ে এল চোখ। রুক্ষ চুল স্নিগ্ধ হয়ে বাড়তে লাগল। মাসখানেক পরে মেয়েটি চলে ফিরে বেড়াতে শুরু করল। সুমন শুষ্ক বৃক্ষকে পত্রপুষ্পে ভরা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই মেয়েটিকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনার পরও তার চিকিৎসা করে চললেন।

আমার মন বড় নরম। কারও দুঃখ দেখলে কাতর হয়ে পড়ি। তখন আমি আত্মাভিমান ভুলে যাই। কিন্তু সুমনের মন আমার চেয়েও দয়ার্দ্র। তাঁর অপার দয়ার পরিচয় আমি বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এই অপার দয়াই তাঁকে মেয়েটির কাছে টেনে নিয়ে গেল। দয়াপরবশ হয়েই তিনি মেয়েটির কাছে যেতে লাগলেন। একদিন তিনি দেখলেন, প্রথম দিনের সে কঙ্কাল

আর নেই। সেদিনের মুদ্রিত চোখ আজ পূর্ণ প্রস্ফুটিত। তার ওপরে কালো ভ্রূ সুন্দর রূপ নিয়েছে। কালো ভ্রূর নিচে তিসি ফুলের মতো নীল চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যখন তার প্রাণদাতার দিকে চায় তখন তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আরও সুন্দর। ছ মাস পরে মেয়েটি এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণীতে রূপান্তরিত হ'ল।

সুমন কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি, তাঁর দয়ার প্রতিফল তাঁকে পেতে হবে। দয়ার মর্যাদা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন কোনো প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক মর্যাদা আছে, কিন্তু পুরুষ আর নারীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা তার কোনো প্রাকৃতিক সীমা নেই। তাই আমরা আর এক বন্ধুকে হারালাম। তরুণীর প্রতি সুমনও আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কূচীদেশে দু বছর কেটে গেল। দু জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়ে আমি আর সংঘিল অসহায় হয়ে পড়লাম। আমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। দেবকুমার আর দেবকন্যাদের দেশ আমাদের কাছে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়াই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে হ'ল। কিন্তু আমরা তখনও জানি না, মহাচীনের পথ খুলেছে কিনা।

চোদ্দ

আগে যাবার পথ নিরাপদ ছিল না বলেই কূচীদেশে আমাদের দু বছর থাকতে হ'ল। বণিক্-সার্থ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময়েও আপদগ্রস্ত সীমা অতিক্রম করে, কিন্তু আমরা তা করলাম না। এখন আমরা যে দেশের দিকে চলেছি সে এক যাযাবর দেশ। সেখানকার সবাইকে দেখতে একই রকম। একের সঙ্গে অন্যের চেহারায় কোনো প্রভেদ নেই। তাদের ছোট চোখ, বাঁকা ভুরু, উঁচু চোয়াল, চ্যাপ্টা নাক আর মুখে দাড়ি-গোঁফের নামে কয়েকগাছা চুল। বাইরের লোকেরা তাদের দেখে বুঝতে পারে না, কারা তুর্ক আর কারা অবার।

আমরা কূচী থেকে চীনের দিকে চলেছি। কিন্তু এখন অবার, তুর্ক আর অন্যান্য জাতির মধ্যে যে রকম ঘূর্ণিঝড় চলেছে তাতে জানি না, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পড়ব। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার আর সংঘিলের একেবারেই মৃত্যুভয় নেই।

আমরা যদি কুচীদেশে ছ মাস থাকার পরই যাত্রা করতাম তাহলে দুজন বন্ধুকে আমাদের হারাতে হ'ত না। পথে বহু বিপদের সম্মুখীন হতেও হ'ত না। বড় জোর, কখান (রাজা)-র লোকদের হাতে পড়ে তাঁর কাছে যেতে হ'ত। আমরা কুচী থেকে রওনা হবার দু বছর আগে ৫৫২ খৃষ্টাব্দে তুমিন অবারদের শেষবার পরাস্ত করেছিলেন। অবার কখান আত্মহত্যা করে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর কিছু লোক পশ্চিমদিকে পালিয়ে গিয়েছিল আর কিছু চীনে গিয়ে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। বহু লোক আবার বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তুমিনকে তখন সাদা নমদার ওপর বসিয়ে কখান ঘোষণা করা হয়েছিল। আমাদের দেশে যেমন সিংহাসনে বসা বলে তেমনি এই যাযাবরেরা বলে নমদায় বসা। পশম জমিয়ে এক ধরনের কাপড় তৈবি হয়, তাকে বলে নমদা। নমদা তৈরি এই যাযাবরদের এক বিশেষ শিল্প।

যাযাবরদের তাঁবুও এই নমদার তৈরি। নরম কাঠের কাঠাম তাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। উটের পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেখানে তাঁবু খাটাতে চায় সেখানে এই কাঠাম খাড়া করে দেয়। তারপর অনেকগুলো নমদা দিয়ে কাঠামটা ঢেকে দেয়। এই তাদের ঘর হয়। বড় আরামপ্রদ এই ঘর। দারুণ গ্রীষ্মে শীতল আর হাড়-কাঁপানো শীতে গরম। ধোঁয়া বার করার জন্য যাযাবরেরা তাঁবুর মাঝখানে ফুটো রাখে। তার তলায় জ্বলে আগুন। জ্বালানির কাঠ বড় দুর্লভ। তাই তারা ঘোড়া, উট আর অন্যান্য প্রাণীর নাদি শুকিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালানো আর আঁচ বাড়ানোর জন্য যাযাবরদের সকলের কাছেই চামড়ার তৈরি হাপর থাকে। ভার যাতে বেশি না হয় সেজন্য অনাবশ্যক জিনিস থাকে কম। তবে সর্দারদের তাঁবুতে অনেক রকম জিনিসই থাকে। চীন, পারসীক আর বিজন্তীনই নয়, ভারতের তৈরি বহু জিনিসও আমি তাদের তাঁবুতে দেখেছি।

প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর এই যাযাবরদের দারুণ ঈর্ষা আর ক্রোধ। ভারতের প্রতি কিন্তু তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। সে বোধ হয় ভারত বুদ্ধের জন্মভূমি বলে। তাদের বহু দলপতি বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেছে। তুমিন খান গত বছর (৫৫৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসিগী খান অতি স্বল্পকালই শাসন করেছিলেন। পিতার রাজ্য পুত্রই পাবে, যাযাবরদের মধ্যে এমন কোনো নিয়ম নেই। এক কখানের মৃত্যুর পর তাঁর

স্থান অধিকার করার জন্য অন্ত সকলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী তিনিই নমদায় উপবেশন করে নিজেকে কগান বলে ঘোষণা করেন। যিনি যবগু কিংবা শাদ অথবা কগান হতে চান তাঁকে অধিকসংখ্যক লোকের বিশ্বাসভাজন হতে হয়। বীরত্ব আর যোগ্যতাও থাকা চাই। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনরঞ্জনের।

তুর্করা তাদের লোকদের বলে এল্, আমরা বলি জন। এদের সর্দার হলেন কগান। তাঁর নিচে ডানদিকে বসেন যবগু আর বাঁদিকে শাদ। তাদের ক্ষমতাও সেই অনুসারে। কগানের স্ত্রীকে বলা হয় কাতুন (রানী)।

যাযাবরদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর প্রাধান্যই বেশি বলা যেতে পারে। যুদ্ধে তারা পুরুষদের চেয়ে কম যায় না। যাযাবররা কোথাও শব দাহ করে, কোথাও কবর দেয়, আবার কোথাও এমনিই ফেলে দেয়। চুল ছিঁড়ে, মুখে আর বুকে নখ দিয়ে ঘা করে তারা শোক প্রকাশ করে। দেবতার উদ্দেশে তারা সাদা ঘোড়া বলি দেয়। মৃতাত্মার শ্রাদ্ধেও ঘোড়া কিংবা অন্য প্রাণী বলি হয়। তাদের কাছে সাদা পোশাক সৌভাগ্যের চিহ্ন আর কালো পোশাক শোকের।

কূচী থেকে আসার সময় আমরা জেনে খুশি হয়েছিলাম যে, এখন বহুদূর পর্যন্ত আমাদের এমন জায়গা দিয়ে যেতে হবে, যেখানকার লোকেরা কূচী কিংবা কুস্তনের মতো নগরে আর গ্রামে বাস করে, যেখানে সকলে বৌদ্ধধর্ম মানে এবং ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা করে। সার্থরা প্রায়ই খুশি হয়ে ভিক্ষুদের সঙ্গে নেয়, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। একে তো সার্থরা নিজেরাই বুদ্ধভক্ত, তার ওপর আবার তারা মনে করে, পথে যদি কোনো দৈব বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয় তাহলে ভিক্ষুদের পুজোআচ্চা আর তাঁদের আশীর্বাদে তাদের অকল্যাণ কেটে যাবে। কল্যাণ হবে।

পথ আমাদের পূর্বদিকে। আমাদের দক্ষিণে পাহাড়। সীতানদী বয়ে চলেছে—কখনও কাছ দিয়ে, আবার কখনও-বা কয়েক ক্রোশ দূর দিয়ে। মহানদীর ওপারে বহু দূরে মরুভূমি। কোথাও কোথাও গ্রাম। গম আর বাজরা ছাড়া অন্য ফসলও এখানে হয়। কাংস্তদেশের মতো আঙুর আর অন্যান্য ফলও জন্মায়। আমরা যতই এগিয়ে চলেছি ততই দেখছি, লোকে সুতোর বদলে পশমের পোশাক পরে। যাযাবর আর গ্রামবাসীদের মধ্যে

যে পার্থক্য তা তাদের চেহারাতেই স্পষ্ট। গ্রামবাসীরা রঙে-রূপে প্রায় কূচী আর কুস্তনবাসীদেরই মতো।

প্রথম যে বড় গ্রামটি আমরা পেলাম তার নাম অগ্নি। কূচীর মতোই সুন্দর। অগ্নির আপন রাজা আছে। কিন্তু তুর্কদের অধীন। রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ছ ক্রোশ দূরে সাগরের মতো মস্ত বড় এক সরোবর। চার পাহাড়ের মাঝে বাঁধ বেঁধে এই সরোবর তৈরি। অগ্নিরাজ্যে গোটা দশেক বিহার আছে। তাতে দু হাজারেরও বেশি ভিক্ষু থাকেন। এখানে সর্বাস্তিবাদেরই প্রাধান্ত। ভারতের মতো এখানকার ভিক্ষুরাও বিনয়ের নিয়ম পালন করেন। বিচারে মহাযানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দশদিনের পথযাত্রায় কোনো কষ্টই আমাদের হয় নি—যেন কুস্তন কিংবা কূচীরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা অগ্নিপুরীর অরণ্য-বিহারে উঠেছি। এখানকার ভিক্ষুরা আগেই আমার কথা শুনেছিলেন। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিক্ষুরা অধ্যয়ন কিংবা পরিদর্শনের জন্য যাওয়া-আসা করেন। অরণ্য-বিহারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে রকম সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলাম তাতে মনে হ'ল, এখান থেকেও বেরুতে আমাদের কষ্ট হবে। আমরা আগেই স্থির করে নিয়েছিলাম যে, বেশি ভালোবাসা জন্মাতে দেব না; এমন কোনো কাজ হাতে নেব না, যার জন্য আমাদের এখানে বেশি দিন থাকতে হয়।

পরবর্তী নগর দশ দিনের পথ। পথে গ্রাম আছে অনেক। মরুভূমির কষ্ট নেই। আমরা খুব কমই এক নাগাড়ে এক যোজনের বেশি পথ চলছি। তাড়াতাড়ি থাকলেও অগ্নিতে আমাদের দশদিন থাকতে হ'ল। এখান দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তা গিয়ে পড়েছে সীতানদীতে। কূচী থেকে বহু দূরে সীতাকে আমরা ছেড়ে এসেছি। আর তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। সীতানদী দক্ষিণে বিরাট এক সরোবরে গিয়ে পড়েছে। তার নাম ক্ষারসমুদ্র বা বগর-চকুল। তার তীরে বিশালায়তন এক সুন্দর বিহার। আমরা যখন শুনলাম, অনতিদূরেই এক মহাসমুদ্র আছে তখন আমরা কৌতূহল-বশে সেখানে গেলাম। আমরা সিংহলযাত্রায় মহাসমুদ্র দেখেছি। এ সমুদ্র তত বড় নয়। বাতাস উঠলেই এই বিশাল জলাশয়ে বড় বড় ঢেউ ওঠে, এপারের মানুষ ওপার দেখতে পায় না। চারিদিক পরিক্রমা করে না দেখলে লোকে তো বলবেই, এ এক অনন্ত সমুদ্র। সাড়ে তিন হাত মানুষের অস্তিত্ব আর কতটুকু! তার ডুবে যাবার পক্ষে ছোট্ট একটা পুষ্করিণীই তো যথেষ্ট।

অগ্নি থেকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। পথ নিরাপদ। পাহাড় আর শস্যশ্যামল মাঠ পেরিয়ে এখন আমরা চলেছি সেই নগরের দিকে, চীনারা যার নাম রেখেছে কাউশাঙ্। কাউশাঙ্ও অগ্নির মতো এক মহা-বণিক্-পথের ওপর অবস্থিত। তাই সমৃদ্ধ। এখানকার বণিক আর সার্থবাহ খুবই ধনী। সমৃদ্ধিতে কুচীর মতো। কুচী থেকে যেমন বড বড দুটো বণিক্-পথ উত্তরে আর পশ্চিমে চলে গেছে তেমনি এখান থেকেও একটা বণিক্-পথ উত্তরের পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে চলে গেছে উত্তরে, আর একটা গেছে পশ্চিমে অগ্নি আর কুচীর দিকে। ধনী ব্যাপারী আর সামন্তদের বাডি সুন্দর করে সাজানো। বাডির ধারেই ফলের বাগান। নগরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত কেবল বাগান আর বাগান। নগরের বাইরেও কয়েকটি বিহার আছে। যে বিহারে আমরা উঠেছি তার সঙ্গে অগ্নির অরণ্য-বিহারের একটা সম্পর্ক আছে।

আমরা দেখছি, দিন দিন আমরা সেইসব লোকেদের দেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, যাদের জীবনধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ, যাদের সঙ্গে আমরা অনুভব করতাম আত্মীয়তার বন্ধন। প্রতি পদক্ষেপে আমরা নতুন কিছু জানার চেষ্টা করছি। আমাদের মনে হচ্ছে, এক মাসের মধ্যেই আমরা চীনের সীমানায় পৌঁছুতে পারব। এখান থেকে চীনের মহাপ্রাচীর-সীমান্তে পৌঁছুতে দেড় মাসেব বেশি লাগবার কথা নয়। তবে আমাদের এগুতে হবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।

নগরে পাঁচ-সাত দিন থাকার পর আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম। দক্ষিণদিকে মরুভূমি। সেখানে জলের অভাব, গ্রামের অভাব। লোকে তাই ওদিক দিয়ে না গিয়ে উত্তরে পাহাড়ের গা বরাবর, আবার কখনও-বা পাহাড়ের ভেতর দিয়েই পথ চলে। এখানে সর্বত্রই থাকার জায়গা পেলাম। কোথাও কোথাও গ্রামও পেলাম। জলেরও সুবিধা আছে। আমরা এই পথেই চলতে লাগলাম।

পাহাড়ে-পাহাড়ে অনেক যাযাবর দেখতে পেলাম। এদের বিচিত্র চেহারা দেখে আগে যেমন একটা দুর্ভাবনা হয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল। সংঘিল আগেই বলেছিলেন, অনেক বিষয়ে মানুষের স্বভাব একই রকম। আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণপথে আমি দেখেছি, মানুষ প্রকৃতির চেয়েও উদার, তার হৃদয় কোমল। কিন্তু তার জীবনের পরিস্থিতি তাকে কঠোর হতে বাধ্য করে। লুঠতরাজ যেখানে জীবিকার প্রয়োজনে অপরিহার্য সেখানে

লুণ্ঠকের ক্রূরতা তো মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হবেই। যেখানে খাদ্যের জন্য বেশির ভাগ মানুষকে মাংসের ওপর নির্ভর করতে হয় সেখানে হিংসা তো অবলম্বন করতেই হবে। যাযাবরদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর তারা আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে, আমাদের কাছে অনেক কথা জানতে চেয়েছে। তাদের স্ত্রীরা আমাদের দিয়ে পুজোপাঠ করিয়েছে। সামন্তদের ঘরে কূচীর গ্রামবাসীদের মতো কত সুন্দরীই-না দেখেছি! মনে হয়, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—এই নীতি তারাও মেনে চলে। যাযাবর সমাজে নারীদের প্রাধান্য বেশি। তাদের প্রভাবে পুরুষদের প্রকৃতিও কোমল হয়ে পড়ে। ফলে স্বজাতির দেবতা পূজার বদলে তথাগতর ধর্ম ও শ্রমণদের জীবনচর্যার প্রতি তাদের প্রবণতা বাড়ছে। ধীরে ধীরে এই নতুন পরিশীলিত ধর্ম তাদের আকৃষ্ট করছে।

যাযাবরদের সবচেয়ে বড় দেবতা নীল আকাশ। তাদের ভাষায় কোক। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের পূজারী তারা। আকাশের পরেই বিশিষ্ট দেবতার আসন পর্বতের কিংবা এমনিতর কোনো প্রকৃতির লীলাভূমির। তাদের নিজেদের পূজারী আছে। দেবতা তার ওপর ভর করে কথা বলেন। সব ব্যাপারেই তারা পুরোহিতের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। কোনো দেবতার সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নেই। তথাগতর শিক্ষায় বলেছে, মানুষ তার সংস্কার আর জ্ঞান অনুসারে দেবতাদের মানে। দেবতার ধারণা দূর করার চেষ্টা করা বৃথা। ইন্দ্র, কুবের, বিরূঢক, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি কত দেবতাই-না আছেন জম্বুদ্বীপে! সেখানকার ভিক্ষুরা কোনো দেবতাকেই অবহেলা করেন না। তথাগত তা করতে বলেন নি। আমরা শুধু এই চাই যে, সবাই সুখী হোক, নীরোগ থাকুক ; আর দেবতারাও নিজেদের ক্রূরতা পরিহার করে অপরের কল্যাণ করুন। বহু দেশে ঘুরতে ঘুরতে বহু দেবতার নাম আমি শুনেছি। তাঁদের মূর্তিও দেখেছি। সেইসব দেবতার সঙ্গে যাযাবরদের দেবতাদের যোগ করে নিতে আপত্তি কী? তবে আমরা চাই, যাযাবরদের দেবতারা যেন নিষ্ঠুরতা ছেড়ে কোমল প্রকৃতির হন এবং রক্ত আর পশুবলির পরিবর্তে সাধারণ পূজায় তৃপ্ত থাকেন। সংঘিল পূজো-আচ্চা করতে ভালোবাসতেন। তাই যাযাবর সামন্ত যখন আমাদের পূজোপাঠ করতে বলত কিংবা ভূতপ্রেত শান্ত করাতে চাইত তখন আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিতাম। সংঘিলকে আমি শিষ্য হিসাবে দেখি নি, দেখেছি ভাই হিসাবে।

পাহাড় আর মাঠ পেরিয়ে আমরা মরুভূমিতে প্রবেশ করলাম। মরুভূমির ওপর দিয়ে এসে পৌছুলাম তুই মরুভূমির মাঝে শস্যশ্যামল এক মহানগরে। পাহাড়েও আমরা যখন-তখন যুদ্ধের কথা শুনতে পেয়েছি। কয়েক জায়গায় অতি সামান্তব জন্য আমরা বেঁচে গিয়েছি। নগরে পৌছে আমরা এক সংঘারামে উঠলাম। এখানে এসে মনে হ'ল, এখন আর সামনে এগুতে বাধা নেই। যে বিহারে আমরা উঠেছি তা আবার এক রাজার তৈরি। এখানেই আমরা সর্বপ্রথম আবার ভিক্ষু দেখলাম। আমি যখন শুনলাম, এখানে এক তুর্ক শ্রমণও আছেন, আমি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে চাইলাম। তাঁর বয়েস সতের-আঠার বছর হবে। তাঁর মুখাবয়ব ঠিক যাযাবরদের মতো নয়। মুখের রঙ গোলাপী। তিনিও আমার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন, বিশেষ করে যখন শুনেছিলেন আমি জম্বুদ্বীপের অধিবাসী। মা'র দিক থেকে তিনি ছিলেন কুস্তনী, আর সেজন্যই সংঘারামে এসে শ্রামণের হয়েছিলেন। আমি এখানে থাকতে থাকতেই তুর্ক তরুণ পূর্ণভিক্ষু হলেন। আমি তার নাম রাখলাম শাস্তিল। বুদ্ধিলের জন্য ইল শব্দের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। সংঘিল নামটা দৈবাৎ মিলে গিয়েছিল, কিন্তু শাস্তিল নাম আমিই রাখলাম। আমি তাব উপাধ্যায় হলাম আর সংঘিল হলেন আচার্য।

এই মহানগরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার জীবন যাযাবরদের মতো নয় যদিও ব্যাপকভাবে পশুপালন হয়। এখানকার লোকেরা নমদার তাঁবুতে বাস করে। উট, ঘোড়া, গোরু, চামরী আর ভেড়া-ছাগলই তাদের সম্পদ। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব ঘোড়সওয়ার দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেরা ঘোড়ার পিঠে টিকটিকির মতো লেগে থেকে লাগাম আর ছড়ি ছাড়াই তীরবেগে ছুটতে পারে। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, এখানকার লোকেরা ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে তীর চালাতে পারে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সাধ্য কী! পশুপালন ছাড়াও শিকার করে তারা খাদ্য আহরণ করে। শস্য বড় একটা তারা খাবার জন্য ব্যবহার করে না। তারা দুধ খায়। ঘোড়ার দুধ থেকে এক রকম মদিরা তৈরি হয়। পথে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য ঘোড়-সওয়ার তার ঘোড়ার শিরায় ফুটো করে ঘোড়ার রক্তপান করে।

যদি কোনো জাতিকে অজেয় বলা যায় তাহলে তা হচ্ছে হুণদের বংশধর এই যাযাবরেরা। চীনের সৈন্যসংখ্যা অগণিত, তার শক্তি দুর্দমনীয়। তবু তারা এই যাযাবরদের ভয় করে। যাযাবরেরা বিরাট সৈন্যদল দেখলে পূর্ণ

উদ্যমে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যায় না, যুদ্ধ পরিহার করে চলে। তাদের গ্রাম নেই, নগর নেই, ফসলের ক্ষেতও নেই যে, বিজেতারা তাদের সম্পত্তিহানি করবে। তাদের ঘর ভ্রাম্যমাণ তাঁবু। গোটা ঘরসংসার, যাবতীয় জিনিসপত্র উটের পিঠে বোঝাই করে নিতে তাদের এক দণ্ডও সময় লাগে না। তারা তাড়াতাড়ি উত্তরের দিকে পালিয়ে যায়। চীনা সৈন্যদের শুধু পুরো রসদই যোগাড় করতে হয় না, জল আর জ্বালানিও সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। রাত্রে তারা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে দেয় না, সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালায়। যাযাবরেরা বড় কোনো ক্ষতি স্বীকার না করেই মাসের পর মাস পালিয়ে পালিয়ে পথ চলতে পারে। চীনের সৈন্যরা কেবল ততদূরই আসতে পারে, যতদূর পর্যন্ত তারা পুরো রসদের ব্যবস্থা করতে পারে। এক মাসের রাস্তার পর আরও এগিয়ে যাযাবরদেব তাড়া করতে যাওয়া মানে সমগ্র সৈন্যদলকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। তাই বহুবার যাযাবরদের পরাজিত করে নিজেরা বিনাশের মুখে পড়ে চীনের লোকেরা দেখল যে, যাযাবরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে সদ্ভাব রাখাই ভালো। তাবা ভাবল, যতদিন অবার তুর্করা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে ততদিন আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে।

বস্তুত, এই মহানগর কোনো বিশেষ রাজ্যের সীমান্ত নয়। একে সারা পৃথিবীর সীমান্ত বলা যেতে পারে। এখানকার লোকেরা কেবল কৃষি আর মালীর কাজই করে না, তারা ছোটখাটো ব্যবসাও করে। সোগ্দ, পারস্য অথবা কুস্তন, খসগিরি প্রভৃতি দেশের বড় বড় ব্যাপারীরা এখানেও আছে। এখানকার ব্যাপারীরা কিন্তু তাদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। তবে তারা খুব সত্যনিষ্ঠ ও সরল। অতিথিদের প্রতি তারা কেবল উদারভাবাপন্নই নয়, অতিথিদের তারা ভালোওবাসে। গৃহস্বামী কেবল নিজেই অতিথিদের খাওয়া-দাওয়া আর সেবার কাজে নিরত থাকে না, নিজের স্ত্রী কিংবা কন্যাকে পর্যন্ত তাদের সেবায় পাঠানো কর্তব্য বলে মনে করে। বস্তুত, অতিথিসেবা তাদের কাছে এক অতি পুণ্যকর্ম। তাদের এই বিচিত্র অতিথিসেবার সুযোগ কেবল গৃহস্থরাই নেয় না, ভিক্ষুরাও নেন। এ বড় দুঃখের কথা। এখানকার বেশির ভাগ লোকই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিছু কিছু খৃষ্টান আর পারসীকও আছে। আমরা তাদের মঠে যেতাম। তারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাত।

এই মহানগর থেকে আমাদের পথ দক্ষিণ চীনের সীমার দিকে চলে গেছে। তখনও সেখানে হানাহানির ভয়। সার্থরা দুরুদুরু বুকে এগুচ্ছে। সারা

গ্রীষ্ম আর বর্ষা যে আমরা এখানে থেকে গেলাম, সে কেবল পথের ভয়ের জন্তই নয়, সঙ্গীদের, বিশেষ করে শাস্তিল আর তাঁর পরিবারের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না বলেও। এখানে বর্ষায় যত জল পড়ে তার চেয়ে শীতে হিম পড়ে বেশি। সার্থরা শীতকালেই পথ চলতে পছন্দ করে। কারণ, তখন ঝড় ওঠে কম, মরুভূমিতে পথ ভুল হবার আর বালির নিচে ডুবে যাবার ভয়ও বেশি থাকে না। আমি নিজে কখনও দেখি নি, তবে শুনেছি, হিমবৃষ্টির মতো এখানে কখনও কখনও আকাশ থেকে বালিবৃষ্টি হয়, তার নিচে গ্রাম আর নগর চাপা পড়ে যায়। এমন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আমি নিজের চোখে বালির বড় বড় টিলা দেখেছি। ঘোড়ার ক্ষুরের মতো তার আকার, অর্থাৎ একটা দিক খালি।

আমাদের বন্ধুরা আর পরিচিতরা পরামর্শ দিলেন, শীতকালে যাত্রা করাই ভালো। শাস্তিল চলেছেন আমার সঙ্গে। তাঁর মা-বাবার ধারণা, ভারতীয় পণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে থেকে থেকে তিনিও পণ্ডিত হয়ে যাবেন। আমার মতো বিদ্বান্ সেখানে দুর্লভ, তাই আমার সঙ্গে থাকা শাস্তিলের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁরা শাস্তিলকে আমার সঙ্গে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু একবার চলে গেলে আর যে পুত্রের মুখ দেখতে পাবেন, এমন সম্ভাবনা বেশি ছিল না। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন, আমরা যেন আরও কিছুদিন থেকে যাই। আমি চীনে যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলাম। আমার দৃষ্টি ছিল কেবল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আমাদের যাত্রাপথের দিকে।

শীত শুরু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করতে করতে আরও একমাস কেটে গেল। শাস্তিলের বাবাও আমাদের সঙ্গে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত যাবেন বাণিজ্য করতে। যাযাবর জনসাধারণ কৃষিকাজ পছন্দ করে না, পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে তারা বাণিজ্যও করে। চীনদেশে তাদের শক্তিশালী ছোট ছোট ঘোড়ার খুব চাহিদা। উটও কিছু বিক্রি হয়, আর ভেড়া তো সীমান্তদেশে প্রচুর যায়। শাস্তিলের বাবার যাওয়া মানে তাঁর সঙ্গে কয়েক শ তাঁবু, অর্থাৎ পরিবার আর সেইমতো পশুর দল যাওয়া।

একদিন শুভ মুহূর্তে মঙ্গলাচরণ করে যাত্রা শুরু হ'ল। শাস্তিলের শাঁ'র জন্ত যাত্রার মুহূর্তে ঘোড়া বলি হ'ল না। এর আগে আমি যাযাবরদের সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পাই নি। সংঘিলও না। সার্থ রাত্রি থাকতেই যাত্রা আরম্ভ করত। জ্যোৎস্নারাত্রে পথ চলতে সকলেরই ভালো লাগত। এক প্রহর

দিনের মধ্যেই আমরা সামনের চটিতে পৌছে যেতাম। চটির তো কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না, যেখানে ঘাস আর জলের সুবিধা পাওয়া যেত সেখানেই তাঁবুর গ্রাম বসে যেত আব পশুদের আশেপাশে চরে বেডাবার জন্ত ছেড়ে দেওয়া হ'ত। মরুভূমিতে জল পাওয়া যেত খুব কম জায়গাতেই। যেখানে পাওয়া যেত সেখানেই ফেলা হ'ত শিবির। উটের পিঠে তাঁবুর সরঞ্জাম আগে আগে যেত। উট বসিয়ে জিনিস নামিয়ে তাঁবুর কাঠাম খাড়া করা হ'ত। কাঠামোর ওপর ছুঁচের কাজ করা সুন্দর স্বচ্ছ সাদা নমদা মেলে দেওয়া হ'ত। এমন এক-একটা তাঁবুতে বার-চোদ্দ জন শুতে পারে।

আগে আগে যেত জিনিসপত্র, বিশেষ করে তাঁবুর সরঞ্জাম নিয়ে পশু আর মানুষ। তারপর ঘোড়সওয়ার আর অন্য সকলে। যাত্রার দিন তারা আমাকে আর সংঘিলকে ঘোড়ায় চড়ে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করল। কিন্তু ভিক্ষুরা সুস্থ অবস্থায় কেবল নৌকোতেই চডতে পারেন আর অসুস্থ হলে কোনো মানুষের কাঁধে। আমি এ নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইলাম না। আমার কথা তারা মেনে নিল। শান্তিল তাঁর উপাধ্যায় আর আচার্যকে পায়ে হেঁটে পথ চলতে দেখে কী করে আর ঘোডার পিঠে ওঠেন! আমাদের তিনজনের জন্য আলাদা তাঁবু আর পরিচারক ছিল। আমবা পায়ে হেঁটে পথ চলতাম বলে তাবুবাহী উটের সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে যাবার আগে নতুন জায়গায় পৌছে যেতাম। সেখানে আমরা দেখতাম, কেমন করে অল্প সময়ের মধ্যে নির্জন প্রান্তরে সুন্দর এক গ্রামের পত্তন হয়। নারী আর শিশুরাও পিঁপড়ের মতো নিজের নিজের কাজে লেগে যেত। যেসব পশু দুধ দিত, আগে তাদের দুধ দুয়ে নিয়ে তারপর তাদের চরতে ছেড়ে দেওয়া হ'ত।

উটের দুধ প্রথম প্রথম আমার ভালো লাগত না, ছাগলের দুধের মতোই বিশ্রী গন্ধ লাগত। কিন্তু অভ্যাসে মানুষের রুচি-অরুচি সব বদলে যায়। ধীরে ধীরে উটের দুধেও আমি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। উটের দুধ ছাডা অন্ত প্রধান খাদ্য ছিল শুকনো কিংবা তাজা মাংস। অনুচরদের আমি কাঁচা মাংসও খেতে দেখেছি। কিন্তু তারা বেশির ভাগই সেদ্ধ কিংবা পোডা মাংস পছন্দ করত। কাঠ কিংবা অন্য জ্বালানির যেখানে সুবিধা থাকত সেখানে তারা মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে আগুন জেলে গর্তটাকে গরম করে নিত। তারপর তাতে ভেড়ার মাংস ভরে বালি চাপা দিয়ে ওপরে আগুন ধরিয়ে দিত। এই রকম পোড়া মাংস তাদের খুব পছন্দ। আমিও এই সুস্বাদু মাংসের ভাগ পেতাম।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। যাত্রা আমাদের নিশ্চিন্ত আরামেই চলছিল। এই যাযাবর-জীবনের রস আমিও পেতে লাগলাম। পর্যটন করতে যারা ভালোবাসে, যাযাবরদের জীবন তাদের ভালো লাগবেই। যাযাবরেরা পর্যটক নয়, মহা-পর্যটক। কারণ তারা আজন্ম পর্যটন করার ব্রত গ্রহণ করেছে। আমরা ভাবছিলাম, আর এক সপ্তাহ চলার পরই আমরা সামনের পাহাড়ে পৌঁছে যাব। তারপর পনের-কুড়ি দিনের পথে পাব মহাচীনের সেই মহাপ্রাচীর, যার কথা আশ্চর্য হয়ে এতদিন শুনে এসেছি।

একদিন ভোরবেলায় সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। সামনের চটিতে পৌঁছুতে তখনও এক যোজনেরও বেশি পথ হাঁটতে হবে। আমরা সমতলভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। কোথাও পাহাড়ের অবরোধ নেই। তাই চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পেলাম, কয়েক শ ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে তীব্রবেগে ছুটে আসছে। দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দলের লোকেরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পায়ে হেঁটে চলার যাত্রীই ছিল বেশি, ঘোড়-সওয়ার দশ-পনের জন। আমার মনে হ'ল, ঘোড়া ছুটিয়ে যারা ধেয়ে আসছে তারা তুর্ক; তাড়াতাড়ির কোনো কাজে চলেছে। আমার সঙ্গীরা কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। আমাদের যাত্রাপথের নায়ক এর মধ্যে বিপদের গন্ধ দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি সে পশুদের আটকে সজাগ হতে বলল। মুহূর্তকালের মধ্যে সকলে তীরধনুক নিয়ে তৈরি হ'ল। প্রতীক্ষা করতে লাগল, আগন্তুকরা আরও কাছে এলে দেখবে তারা শত্রু, না মিত্র।

তারা কাছে এলে আমাদের লোকেরা যখন তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল তখন ওদিক থেকে শন্ শন্ শব্দে বাণ আসতে লাগল। আমাদের লোকেরাও তখন পশুদের আড়াল দিয়ে বাণ ছুঁড়তে শুরু করে দিল। কিন্তু বিপক্ষ দল সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু পক্ষের বাণ চলাচল দেখতে লাগলাম। শত্রুরা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। বাণ তো আর ফুল নয়, তাই দুপক্ষের বহু লোক হতাহত হ'ল। তারপর আর আমি জানি না। আমার জ্ঞান ছিল না।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন অনেক রাত। চারদিক অন্ধকার। আকাশে অসংখ্য তারা সাদা ফুলের মতো ফুটে রয়েছে। আমার চারধারে কী ঘটেছে তা জানার ইচ্ছা হবার আগেই আমি অনুভব করলাম, আমার মাথায়, পেটে আর বাঁ হাতে দারুণ ব্যথা। ডান হাত দিয়ে হাতড়ে দেখলাম, রক্তে আমার সর্বাঙ্গ

ভিজে গেছে। মানুষের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু তার জীবন। কিন্তু আমি তো কেবল আমার নিজের জীবনের কথাই ভবেতে পারি না। সবার আগে আমার দুই বন্ধুর কথা মনে পড়ল। আমি কান পেতে গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম। এমন সময় যেন কার একখানা হাত এসে পড়ল আমার শরীরের ওপর। আমাকে নডতে দেখে শান্তিল খুব ধীর স্বরে কী যেন বললেন। আমি বললাম: আমি বেঁচে আছি, তবে দু-তিন জায়গায় আঘাত লেগেছে। এখনও পেটে বাণ বিদ্ধ হয়ে আছে।

শান্তিল ক্ষিপ্রহস্তে বাণ টেনে বার করে নিলেন। ভীষণ ব্যথা লাগল, ক্ষত বেড়ে গেল। কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তার প্রয়োজন ছিল। এ কথা জেনে আমার বড় আনন্দ হ'ল যে, শান্তিল অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, সংঘিল পাশেই অজ্ঞান হয়ে পডে রয়েছেন। আমরা জানতাম, আমাদের শত্রু চারদিক থেকে আমাদের বেষ্টন করে রয়েছে। এখন সজাগ থাকা খুবই দরকার। তাই আমরা ধীর স্বরে কথা বলছিলাম। আমি বললাম: শান্তিল, আগে তুমি সংঘিলকে দেখো।

তারপরেই বোধ হয় আবার আমি অজ্ঞান হয়ে পডেছিলাম। ক্ষতটা বড ছিল। রক্তক্ষয়ও হযেছিল অনেক। তাই আবার অজ্ঞান হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। আমি যখন চোখ খুললাম তখন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। সূর্যালোকে চারদিক ঝলমল করছে। শান্তিল আমার কাছে বসে ছিলেন। তাঁর শুকনো মুখ দেখে আমার ভয় হ'ল। আমি সংঘিলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে শান্তিল বললেন: তিনি আর নেই।

আমি চারদিকে দৃষ্টি ফেরালাম। নিহত আর আহত কত লোক পড়ে আছে। আক্রমণকারীরা জিনিসপত্র গোঁছাতে ব্যস্ত। আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে তাদের মধ্যে থেকে দুজন আমার কাছে এসে আমার পাশেই বসে পডল। বলল: আমরা দুঃখিত যে, তুমি আহত হয়েছ। তোমার কোনো রকম অনিষ্ট হয়, আমাদের কগান আর বেগের সে ইচ্ছা ছিল না। তোমার সঙ্গে যে বেগ ছিল সে আসলে তুর্ক নয়, অবার রাজকুমার। আত্ম-গোপন করেছিল। কিন্তু আমরা আমাদের শত্রুকে ছেড়ে দিতে পারি না। খবর পেতেই আমাদের কগানের হুকুম হ'ল, তাকে জীবিত অথবা মৃত ধরে নিয়ে এস। আমাদের দুঃখ তাকে আমরা জীবিত ধরতে পারলাম না। তবে তার সমস্ত জিনিসপত্র, তার স্ত্রী আর পরিবার সবই এখন আমাদের হাতে

আমরা তোমাকে এই অবস্থাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের কত্তার আর যবগু ভিক্ষুদের খুব শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা তোমার দেখা পেলে খুব খুশি হবেন

পনের

আমাদের যাত্রাপথ এমনভাবে বদলে গেল যে, কয়েকমাস পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারলাম না, কোথায় আমরা চলেছি। দিনের সূর্য আর রাতের তারা দেখে অবশ্য বুঝতে পারছি, কোন্ দিকে চলেছি আমরা। কিন্তু সে দিক তো সব সময় ঠিক থাকে না। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যে, শাণ্ডিল অবার রাজকুমারের পুত্র, সেকথা তারা জানতে পারে নি। শাণ্ডিলের মুখাবয়বে বাবার চেয়ে মা'র ছাপই ছিল বেশি। তাঁর মা ছিলেন কুন্তনী। তাই রহস্য গোপনে তা সহায়ক হয়েছিল। যদি তিনি বাবার দাস আর অনুচরদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে এই রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয় থাকত। কে জানে, তখন তারা তাঁর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করত।

আমার সঙ্গে যে সর্দারটি কথাবার্তা বলেছিল, কিছুক্ষণ পরে সে আবার এল। জিনিসপত্র আর লোকজনদের নিয়ে আসার জন্য তার অনুচরদের সে হুকুম দিল আর আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলল। তার ব্যবহার খুবই নম্র আর শিষ্ট। সে বলল: আমরা তুর্করা এই সেদিন পর্যন্ত অবারদের দাস ছিলাম। এখন আমাদের রাজত্ব হয়েছে। আমরা জানি, অবারদের রাজকার্য চালাতে তোমাদের বিদ্যা আর বুদ্ধি খুবই সহায়ক। আমরা এ-ও জানি যে, তোমরা মারামারি পছন্দ করো না, অস্ত্র নিয়ে কখনও শত্রুর মোকাবিলা করো না। তাহলে তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা থাকবে কেন? আমরা তোমাকে আমাদের যবগুর কাছে নিয়ে যাব। সে তোমাকে খুব খাতির করে রাখবে। যদি তোমার সেখানে থাকতে ভালো না লাগে তাহলে যেখানে তুমি বলবে, সেখানে সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

সর্দারের কথা থেকে ভবিষ্যতের কিছু কিছু আভাস পেতে লাগলাম। আমার ক্ষতটা বেশ বড় ছিল। বিশেষ করে, পেটের বাঁদিকে যেখানে বাণ লেগেছিল সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। সর্দারের চিকিৎসক ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। আমি আর শাণ্ডিল দুজনে দুই ঘোড়ায় চড়ে

চলেছি। দুদিন আমরা আস্তে আস্তে চললাম। তারপর দৌড় লেগে গেল। আমরা আবার সেই মহানগরে এসে পৌঁছুলাম, যেখান থেকে তিন সপ্তাহ আগে রওনা হয়েছিলাম। আমার ভয় হ'ল, এখানে কয়েকদিন থাকতে না হয়! তাহলে শান্তিলের অনিষ্ট হতে পারে। কিন্তু সর্দারের তাড়া ছিল, তাড়াতাড়ি তার যবশুর কাছে পৌঁছুতে হবে। তাই নগরের বাইরে একটি মাত্র রাত কাটিয়ে আবার সে আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল।

তখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারি নি, শান্তিলের মা'র কী হয়েছে। পরে শুনলাম, তিনি পিত্রালয়ে চলে গেছেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুণী হয়ে বাকি জীবনটা ধর্মকর্মে কাটিয়ে দেবেন। তাঁর স্বভাব ভিক্ষুণী হবার অনুকূল ছিল। বাড়িতে থাকাকালেও তাঁর জীবন ছিল ভিক্ষুণীর মতো। মাতৃবিয়োগে শান্তিলের অত দুঃখ হ'ত না, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাঁর মা চলে গেলেন তা বড়ই মর্মান্তিক।

ছোট এক পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে আমরা পাহাড়ের ভেতর প্রবেশ করলাম। এখানে পশু চরানোর আর ডেরা ফেলার অনেক সুবিধা থাকলেও সর্দারের তাড়া ছিল বলে তা আর হ'ল না। দু-তিন দিন পরে আমরা পাহাড় পার হয়ে এক বিশাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বরকুল নগরে এসে পৌঁছুলাম। পাহাড়ের ওপর থেকেই নগরটাকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। দক্ষিণের মতো নগরের উত্তরেও কিছু দূরে পাহাড় ছিল। শুকনো মরুভূমির মাঝে সাগরের মতো বিশাল এই সরোবরের জল লবণাক্ত।

পথে বিশ্রামস্থলে সর্দার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমরা তার শত্রুদেশের লোক ছিলাম না, আমাদের প্রতি কোনোরকম সন্দেহও সে করে নি। যাযাবর হওয়া সত্ত্বেও সে যবশুর বিশ্বাসভাজন এক সম্রান্ত সামন্ত ছিল। এই যাযাবরেরা উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষায় আমাদের সামন্তদের চেয়ে খুব পেছনে ছিল না। সিংহলে আমি ব্যাধদের দেখেছি। তাদেরও ঘর-সংসার ছিল না। তারা পশুপালনও করত না। কেবল শিকার আর ফল-মধু সঞ্চয় করেই জীবিকা নির্বাহ করত। ক্রূরতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি কতকগুলো ব্যাপারে যাযাবরদের সঙ্গে তাদের চারিত্রিক মিল থাকলেও এই দু জাতের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক। ব্যাধদের তুলনায় যাযাবরদের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার প্রসার বেশি হয়েছিল। যাযাবরদের তাঁবুতে নিপুণ শিল্পী থাকত। কাপড় আর অন্যান্য জিনিস তারা এত সুন্দর করে তৈরি করত যে, তেমনটি আর কোথাও

সহজে দেখা যেত না। তাদের পাহাড়ে তামা, লোহা আর সোনা ছিল। অস্ত্র ছাড়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে কীকরে? তাই ধাতুশিল্পের উন্নতির জন্যও তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।

সরোবরের পার্শ্ববর্তী এই নগরই আমাদের এবারকার যাত্রাপথের অন্তিম জনপদ। অনেকদিন পরে আবার যখন নগর আর গ্রাম চোখে পড়ল তখন মনে হ'ল, সত্যিই আমি এক বিচিত্র জগতে চলে এসেছি। এই নগরেও সংঘারাম ছিল, ভিক্ষু ছিলেন, তুর্কদের মতো চেহারার লোকেদের চেয়ে কুচীদের মতো লোকই ছিল বেশি। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্যাপারী আর শিল্পকার। নগরের কাছে গ্রামও ছিল। সেখানে চাষ-আবাদ হ'ত। নগরে ফলের বাগান আর শাক-সবজির ক্ষেত। এখান থেকে একটা রাস্তা পশ্চিমের দিকে গিয়ে সোগ্দ যাবার রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। সোগ্দী ব্যাপারীও এখানে ছিল। আর-একটা রাস্তা গেছে উত্তর-পশ্চিমে সোনার খনির দিকে। সে পথে যাওয়ায় অনেক বাধা। তুর্ক আর তাদের আগে অবাররাও চাইত না যে, সোনার খনির খোঁজ অন্য কেউ পায়। পৃথিবীর বহু ঝগড়া-দ্বন্দ্বের কারণ সোনা। যাযাবরেরা প্রয়োজন হলে তাদের পশুধন আর পরিবারকে শত্রুর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারত, কিন্তু খনিগুলো তো আর সরানো যায় না।

এই নগর থেকে যে পথ আমরা ধরলাম তা প্রায় উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছে। যে পাহাড়টা কাছে মনে হচ্ছিল, আসলে তা অনেক দূরে ছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় অমন লাগছিল। মাঝে ছিল একেবারে সমতলভূমি। তার কোথাও ছোট ছোট গাছ, কোথাও কাঁটার ঝাড়। বালির দেশে যেখানে জলের দারুণ অভাব সেখানে বড় গাছ হবে কীকরে? রাত্রে আমরা বিশ্রাম নেবার জন্য এক ঝাড়-জঙ্গলের ধারে রয়ে গেলাম। সন্ধ্যার সময় জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো উটকে একসঙ্গে দেখা গেল। বোধহয় কাঁটার ঝাড় চিবোতে এসেছিল। ভারতেও আমি উট দেখেছি। ভারতের উট এখানকার চেয়ে অনেক বড়। অবশ্য এখানে এই মরুভূমির দেশে ছোট উটই ভালো, নইলে তাদের খাবার অত গাছ পাওয়া যাবে কোথায়? এখানকার উটের গায়ে অনেক লোম। নরম নরম লোম। সেই লোমের তৈরি কাপড় বড় লোকেরাও পছন্দ করে। উটের একটি কাজ, বোঝা বওয়া। ঘোড়া কিংবা খচ্চর অত বোঝা বইতে পারে না। এখানকার লোকেরা ঘোড়ার মতো উটের মাংসও

খায়। তবে গরিবের খাদ্য হিসাবেই উটের মাংসের চল। এখানে সমতলভূমিতে সাধারণই বেশির ভাগ গাড়ি ব্যবহার করে। এখানকার লোকেরা অতি সাধারণ দু-চারটে যন্ত্র দিয়ে এত সুন্দর ও মজবুত গাড়ির চাকা তৈরি করে যে, তা কল্পনাও করা যায় না।

কয়েক দিন পথ হাঁটার পর—হাঁটা না বলে বরং দৌড়ানো বলাই ভালো—আমরা সামনের পাহাড়ে এসে পৌছুলাম। এই পাহাড়ের নাম স্বর্ণগিরি। আমাদের হিমবন্ত (হিমালয়)-এর মতোই হয়তো এই পাহাড় বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম, সবুজের চিহ্ন প্রায় নেই-ই। তখন শীতকাল। শীতকালে তো এমনিতেই সবুজ শুকিয়ে যায়, আর এখানে চিরহরিৎ গাছ ছিলই না। আমি ভেবেছিলাম, পরেও হয়তো এমন দেখা যাবে। কিন্তু যখন পাহাড়ের ওপরে আর তার উত্তরে গেলাম, উদ্যানের কথা মনে পড়ল। স্বভাবতই এখানে শীত বেশি। আমার দীর্ঘ পথযাত্রায় আমি দেখেছি, পাহাড়ের যত ওপরে ওঠা যায় ততই শীত পড়ে, আবার যত উত্তরে এগুনো যায় তত বেশি শীত লাগে। আমাদের দেশে দেবদারু আর ভূর্জবৃক্ষ অনেক উঁচু পাহাড়ে হয়, কিন্তু এখানে আমি নিচের সমতলভূমিতেও ঐ জাতীয় গাছের জঙ্গল দেখেছি। কাংস্যদেশে এসে আমরা শীতে পশমের চীবর পরলাম। শান্তিলের মা নিজের হাতে আমাদের দুজনকে খুব মোটা আর মোলায়েম দুটো সংঘাটী সেলাই করে দিয়েছিলেন। তা-ও পরলাম। তার নিচে গরম অংসকুট। কিন্তু তাতেও এই শীত মানছিল না। আমাদের সঙ্গের সর্দার আর তার অনুচরেরা গরমকালেও চামড়ার জামা পরে। শীতে তো কথাই নেই। অনুচরদের গায়ে ছিল ভেড়ার চামড়ার জামা, আর সর্দারের গায়ে হরিণের। সর্দারের মৃগচর্ম অনেক দামী। আরও উত্তরের দেশ থেকে এই মৃগচর্ম আসে। হাত দিলে মাখনের মত নরম লাগে। দেখতে লাগে সোনার মতো। সর্দারের মাথায় ছিল মৃগচর্মের কণ্টোপ, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত নমদার মোজা, তার ওপর চামড়ার জুতো। সেই জুতোও হাঁটু পর্যন্ত।

সর্দার দেখল, শীতে আমরা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি। তাই রাত্রে গায়ে দেবার জন্য লোমওয়ালা চামড়ার একটা চাদর দিল। সিংহলের ভিক্ষুরা হয়তো একে নিয়মবিরুদ্ধ বলবেন, কিন্তু তাঁরা তো জানেন না, এখানকার শীতে এর প্রয়োজনীয়তা কত! তথাগত যদি এদেশে আসতেন তাহলে হয়তো তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্য এখানকার উপযোগী পোশাকের বিধান দিতেন। বলা

বাহুল্য, সে পোশাক চামড়ারই হ'ত। সর্দার আমাদের নরম মৃগচর্মের অংলখুট আর কণ্টোপও দিয়েছিল। উত্তান আর অন্যসব শীতের দেশ বেশি শীত পড়লে ভিক্ষুরা শীতকালে কণ্টোপ ব্যবহার করেন। তাই এখানে কণ্টোপ পরতে আমাদের আপত্তি ছিল না। সাধারণ কণ্টোপ পরে আমরা মাথা বাঁচাতে পারি, কিন্তু এখানকার শীতে বুক আর পেট বাঁচাতে না পারলে পেট খারাপ হয়ে অসুখে পড়ার ভয়। এখনকার শীতে আমার ঘা একেবারে সেরে গেল।

আহত অবস্থায় ঘোড়ায় চড়তে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। এখন যদি ঘোড়া ছেড়ে দিই তাহলে গতি ধীর হয়ে যাবে। সর্দার তা পছন্দ করবে না। হয়তো ঘোড়ায় চড়তে বাধ্য করবে। তাই ভিক্ষুদের পক্ষে উচিত নয় জেনেও আমি ঘোড়ায় চড়তে অস্বীকার করলাম না।

বন্দী হবার পনের দিন পরে আমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে একটা মাঠে প্রবেশ করলাম। তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ মাঠ, এই মাঠ শীতকালে যবগুর স্কন্ধাবার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। দূর থেকেই আমরা যবগুর শিবির চিনতে পারলাম। অন্যান্য শিবিরের চেয়ে যবগুর শিবির অনেক উঁচু আর লম্বা-চওড়া। তার সামনে সমতল ছাদের মতো এক বিশাল তাঁবু। তাঁবুটা রঙ-বেরঙের কাপড় আর ছুঁচের কাজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। আমাদের পৌঁছুনোর দু দিন আগে এখানে খুব হিমবৃষ্টি হয়ে গেছে। আজও চারদিকে বরফের মোটা চাদর বিছিয়ে আছে।

আমি খালি ভাবছিলাম, যবগু আমাদের কীভাবে গ্রহণ করবে। সর্দার অবশ্য বলেছে: তার মা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই ভিক্ষুদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা। আর সেজন্যই সে আমাদের ভিক্ষু আনতে আদেশ দিয়েছে। যদি আমরা তোমাকে তখন না পেতাম তাহলে পথের কোনো নগর থেকে যে কোনো ভিক্ষুকে আমরা ধরে আনতাম।

তার কথা যে মিথ্যা আমি বলতে পারি না। তাছাড়া ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। ভয় যদি থাকত তাহলেও জীবনের প্রতি এত মোহ আমার ছিল না যে, তার চিন্তায় আমি ব্যাকুল হব। আমাদের আসার খবর চারদিন আগেই দূতমুখে যবগু পেয়ে গিয়েছিল। আমরা সেখানে সন্ধ্যার সময় পৌঁছুলাম।

সর্দার তার এক অনুচরকে যবগুর দরবারে পাঠিয়েছিল। রাত্রেই সে ফিরে এসে খবর দিল, যবগু সকালেই ভিক্ষুদের নিয়ে যেতে বলেছে। এই দীর্ঘ রাত্রি কাটানো বড় কষ্টকর। সর্দার আমাদের আলাদা একটা তাঁবু দিয়েছিল। শেষ

নগর ছেড়ে তৃতীয় দিনের পর আমি দেখেছিলাম, সর্দার আমাদের ওপর তত নজর রাখছে না। হয়তো সে ভেবেছিল, এখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা নিছক বোকামি। তাছাড়া আমাদের ব্যবহারে সে বুঝতে পেরেছিল যে, পালানোর চেষ্টা আমরা করব না। স্বর্ণগিরি পার হবার পরে তো আমরা একেবারেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘোড়াগুলোকে যে তার সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও আর ছিল না। আমাদের সঙ্গে তার যে দু-একজন ঘোড়াসওয়ার ছিল, সে আমাদেব পাহারা দেবার জন্য নয়, আমাদের সেবার জন্য।

পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাবার এসে গেল। ভিক্ষুদের পক্ষে একাহারের নিয়ম সত্যিই ভালো। ছ প্রহরের দিনেরাতে যখন একবারই আহার করতে হবে তখন দিন বড় হ'ল কি ছোট তাতে কী এসে যায়? সিংহলে আমরা সূর্যোদয়ের সময়েই যথেষ্ট প্রাতঃরাশ পেতাম। তারপর দেড় প্রহর পর মধ্যাহ্নে পুরো আহার। এখানে আমাকে চেষ্টা করতে হ'ল, যাতে সূর্যোদয় থেকে এক প্রহরের মধ্যে মধ্যাহ্নেই আহার পেয়ে যাই। সবসময় আমার ভয়, অংসকূট পরিবর্তনের মতো আহারেও আবার পরিবর্তন করতে না হয়। কিন্তু সেরকম কোনো পরিবর্তন যথাশক্তি রোধ করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। পাছে যবগুর ওখানে আহারে দেরি হয়ে যায়, তাই আমরা পরিচারককে বলে সূর্যোদয়ের সময়েই বেশি করে আহার করে নিয়েছিলাম।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যবগুর দুই অনুচর সাদা ঘোড়া নিয়ে আমাদের শিবিরদ্বারে এসে হাজির হ'ল। আমাদের সঙ্গে যে সর্দারটি এসেছিল সে-ও এক নতুন ঘোড়ায় সওয়ার হ'ল। একটু পরেই আমরা যবগুর শিবিরে পৌঁছে গেলাম। যবগু তখন শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুত। তার সঙ্গে ছিল বিরাট সংখ্যক সশস্ত্র যোদ্ধা আর অনুচর। তার দেহের নিম্নভাগে মৃগচর্ম আর ঊর্ধ্বভাগে সবুজ সাটিনের চোগা। দীর্ঘ কেশগুচ্ছ খোলা। ললাটে তার সাদা রেশমের পটি বাঁধা। পটিটা পেছন দিকে অনেক নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। প্রায় দু শ অমাত্য তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই পরনে দামী পোশাক। তাদের লম্বা চুলের বেণী পেছন দিকে ঝুলছে। যোদ্ধাদের দেহে মৃগচর্ম কিংবা নরম পশমের চোগা। হাতে বল্লম, কাঁধে ধনুক আর পিঠে তূণীর। তাদের অনেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়েছে, আবার অনেকে ঘোড়ার পিঠে। বহু দূর পর্যন্ত তাদের সারি চলে গিয়েছে।

যবগু আমাকে দেখে খুব খুশি হ'ল। পথে আমাদের যে কষ্ট হয়েছিল তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল : আপনি এখন আমাদের অতিথি এবং গুরু। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আপনার জন্য আলাদা তাঁবু আর পরিচারকের ব্যবস্থা করেছি।

তারপর একজন অমাত্যকে দেখিয়ে বলল : যা দরকার হবে, একে বলবেন। এ সবসময়ই আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

যবগু করজোড়ে বিদায় নিয়ে অনুচরদের সঙ্গে চলে গেল। আর অমাত্য আমাদের থাকার জায়গায় নিয়ে চলল। যে বিশাল তাঁবুটা আমি দূর থেকে দেখেছিলাম, এখন সকালে সূর্যালোকে তার সোনার তারাগুলি আমার চোখ ঝলসে দিল। আমি যবগুর দরবার-তাঁবু দেখতে চাইলাম। অমাত্য খুব খুশি হয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল।

পরে আমি যবগুকে তার অমাত্যদের সঙ্গে সেখানে বসে থাকতেও দেখেছি। তার আসনের ডানে আর বাঁয়ে গালিচার সারি। তার ওপর বহুমূল্য পোশাক পরে মন্ত্রী আর দরবারী। এই দৃশ্য দেখার আগে কখনও আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, যাযাবরেরাও এমন বৈভবের অধিকারী হতে পারে। যে কোনো রাজদরবারের মতো এখানেও বহুমূল্য পোশাক আর ভূষণ। যবগু আর অমাত্যদের পেছনে অনুচরদের এক বিরাট বাহিনী সর্বদাই সেবার জন্য দাঁড়িয়ে। যবগুব সিংহাসন পুরু তোষক আর গালিচার তৈরি একটা উঁচু বেদী। একদিন সন্ধ্যাকালে আমি যবগুর দরবার দেখেছিলাম। সেদিন ছিল আনন্দোৎসবের দিন। সেদিন ঘোড়ার দুধের মদ নয়, খাঁটি আঙুরের মদিরা বিতরিত হচ্ছিল। সবার সামনে ছিল সেদ্ধ করা ঘোড়ার মাংস। বহুমূল্য পেয়ালায় লোকে মদিরা পান করছিল। অনুচরেরা ঘড়ায় করে মদিরা নিয়ে আনাগোনা করছিল। একদিকে সংগীতমণ্ডলী সুন্দর গীতবাদ্য দিয়ে সবার মনোরঞ্জন করছিল।

শীত শেষ হয়ে গেল। এমন শীত আমি আর কখনও দেখি নি। অবশ্য হিমালয়ের সীমা পার হবার সময় এর চেয়েও বেশি শীতের জায়গা দিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে ছিল গ্রীষ্মকাল। অতি শীতল জায়গাতেও কয়েক ঘণ্টার বেশি থাকতে হয় নি। তা-ও পথ চলতে চলতে। এখানে আমরা পাহাড়ের ওপরে নয়, নিচে সমতলভূমিতে ছিলাম। এমন জায়গায় এত শীত? আমাদের যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয়, সেদিকে পুরো খেয়াল রেখেছিল যবগু। এ

কুগ্রা বলে আমি অহংকার করতে চাই না যে, বরঞ্চ আমার কাছ থেকে তথাগতর জীবনকাহিনী আর তাঁর উপদেশাবলী শুনে ভক্তিলাভ করেছিল, বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণ নিয়ে উপাসক হয়েছিল। যবগু ছিল মস্ত বীর। কয়েক বছর আগে তার কাকা তুমিন কান অবারদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিল তাতে সে খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল। সে ছিল জন্ম-সেনানায়ক। কিন্তু তার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আমি দেখেছিলাম, যা যাযাবরদের মধ্যে দেখা যায় না। বড় দয়ালু ছিল সে। তার মধ্যে অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা ছিল। আমি স্বীকার করি, বীরত্বের সঙ্গে এই গুণাবলীর কোনো বিরোধ নেই; কিন্তু রক্তপাতের মধ্যে যার জন্ম, সংঘর্ষের মধ্যে যে লালিতপালিত, নররক্তের মধ্যেই যার জীবনাবসান—সেই যাযাবরের পক্ষে এ তো স্বাভাবিক নয়। অবারদের বহু সর্দার আর কআন বুদ্ধভক্ত ছিল। আমি শুনেছিলাম, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। কিন্তু তুর্করা তখনও তাদের জাতীয় ধর্ম মেনে চলত। যবগু বলেছিল: আমাদের পূর্বপুরুষ চীনের শাসক তোবা সম্রাটও বুদ্ধভক্ত ছিলেন। চীনদরবারে যাবার সময় তাঁর তৈরি গুহাবিহারগুলি আপনাকে আমি দেখাব। সেগুলি তিনি তৈরি করিয়েছিলেন চীনের ভিক্ষুসংঘের জন্য। আজও তা সুন্দর, সমৃদ্ধ।

এমন সব বিষয়ে যবগুর জিজ্ঞাসা ছিল, যা আমি তৃপ্ত করতে পারতাম। করতামও। কিন্তু বাধা ছিল ভাষার। যদিও তুর্ক ভাষা তখন আর আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না, তবু অভিধর্ম (বৌদ্ধদর্শন)-এর কথা বোঝানোর জন্য উপযুক্ত শব্দের অভাব ছিল। তুর্ক ভাষায় যদি গ্রন্থগুলির অনুবাদও হ'ত তাহলে আমি শান্তিলের সাহায্য নিয়ে একটা শব্দকোষ তৈরি করে নিতাম। শব্দকোষের প্রয়োজনীয়তা আমি শিগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম, আর তাই শান্তিলের সাহায্য নিয়ে অভিধর্মকোষের বহু শব্দের অর্থ খুঁজে খুঁজে সেগুলির আমি তুর্কী রূপ দিলাম। আমি কথা বলতাম কিছু তুর্কী আর কিছু ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত)-র সাহায্যে। ছ মাস পর্যন্ত নিত্য অপরাহ্নে চার ঘণ্টা ধরে যবগু সৎসঙ্গ করত। তখন শান্তিল আমার পাশে বসে থাকতেন। বুদ্ধের প্রজ্ঞাচক্ষু (দর্শন)-এর সঙ্গে যবগুর পরিচয় ঘটতে লাগল। তার রানীর মনেও শ্রদ্ধাভাব জেগে উঠল। সে-ও তথাগতর কথা, তাঁর জন্মভূমি আর আমার ভ্রমণকাহিনী শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত।

আগে আমি মনে করতাম, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে চীন, সেখানে গিয়ে চীনা ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ করতে হবে। আমি এ-ও জানতাম যে, আমাদের দেশের

বহু লোক বহু শতাব্দী আগে থেকে আজও পর্যন্ত এই পুণ্য কাজ করে আসছেন। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমি সঙ্গে করে এক বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ নিয়ে যাব। তালপত্রে লেখা আমার প্রিয় কত গ্রন্থই-না আমি উদ্যান থেকে সঙ্গে করে এনেছিলাম! বুদ্ধিলের হস্তলিখিত "প্রমাণসমুচ্চয়" তো আমার জীবননিধি ছিল। বসুবন্ধুর "অভিধর্মকোষ" এবং আরও কত সূত্রই-না আমার কণ্ঠস্থ ছিল। আমি জানতাম, যে বিদ্যা কণ্ঠস্থ থাকে তা-ই নিজস্ব। তাই আমি জীবনের বহু বছর এই কাজে রত ছিলাম। আমার সমস্ত সংগ্রহ এখন আর নেই, অধিকাংশই সংঘিলের সঙ্গে হারিয়েছি। জিনিসপত্রের সঙ্গে যেগুলি বেঁধে রেখেছিলাম, লুঠতরাজের সময় সেগুলি হারিয়ে গেছে। যেগুলি সব সময় পিঠে করে বয়ে বেড়াতাম, কেবল সেগুলিই রক্ষা পেয়েছে।

যবগু আর তার রানী যখন আমাকে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করত তখন আমি আমার মাতৃভূমির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম। আমার কেবলি মনে হ'ত—কোথায় সেই উদ্যানের রমণীয় ভূমি, যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি; কোথায় সেই সিংহলদ্বীপ, যেখানে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আর গুরুকে হারিয়েছি; আর, কোথায় এই ছোট ছোট পাহাড় আর বরফ আর শীতল সমতলভূমি, যেখানে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি! একথা সত্যি যে, আমি মহা ভাগ্যবান্। আর তাই এমন পরিস্থিতিতেও যবগু আর তার সর্দারের সাহায্য পেয়েছি, যার জন্য জীবনের কষ্ট আমার মোটেই ছিল না। যবগু তার পুত্রের জন্য যে রকম পরিচারক আর অন্যান্য ব্যবস্থা করেছিল, আমার জন্যও করেছিল সেই রকম ব্যবস্থা। কিন্তু আমার লক্ষ্য তো চীন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমি হব কীকরে? আমার এমনও মনে হতে লাগল যে, চীন যাবার আশা ত্যাগ করে হয়তো এই যাযাবরদের মধ্যেই আমাকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। তার জন্য আমার দুঃখ হবার কথা নয়। কারণ, এতে আমি এক অকৃষ্ট জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

শাক্তিল বলতেন: এ হ'ল ঝঞ্ঝাবাত্যার দেশ। কে জানে আবার কখন আমাদের এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে।

এখান থেকে যাবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। তবু আমরা তুর্ক ভাষায় তথাগতর বাণী অনুবাদ করতে লেগে গেলাম। এখানে তালপত্র পাওয়া যায় না। ভূর্জপত্র যত খুশি মিলবে। তুর্ক-যাযাবরেরা লেখাপড়া জানে না, তার প্রয়োজনও হ'ত না। কিন্তু যখন তারা অবারদের বিশাল সাম্রাজ্যের

(কোরিয়ার সীমা থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডের) অধিপতি হ'ল তখন লেখাপড়া জানার দরকার হয়ে পড়ল। যবগু যখন দেখল, ভারতীয় লিপিতে বহু তুর্ক শব্দ আমি লিখেছি তখন তার সেই লিপি শেখার আগ্রহ হ'ল। আমি তাকে তুর্কী উচ্চারণে ভারতীয় অক্ষরগুলি শেখালাম। সংস্কৃত শেখার ইচ্ছাও তার ছিল। কিন্তু আমি বললাম: আগে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করো, তারপর সংস্কৃতে হাত দিও। নইলে এগিয়ে গিয়ে যদি উৎসাহ হারাও তাহলে ছুটোই যাবে।

শীতের বরফ দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে শীত গেল, বসন্ত এল। বসন্ত কোথায় কাটানো যায়, সে সম্পর্কে যবগুর সঙ্গে আগেই পরামর্শ হয়েছিল। আমার চোখে সবুজের তৃষ্ণার কথা শুনে সে বলেছিল: এখান থেকে উত্তরে দেবদারু আর ভূর্জবৃক্ষের ঘন জঙ্গল আছে। এমন জঙ্গল আপনি কখনও দেখেন নি। সে জঙ্গলের দৃশ্য ভারি মনোরম, অপূর্ব।

তার উৎসাহে উত্তরের সেই জঙ্গল দেখার উৎসাহ পেয়ে বসল আমাকে। আমি না থাকলে সে হয়তো বসন্তকালে কখানের সঙ্গে দেখা করার জন্য পশ্চিমের দিকে যাত্রা করত। কিন্তু আমারই ইচ্ছায় উত্তরের পথে যাওয়া স্থির করল। তার শাসিত প্রদেশ উত্তরে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা সে নিজেও জানত না। তুর্ক ছাড়া অন্য বহু জাতি উত্তরের গভীর জঙ্গলে বাস করত। তারা তখন স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। যবগু বলেছিল: বস্তুত এই জংলী জাতিদের ততখানি দোষ নেই, যতখানি আমাদের লোকেদের। আমাদের লোকেরা কেবল কঠোর দণ্ড দিয়েই তাদের বশে রাখতে চায়।

বসন্ত সমাগমে যবগু তার কয়েক সহস্র লোক নিয়ে প্রথমে উত্তর পূর্বদিকে ও পরে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'ল। আমাদের পথ এখন মরুভূমির ওপর দিয়ে নয়, যদিও এই অঞ্চলে গাছের প্রাচুর্য ছিল না। বহু নদী পার হয়ে আমরা এক বড় নদী পেলাম। পশ্চিমের দিকে চলেছে সেই নদী। তার জল স্বচ্ছ নীল। আমার মনে হ'ল, কয়েক যুগ পরে এক সুন্দর গভীর জলধারা দেখতে পেলাম। যাযাবরেরা স্নান করাকে শখের জিনিস বলে মনে করে। তাদের অস্নাত দেহ থেকে দুর্গন্ধ বার হয়। এখানে এসে আমরাও স্নান করতে চাইতাম না, শীতে কেবল হাতমুখ ধুয়ে নিতাম। এখানকার ঠাণ্ডা আর গরমের ব্যাপারটা বোঝা অনেকের পক্ষেই কষ্ট। দুপুরে মনে হ'ত, যেন আমরা মধ্যমণ্ডলের গরমে জ্বলছি। কপালে রোদ লাগলে পুড়ে যেত। কিন্তু মাথার পেছন দিকটাতে তখন ঠাণ্ডা

লাগত। সকালে দেখা যেত, ছোট ছোট নালায় জল জমে বরফ হয়ে রয়েছে।

দুপুরে রোদের তেজ খুব। আমরা দুজন নদীতে খুব করে স্নান করলাম। জল তখনও ঠাণ্ডা। আমাদের দেখাদেখি যবগুও নদীতে নেমে পড়ল। তার বহু অনুচর, এমন কি ছেলেরাও ডুব দিয়ে দিয়ে প্রাণ ভরে স্নান করল। গায়ের সমস্ত কাপড় পাড়ে রেখে তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত উলঙ্গ এই বালক, তরুণ এবং প্রৌঢ়দের মধ্যে কাউকেই আমি পেট মোটা কিংবা অনাবশ্যক স্থূল দেখলাম না। তাদের গায়ের রঙ কমলালেবুর মতো সুন্দর। তাদের সৌন্দর্যে যেটুকু খুঁত, সে কেবল তাদের মুখে—চ্যাপ্টা নাক, বসা গাল, চওড়া মুখ। সিংহলে আমি নিজের চোখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী-পুরুষ দেখেছি। তাই স্নান করবার সময় এদের উলঙ্গ হতে দেখে আমি আশ্চর্য হলাম না। এরা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই নগ্ন-স্নান করে। আমাদের দেশেও এমন লোকের অভাব নেই, বিশেষ করে নারীরা তো নিঃসঙ্কোচে কাপড় খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা নদী পার হয়ে এলাম। এই নদীতে আর-একটা নদী এসে মিশেছে। সেই নদীর ধারে ধারে ওপরে উঠে আমরা এক পাহাড়ে এসে পৌঁছুলাম। সবুজে ভরা পাহাড। নির্বৃক্ষ দেশের এই যাযাবরেরা সবুজের সমারোহ দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সবুজের মধ্যে প্রতিপালিত আমাদের তো কথাই নেই। আমাদেব পশুর মধ্যে এখন চামরই বেশি। মধ্য দেশের মোষের মতো বড় আর কালো এই চামর খুব শক্তিশালী। লম্বা লম্বা লোম মাটি ছুঁই-ছুঁই করে। এদের দুধ খুব পুষ্টিকর, মাংস সুস্বাদু। বুনো চামর দেখতে আরও বড়। বুনো চামর শিকারে যবগুর শখ ছিল খুব। কিন্তু এদের শিকার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, এই বিশালকায় জন্তুর মাথায় থাকে তীক্ষ্ণ দুই শিং, শুধু তার ছোঁয়াতেই অনিবার্য মৃত্যু। সাধারণ দু-একটা বাণে এদের কিছুই হয় না। কিন্তু যাযাবরদের হাত বড় পাকা। তারা ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তাক করে বুকের হৃৎপিণ্ডের পাশে বাণ মারা তাদের পক্ষে কিছুই না। দেহে পঞ্চাশটা মানুষের শক্তি থাকতেও এই বুনো চামরকে সাড়ে তিন হাত মানুষের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। যেখানে জঙ্গল বেশি সেখানে জন্তু বেশি। যবগু ভালুক আর হরিণ আর অন্যান্য জন্তু শিকার করে আনত। যেখানে শিকারের সুবিধা থাকত, যবগু সেখানে

আট-দশ দিন না থেকে নড়ত না। তার অনুচরেরা এতে খুশিই হ'ত। কারণ, সেখানে পশুর জন্য ঘাস আর মানুষের জন্য শিকার-করা তাজা সুস্বাদু মাংস পাওয়া যেত অনেক। শিকার পৃথক্‌ও হ'ত আবার সামূহিকও হ'ত। সামূহিক শিকারই সফল হ'ত বেশি। যেদিন সামূহিক শিকার হ'ত সেদিন তাঁবুর চারদিকে শিকার-করা জন্তুর পাহাড় তৈরি হয়ে যেত। লেগে যেত মহোৎসব। ঘোড়ার দুধের মদিরার বন্যা ছুটত। চামরের শিঙে করে লোকে মদ খেত। আর খেত আগুনে ঝলসানো মাংস।

পাহাড় পেরিয়ে আবার আমরা এক মহানদীর তীরে এসে পেঁাছুলাম। তখন যে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল তা হিমালয়ের চেয়ে কম রমণীয় নয়। এখানে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। ডানদিকে আছে হিমাচ্ছাদিত উঁচু এক শৈলশিখর। সে শিখর দেখে উদ্যানের উত্তরে হিমশিখরের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এখানে এই হিমাচ্ছাদিত শৈলশিখরকে লোকে খুব পবিত্র মনে করে। তারা মনে করে, তাদের সবচেয়ে বড় দেবতা এই পর্বতশিখরে বাস করেন। আমাদের দেশেও লোকে মনে করে, হিমশিখরগুলিতে দেবতাদের বাস। যবগু যদি ত্রিশরণ নিয়ে বুদ্ধ-উপাসক না হয়ে থাকত তাহলে সে নিজেও শ্বেত অশ্বের বলিতে যোগ দিত। তার অনুচরেরা পর্বতশিখরে দেবতার উদ্দেশে এক সুন্দর সর্বশ্বেত অশ্ব তরবারির আঘাতে বলি দিল।

সেই মহানদীর তীরে তীরে উত্তর-পূর্ব দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই বনশ্রী বাড়ছে। যবগুর কথা বিশ্বাস করতে আগে আমার মন চাইছিল না। কিন্তু এখন সামনের এই বন্য সৌন্দর্য দু চোখ ভরে পান করছি। ছোট ছোট সব পাহাড়, উঠতে কষ্ট হয় না। চিরহরিৎ দেবদারুর ঘন জঙ্গলে ঢাকা। মাঝে মাঝে আবার সাদা ছালের ভূর্জবৃক্ষ।

মহানদীর উত্তরে জংলী মানুষের দেশে পেঁাছুলে পরে তারা মহার্ঘ মৃগছাল, মধু আর সোনা ভেট নিয়ে এল যবগুর কাছে। যবগু এমনিতেই উদার আর মৃদুস্বভাবের লোক, তার ওপর এখন সে বুদ্ধ-উপাসক। তাই জংলী মানুষদের প্রতি স্নেহ আর সম্মান প্রদর্শন করল। কিন্তু তার অনুচরেরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। সামনে নয়, পেছনে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করল,—জংলী চামর কিংবা ভালুকদের মতো এই জংলী লোকেরাও বিপজ্জনক, আমাদের প্রভুকে ঠকতে হবে।

আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। শাক্তিল অবশ্য একমতই ছিলেন। তিনি বললেন, যবগুর আরও সাবধান হওয়া উচিত।

মহানদী থেকে কিছু দূরে সবুজ-শ্যামল পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট এক সরোবর। যবগু জানত, প্রকৃতির রমণীয়তা আমার ভারি পছন্দ। তাই সে আমাদের দুজনকে আর জন কয়েক অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে সরোবরের তীরে গেল। তখন সেখানে হাজার কয়েক পাখি কলরব করছে। সে দৃশ্য দেখে শীতের সময়ে ভারতের কোনো বিশাল হ্রদের দৃশ্য আমার মনে পড়ল। ভারতের পাখির মতোই এই পাখি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শীতকালে শত শত পাখির ঝাঁক উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে আসে আর বসন্তশেষে দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে যায়। তবু আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, পাটলিপুত্র আর উজ্জয়িনীর হাজার হাজার পাখি এখানে উড়ে এসেছে। তুর্করা পাখিও শিকার করে। কিন্তু যবগু তার অনুচরদের নিষেধ করে দিয়েছিল, তারা যেন পাখি না মারে। তার কথা ছিল : আহারের জন্য প্রাণিহত্যা যদি অনিবার্যই হয় তবে এমন প্রাণী হত্যা করো, যার একটিতে কয়েক শ লোকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, এমন প্রাণী হত্যা ক'রো না, যার কয়েকটিতে মাত্র একজনের ক্ষুধা মেটে।

আমি এমন সব তুর্ক-যোদ্ধা দেখেছি, যারা পুরো একটা ভেড়ার মাংস খেয়ে ফেলতে পারে। দু-একটা পাখি কিংবা ছোট মাছ তাদের কাছে কী?

দিন এখন বড় আর রাত ছোট। মধ্যাহ্ন অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। অনুচরেরা ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সরোবর আর তার আশে-পাশের সৌন্দর্য, পাখির কলরব—সব মিলিয়ে মন আমার এমন ভরে উঠেছে যে, ফিরতে ইচ্ছা করছে না। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। এখানে তার গতিও যেন ধীর হয়ে পড়েছে। সূর্যে লালিমা বেড়ে চলেছে, আর সেই সঙ্গে যবগুর অনুচরদের চিন্তা। সেই শান্ত প্রকৃতির মাঝে তাদের চিন্তা আমার কাছে অকারণ মনে হচ্ছে। আমরা পঞ্চাশজনের বেশি ছিলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদের পাশের জঙ্গল থেকে বন্য মানুষের বিরাট একটা দল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্ত্রধারণের সুযোগ পর্যন্ত দিল না। তবু তুর্করা অপরিসীম বীরত্ব দেখাল। কিন্তু একজনের ওপর দশজন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লে বীরত্বে কিছু হয় না। আমরা দুজন ভিক্ষু অস্ত্রধারণ করতে পারি না। তাছাড়া তুর্কদের শত্রুদের

সঙ্গে আমাদের তো কোনো বিরোধ নেই। তাই রক্তের ধারা বইতে দেখেও আমরা নীরব দর্শক হয়ে রইলাম। আমাদের সঙ্গীরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাঁবু ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এমন সময় কয়েকটি নৌকো তীরবেগে তীরের দিকে ছুটে এল। এক-একটা নৌকোয় পনের-কুড়িজন করে ধনুর্ধর। তারা চিৎকার করতে করতে আমাদের কাছে এল। আমরা ভাবলাম, আমাদের যাত্রা এবার মহাযাত্রায় পরিণত হবে। কিন্তু তা হ'ল না। তাদের মধ্যে থেকে একজন তলোয়ার না উঠিয়ে হাত ওঠাল। হাতখানা আমার কাঁধের ওপর রাখল। আমরা একে অপরের ভাষা বুঝলাম না। কিন্তু সঙ্কেত মানুষের এক অপূর্ব ভাষা। সেই ভাষায় সে যেন বলল : মা ভৈঃ।

ষোল

আমরা তাদের কাছে ঠিক এমনটা আশা করিনি। আমরা শুনেছিলাম, এই অরণ্যচারীরা তুর্কদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু তাদের মুখভঙ্গি আর হাবভাব দেখে সে কথা মিথ্যা মনে হ'ল। তারা আমাদের ইশারায় তাদের পেছন পেছন যেতে বলল। এখন এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাওয়া আমাদের পক্ষে একই কথা। আমরা ভাবলাম, এই ফাঁকে নতুন এক জগৎ দেখা হয়ে যাবে, যে জগৎ দেখার সৌভাগ্য হয়তো আর কারও হয় নি!

তাদের নৌকোগুলো নিচে সরোবরে দাঁড়িয়ে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র পিঠে বেঁধে তাদের পেছন পেছন রওনা হলাম—ঘটনাক্রমে তার মধ্যে কিছু বইও ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই অরণ্যচারীরা যবগু আর তার অনুচরদের জীবন্ত ছাড়বে না। কিন্তু আমরা নিরুপায়!

তারা আমাদের একটা নৌকোয় নিয়ে তুলল। নৌকো সরোবরের একদিকে তীব্রবেগে ছুটে চলল। বাতাস ছিল মন্থর, সরোবরের জল শান্ত। এক প্রহর পরে তারা আমাদের নৌকো থেকে নামল। তাদের কয়েকজন অবশ্য নৌকোতেই রয়ে গেল। আমাদের তারা ছুটিয়ে নিয়ে চলল উত্তরের দিকে। ঘন জঙ্গল। সূর্যের আলো সেখানে পৌছয় না বললেই হয়।

এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। এ কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। আমার তো মনে হয়, তুর্করা যদি তাদের খোঁজে বেরিয়েও

পড়ত তাহলে তারা পথ হারিয়ে ফেলত। আমাদের সঙ্গে দশজন অরণ্যচারী ছিল। অন্তেরা হয়তো যবগুর সঙ্গে যুদ্ধরত সঙ্গীদের সাহায্যে পেছনেই রয়ে গেছে। নৌকোগুলো হয়তো তাদের ফিরিয়ে আনতে গেল।

দিনমান তখন দীর্ঘ, আর রাত্রি অন্ধকার নয়। কারণ, এখানে গোধূলি শেষ হতেই উষার আবির্ভাব ঘটে। মধ্যরাত্রেও জ্যোৎস্নার চেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। তাই অন্ধকারের জন্ত রাত্রে পথচলা বন্ধ রাখার দরকার ছিল না। দরকার ছিল কেবল বিশ্রামের, বিশেষ করে আমাদের দুজনের। জানি না, কাদের জন্ত রাত্রি দেড় প্রহর কাল তারা জঙ্গলে রয়ে গেল। লোহা আর চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালল। এই আগুন মাংস পোড়াবার জন্ত নয়, কারণ তারা কাঁচা মাংসও খায়। বন্ত জন্তরা আগুন দেখে কাছে আসে না, তাই হয়তো এই আগুন জ্বালা। সঙ্গে করে তারা যে মাংস এনেছিল তা পুড়িয়ে খাবার সময় আমাদেরও ভাগ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ইশারায় জানালাম যে, আমরা খাব না। তার কারণ তারা বুঝতে পারল না। কিন্তু প্রসন্ন মুখে দু-তিন বার না করায় তারা আর জোর করল না। ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। আমরা শুয়ে পড়লাম। পথশ্রমের জন্ত ঘুমও এসে গেল। অনেক পরে ঘুম যখন ভাঙল, দেখলাম, এক শ'রও বেশি লোক কী সব বলাবলি করছে। যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হয়ে তারা যেন আমাদেরই প্রতীক্ষা করছে।

আমরা উঠে বসলাম। তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন আমাদের কাছে এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা তুর্কীতে বলল: আমরা এখন রওনা হব। মনে তোমরা কোনো রকম ভয় রেখো না।

আমরাও তাদের জানালাম: আমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই।

খাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, দুপুরের পর আমরা খাই না। আমাদের পোশাক ছিল অসাধারণ—তপ্ত তাম্রবর্ণ মোটা পশমের সংঘটী আর চীবর। এমন পোশাক-পরা লোকদের তারা কখনও দেখেনি। একদিন আগেই আমরা মাথা কামিয়েছিলাম। তাদের গালে দাড়িগোঁফ ছিল নামে মাত্র। মাথার চুলে ক্ষুর কখনও ছোঁয়ানোই হয় নি। তাদের মোঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখাবয়বের সঙ্গেও আমাদের কোনো সাদৃশ্য নেই। বাইরের জগতের মানুষের মধ্যে তারা কেবল তুর্ক আর অনারদেরই দেখেছে, যাদের চেহারার সঙ্গে তাদের মিল আছে। আমাদের মতো লম্বা নাক, সোনালী অথবা নীল চোখ তারা

কখনও দেখেই নি। তাই আমাদের সম্বন্ধে তাদের অসীম কৌতূহল। শাণ্ডিলের পিতা অবার রাজকুমার হলেও তাঁর চেহারায় তুর্ক-ছাপ ছিল না। তার কারণ, তখনকার যাযাবর বংশীয় রাজপুত্রেরা কাংস্যকুমারীদের পাণিগ্রহণ করত। এই সংমিশ্রণেই সঙ্করের উদ্ভব। আমাদের সাদাসিধে অথচ তাদের চোখে অভিনব বেশভূষা, তাদের তো কৌতূহলী করে তুলবেই।

অল্প তুর্কী জানা প্রৌঢ় লোকটির মনে মনে কিছু বিজ্ঞতার অহমিকা ছিল। থাকা খুবই স্বাভাবিক। বহুদিন স্বজাতির প্রতিনিধি হয়ে তাকে তুর্ক শাসকের দরবারে ভেট নিয়ে যেতে হয়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেখানে দু-এক বছর কাটাতেও হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে সে আমাদের প্রশ্ন করল: তোমরা তো দেববাহন, না?

শাণ্ডিল বললেন: হ্যাঁ।

সে তখন তার নিজের ভাষায় সঙ্গীদের কাছে কী সব বলল। সম্ভবত আমাদের গুণকীর্তনই করল। বোধ হয় বলল: আমাদের দেববাহনের চেয়ে এঁদের শক্তি অনেক বেশি, অনেক অদ্ভুত। এঁরা মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন.. বৃদ্ধকে যুবা করতে পারেন।

বৃদ্ধকে যুবা করা এদেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, এদেশের লোকেরা বৃদ্ধদের জীবিত রাখতে চায় না, কোনো-না-কোনো অজুহাতে এমন জায়গায় নির্বাসন দেয়, যেখানে তারা আপনা থেকেই মরে যায়।

তারা আমাদের রাত্রের সেই অবশিষ্ট পোড়া মাংস খেতে দিল। কাছেই জল ছিল। মাংস খেয়ে আমরা জল খেলাম। তারপর শুরু হ'ল আমাদের যাত্রা। এবার আমরা জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলাম। ছোট ছোট পাহাড়। উঠতে কষ্ট হয় না। তিনদিন পর্যন্ত আমরা পাহাড়ের সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে চললাম—কখনও পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কখনও বা ঢালু কিংবা সমতলভূমির ওপর দিয়ে। আরও একদিন পথচলার পর গতি ধীর হয়ে এল। এখন আর তত তাড়াতাড়ি ছিল না। মাঝে মাঝে থেমে অরণ্যচারীরা জঙ্গলে শিকার করত। জলাশয়ে মাছ ধরত, পরিষ্কার রাত্রে জলপক্ষী মারত। চতুর্থ দিন দুপুরবেলা জঙ্গল থেকে আমরা ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। সেদিকেই আমরা রওনা হলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, চামড়ার দশ-বারটা তাঁবু। সেখানকার নারীপুরুষ সবাই এসে আমাদের সঙ্গীদের স্বাগত জানাল, দোভাষীর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাল। তাঁবুগুলি তুর্ক-

যাযাবরদের মতো নয়, খুঁটি পুঁতে তার ওপর চামড়া খাটানো। কাপড়ের কোনো ব্যবহারই নেই। মহার্ঘ মৃগচর্ম যখন এত সুলভ আর এমন শীতে চামড়ার পোশাকই যখন দরকার তখন পশমের কাপড়ের কী প্রয়োজন? তারা ভেড়াও পুষত না।

আসতে-না-আসতেই মেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরল। চীবরে হাত বুলিয়ে দেখল। কয়েকজন তরুণী যখন আমাদের কামানো মাথায় হাত দিতে গেল তখন আমার ভয় হ'ল, এরা কি আমাদের খেলার পুতুল ভেবেছে? তাদের ব্যবহারে কিন্তু ছেলেমানুষী ভাব। বৃদ্ধ পৌঢ়—সবাই যেন একদল বয়স্ক শিশু। তাদের সরলতা, স্বাভাবিকতা আর আপন-ভোলা ভাব আমার ভারি ভালো লাগল। কিন্তু তাই বলে খেলার পুতুল হতে নিশ্চয় চাই না। হঠাৎ আমাদের দিকে দোভাষী সর্দারের দৃষ্টি পড়ল। সে যেন কী বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের হাত থেমে গেল। তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল সমীহ ভাব। দোভাষী বোধহয় বলেছে, আমরা দেববাহন, জীবন-মৃত্যুকে বশ করতে পারি।

খানিক পরে তারা বছর পাঁচেকের একটি ছেলেকে আমাদের সামনে নিয়ে এল। তার ফ্যাকাশে মুখ আর কঙ্কালসার চেহারা দেখেই বুঝলাম রুগ্‌ণ। কি আমাদের কাছে তো কোনো ওষুধ নেই, আর এখানকার গাছগাছড়ার মধ্য থেকে পরিচিত ঔষধি খুঁজে বার করাও সহজ নয়। তুর্কদের হাতে পড়ার পর আবার আমি চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলাম, তাই কিছু ওষুধ সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। কিন্তু সরোবরের তীরে বনবিহার করার সময় সেগুলি আনার প্রয়োজন বোধ করি নি। এখন মনে হ'ল, আমার দু-তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে যদি সেগুলো নিয়ে আসতাম তাহলে খুবই ভালো হ'ত।

আমার চেয়ে শান্তিলেরই ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশি। তিনি বললেন: এত চিন্তা করছেন কেন? আমাদের গন্তব্যস্থান তো এ নয়। একটু বিশ্রাম করেই আবার আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাজেই যমরাজ সহোদর বৈদ্যের অনুসরণ করুন।

"যানি কানি চ মূলানি যেন কেনাপি পিংশয়েৎ
যস্য কস্যাপি দাতব্যং যদ্বা তদ্বা ভবিষ্যতি।"

আমি উঠে দেবদারু আর ভূর্জবৃক্ষের তলায় গেলাম। অনেক খুঁজে কোমল চিকণ পাতাওয়ালা একটা গাছের কয়েকটা ডাল ভেঙে আনলাম। দোভাষীকে বললাম রুগ্‌ণ ছেলেটাকে শান্তিলের হাতে তুলে দিতে। আমার চেয়ে শান্তিলের

ওপরই আমার বিশ্বাস বেশি। তাছাড়া কাউকে প্রতারণা করার সাহসও আমার নেই। শান্তিল ছেলেটার গায়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচবার পাতগুলো বুলোলেন। তারপর সেগুলো ছিঁড়ে দোভাষীর হাতে দিয়ে বললেন : এগুলো মা'র দুধের সঙ্গে বেটে সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়াবে।

সেখানে উপস্থিত নরনারীদের ওপর এর প্রভাব পড়ল খুব। দুধ বলতে তারা মা'র দুধই বোঝে। তা-ও ছেলেবেলায়ই যা খায়। তারপর আর দুধের ব্যবহার তারা জানে না। অথচ দুগ্ধবতী মা'র অভাব নেই তাদের মধ্যে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম। জানি না, ছেলেটার কী হ'ল।

কিছু দোভাষীর কাছে শুনলাম আর কিছু আন্দাজ করলাম যে তাদেব নতুন শাসকের প্রতিকূল ব্যবহারেব জন্য তারা অসন্তুষ্ট ছিল। তারই প্রতিশোধ তারা নিল এমনিভাবে আক্রমণ করে। তারা হয়তো জানত না যে, যাদের ওপর তারা আক্রমণ করল তাদের মধ্যে রয়েছে স্বয়ং যবগু—উপ-কআন। যবগুর কথা জিজ্ঞাসা করে যে জবাব পেলাম তাতে বোঝা গেল না, সে নিহত না বন্দী।

চারদিন হেঁটে আমবা এক পাহাড়ের ওপর এসে পৌছুলাম। সেখান থেকে দূরের এক সমুদ্র দেখা গেল। সঙ্গীরা বলল—মহাজল। আমরা তার অর্থ করলাম—সমুদ্র। কিন্তু যখন আমরা ঐ পাহাডেরই অন্য এক উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌছুলাম তখন সন্দেহ হতে লাগল, সত্যিই হয়তো সমুদ্র নয়! পরের দিন আমবা মহাজল সরোবরের* ধারে পৌছে গেলাম। জলে হাত ডুবিয়ে দেখলাম খুব ঠাণ্ডা। খেয়ে দেখলাম সাধারণ জলের মতোই মিষ্টি। শান্তিল বললেন : এ হচ্ছে মিষ্টি শীতসমুদ্র। তখন বাতাস ছিল কম, তাই নীলজলে

---

* মহাজল সরোবর হচ্ছে, বৈকাল হ্রদ। এই হ্রদ রয়েছে সাইবেরিয়ায়। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ এটি। আজও সেখানে সুদূর অতীতের এমনসব প্রাণী পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য সব জায়গা থেকে যারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৌরাণিক কালেব সেই প্রাণী ঠিক আগের মতোই সেখানে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল পূর্বে এই হ্রদের গহন প্রদেশে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তার ফলে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে ১৭৫০ রকমেব জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১১২৯ রকম প্রাণী আজ আর পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু দিন আগে আদিম কালের এক মাছ পাওয়া গেছে। এক যুগ আগে এই জাতের মাছ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে।

ঢেউ ছিল না বেশি। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাতাস যখন জোরে বইতে শুরু করল তখন তাতে সত্যিই সমুদ্রের মতো উত্তাল ঢেউ উঠতে লাগল। তখন আমরা বুঝলাম, সমুদ্র না হলেও এ এক মহাসরোবর।

মহাসরোবরের তীরে তখন মহোৎসব চলছিল। তাই হাজার হাজার নরনারী সেখানে একত্র হয়েছিল। আমোদ-প্রমোদ তাদের জীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ। আহারের জন্য শিকার আর মধু সঞ্চয়, তা-ও তারা আমোদ-প্রমোদের সঙ্গেই করে। তুর্ক যাযাবরেরাও নাচগান আর পান-মহোৎসব পছন্দ করে। কিন্তু এই বনচরেরা এ বিষয়ে তাদের অগ্রণী। পূর্ণিমার আট দিন আগে মহোৎসব শুরু হ'ল। চলল পূর্ণিমার পর আট দিন পর্যন্ত। রাত্রে অন্ধকার ছিল না, তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল এই মহোৎসব।

দোভাষী সর্দারের চেয়ে তাদের ওপর যার প্রভাব বেশি, সে হচ্ছে তাদের ওঝা। মাঝ রাত্রে দেবতা তার ওপর ভর করত। দেবতার আবাহনের জন্য তাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হ'ত। বহু বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর পোষাক পরতে হ'ত। পূজার উপচার হিসাবে তার সামনে থাকত মানুষের মাথার খুলি, তাতে মধুর মদিরা। হাতে থাকত চামড়ার বাদ্য। দেবতা প্রথমে তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলত: সৃষ্টির আদি থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করে আসছি। যখনই তোমরা আমার আদেশ অগ্রাহ্য করেছ তখনই আমি তোমাদের চরম শাস্তি দিয়েছি। কত লোককে মহামারীতে মেরেছি, বরফের তলায় চাপা দিয়েছি, বসন্তের বেগবতী ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছি, আর অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।

ওঝা যখন কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করত তখন শ্রোতাদের চোখেমুখে ফুটে উঠত সন্ত্রস্তভাব। তাদের ভয় হ'ত, দেবতা আবার ক্রুদ্ধ না হন! সর্দার আর অন্য বৃদ্ধেরা কাতর প্রার্থনা জানাত দেবতার কাছে। ভেট দিত। আমরা দুজন ওঝাকে ভয় করতে লাগলাম, পাছে সে আমাদের তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তারও আমাদের সম্বন্ধে কম ভয় ছিল না। সে তার প্রভাব বৃদ্ধির জন্য জেনেশুনে কতভাবে তাদের প্রতারণা করছে! কিন্তু এ হচ্ছে জীবিকার প্রশ্ন।

মানুষ যতই দেশভ্রমণ করে ততই তার জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। আমি যদি আমার দেশবাসীদের কাছে এ দেশের কথা বলতাম তারা হয়তো বিশ্বাসই করত না। কিন্তু আমি তো দেখেছি, এখানে

বরফের ওপর দিয়ে বিনা চাকার গাড়ী চাকাওয়ালা গাড়ির চেয়ে কত তাড়াতাড়ি ছুটে চলে। আমাদের দেশে কুকুরকে দেবতার বাহন বলা হয়, কিন্তু এখানে চার কিংবা ছ কুকুরের রথ চলে। শীতের সময় লোকে এখানে তিন হাত লম্বা কাঠের জুতো পরে বরফের ওপর দিয়ে যোজনের পর যোজন দৌড়োয়। এসব কথা আমাদের দেশে কে বিশ্বাস করবে? দোভাষীর কাছে আমি শুনেছি, এখান থেকে উত্তরে সাদা রঙের ভাল্লুক পাওয়া যায়। উত্তরে দু-তিন মাসের পথে আসল লবণ-সমুদ্র। বছরে ন মাস তার জল বরফ হয়ে থাকে। সেখানে তিন মাস করে দিন আর তিন মাস করে রাত হয়। এসব কথা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় নি। আমরা তো বিশ্বাস করি, এমন দেশও আছে, যেখানে এক পা-ওয়ালা মানুষ বাস করে। এত বড় বড তাদের কান যে, একটা পেতে আর-একটা গায়ে দিয়ে শুতে পাবে। এমন সব দৈত্য আর রাক্ষসদেব গল্প যদি অবিশ্বাস না করি তাহলে এসব কথা অবিশ্বাস করব কেন?

আমরা হয়তো উত্তরের হিমসমুদ্রের দিকে যেতাম, কিন্তু এই বনচরেরা সবসময় ওদিকে যাত্রা করে না। সেখানে জঙ্গল নেই। নদীর মাছ আর বরফে বাস-করে এমন মৎস্যজীবী শ্বেতভাল্লুক জাতীয় জন্তু শিকারে ওপরই মানুষকে জীবিকা নির্বাহ কবতে হয়। শীতসমুদ্রের ধারের এই বনচরেরা গ্রীষ্মকালেই এখানে আসে কিংবা এখান থেকে আরও উত্তরে যায়। কিন্তু শীতকালে তারা দক্ষিণে নামে। আমরা যদি জানতে পারতাম, উত্তরে গিয়ে মৎস্যজীবী লোকদের দেখা পাব তাহলে ওদিকে যাবার সাহস করতাম। পৃথিবীর উত্তরে সেই মহাসমুদ্র একবার নিজের চোখে দেখে আসতাম।

দোভাষী সর্দার আর তার সঙ্গীরা কেন যে আমাদের এখানে এনেছে আব কেনই-বা এত ভালোভাবে রেখেছে তা বলা মুস্কিল। হয়তো আমাদের বিচিত্র আকৃতি তাদের কাছে কৌতূহলের বস্তু। অথবা তারা হয়তো আমাদের কোনো দেবতার ওঝা মনে করেছে। তাদের এখানে ওঝাদের খুব কদর। হতে পারে, মানুষ স্বভাবে ক্রুর নয়, কোনো কারণে কারও সঙ্গে শত্রুতা হলে ক্রুর হয়ে পড়ে। আমরা যে তুর্ক নই তা তারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। তাই আমাদের মেরে কী লাভ তাদের? আমাদের মাংস তো তারা খেতে পারবে না। তাছাড়া তাদের ওঝা আমাদের ভালো চোখে দেখতে শুরু করেছিল—ওঝার সম্মান আর শাসন কোনো রাজার চেয়ে কম নয়। ওঝা

যখন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল তখন আমরা তাকে বলেছিলাম, আমরা বুদ্ধদেবতার ওঝা। আমাদের দেবতার প্রতি যাতে তার কোনোরকম ঈর্ষা না হয়, তাই আরও বলেছিলাম, পৃথিবীর কোনো দেবতার সঙ্গেই আমাদের দেবতার বিরোধ নেই। তিনি অন্য কারো রাজ্য দখল করতেও চান না। তোমাদের দেশের লোকের সঙ্গে যেমন আমরা ভাব রাখতে চাই তেমনি চাই তোমাদের দেবতার সঙ্গে।

প্রথম দিনের কথাতেই ওঝার আশঙ্কা আমরা অনেকটা দূর করে দিয়েছিলাম। তারপর আমাদের ব্যবহার দেখে সে আরও সন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই মহোৎসব যখন শেষ হয়ে গেল, সবাই যখন চলে যেতে লাগল তখন সে আমাদের তার দলের সঙ্গে যেতে বলল।

আমরা এখন চলেছি সবুজ গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ী দেশের মধ্য দিয়ে। পাহাড় বলতে কেউ যেন হিমালয় কিংবা ভারতের কোনো পাহাড় মনে না করেন। খুব ছোট ছোট পাহাড়। বেশির ভাগই মাটি-ঢাকা। তাতে নানারকম বৃক্ষ-বনস্পতি। কোথাও আমরা দিন দশেক থাকতাম, কোথাও-বা কিছু কম বা কিছু বেশি। সব সময় আমরা সোজা দক্ষিণদিকে হাঁটতাম না, কিছুদূর পূর্বে, তারপর দক্ষিণে। সব মিলিয়ে আমরা শীতসমুদ্র থেকে দক্ষিণদিকেই যাচ্ছিলাম। আমি ঠিক বলতে পারি না, তবে যখন এক বিরাট নদীকে শীতসমুদ্রে পড়তে দেখলাম এবং ঘুরেফিরে সেই নদীরই তীরে এলাম তখন আমার মনে হ'ল, হয়তো এ-ই সেই নদী, যার ধারে ধারে আমরা যবগুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, যবগুর লোকেরা বনচরদের শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না। যবগু যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তো তুর্করা তাদের নির্মূল করে ছাড়বে।

আমরা যখন মহানদীর তীরে পৌঁছুলাম তখন সেখানে বরফ পড়তে শুরু করেছে। সেখানে তিনদিকে পাহাড় আর একদিকে নদী। মাঝে সমতলভূমি। সমতলভূমির ঘাস তখন বরফ চাপা পড়ছে। তাই নারীপুরুষ সবাই মিলে ঘাস কাটতে লেগে গেল। শীতকালে পশুদের জন্য ঘাস চাই।

এখানকার মতো এমন শীত আর আমি কোথাও দেখি নি। আগে থেকে অভ্যস্ত না হলে এই শীত সহ্য করা আমাদের পক্ষে মুস্কিল হ'ত। মানুষ এমন প্রাণী যে, সবরকম জলবায়ুই সে সহ্য করতে পারে। আমরা ওঝার কোনো কাজেই লাগতাম না, তবু সে আমাদের সবরকম আরামের দিকে লক্ষ্য

রেখেছিল। আমাদের দুজনের জন্য সে চামড়ার নতুন আংরাখা বানিয়ে দিয়েছিল। এমন শীতে চীবরের চেয়ে আংরাখারই বেশি দরকার। খাবারের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান। নদীর ওপরটা জমে গিয়েছিল। তলায় ছিল জলের ধারা। বনচরেরা বরফে গর্ত করে কখনও কখনও তলা থেকে মাছ ধরত। কিন্তু এইভাবে মাছ পাওয়া খুব আকস্মিক ব্যাপার। শীতসমুদ্রে অনেক লোক ওঝাকে মাছ দিয়েছিল। সেগুলো এখন শুকিয়ে গেছে। ওঝা নিজে যা খেত, আমাদেরও তাই খেতে দিত। খাবারে অন্নের স্থান ছিল না, মুখ বদলানোর জন্য কখনও কখনও বুনো ফল আর কন্দ খেতাম।

ভবিষ্যতের কথা আমরা জানতাম না, ভবিষ্যৎ স্থির করবার হাত আমাদের ছিল না। আমরা পথও চিনতাম না। শুধু জানতাম, পৃথিবীর বহু উত্তরে আমরা রয়েছি। ছ মাস যেতে যেতে ভাষার বাধা আমাদের অনেকটাই কেটে গেল। আমাদের ভাষাজ্ঞান আরও কিছু বাড়ল। ভাষা যে কত বড় জিনিস তা কেবল আমাদের মতো লোকেরাই জানে।

এই বনচর যাযাবরদের মধ্যেও সোনা, রূপো, লোহা আর তামার জিনিসের মূল্য ছিল, ব্যবহার ছিল। তাই বাইরের লোকেদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখতে হ'ত। প্রতি বছর নিজেদের পণ্য বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা তাদের একটা মস্ত কাজ। কিন্তু তার জন্য সবাইকেই যে নিজের নিজের জিনিস নিয়ে দক্ষিণ দেশে যেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তুর্কদের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে এ বছর তারা সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। যদি এ বছর গরমকালে তুর্করা তাদের শাস্তি দেবার জন্য না-ও এসে থাকে, সামনের বছর না এসে ছাড়বে না।

ওঝার নিজেও কিছু বহুমূল্য মৃগচর্ম আর অন্যান্য জিনিস পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস আনার দরকার ছিল। কিন্তু ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলে তুর্করা ধরে ফেলবে। ওঝার নিজের যাবার সাহস নেই। অন্য কাউকে সে পাঠাতে চাইছে। এমন সময় তার আমাদের কথা মনে পড়ল। আমরা তুর্ক নই, কিন্তু তুর্কদের ভাষা জানি, তুর্কদের দেশে তুর্ক-শ্বশুর সম্মানিত অতিথি হয়ে ছিলাম। তাই যখন কথা উঠল, মনে মনে খুশি হলেও বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। বললাম : তোমাদের উপকারের এই প্রত্যুপকারটুকু করতে আমরা রাজী আছি।

শীত শেষ হবার আগেই ঠিক হয়ে গেল, ওঝার জিনিস বিক্রি করতে তার লোকজনের সঙ্গে আমাদের দক্ষিণাভিমুখে যেতে হবে।

দীর্ঘ ছ মাসব্যাপী শীত শেষ হবার পর বসন্তের আগমনবার্তা ঘোষিত হ'ল। দুপুরে সূর্যের তাপে বরফ গলতে শুরু করেছে। নদী কিন্তু সেই আগের মতোই সাদা চাদর গায়ে দিয়ে আছে। একদিন দশজন লোক আর বারটা বারশিঙা হরিণ সঙ্গে দিয়ে ওঝা আমাদের বিদায় দিল। তার বড় ইচ্ছা, আমরা যেন আবার ফিরে আসি। কিন্তু আমরা বলতে পারলাম না যে, আর আমরা ফিরব না।

আটদিন পথ চলার পর আমরা এক নদী পেলাম। নদীর তীর ধরেই চলেছি। সকালবেলায় নদীর জলে সাদা পুষ্পমালার মতো বরফ ভাসে। শীতের দেশ পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি, তাই আমাদের দুজনের মনে ভারি আনন্দ। আমাদের সঙ্গীদের মনে কিন্তু ভয়। গরমদেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তাছাড়া তুর্করা তাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবে তা-ও তারা জানে না। ষোলদিনের দিন আমরা এক বরফবিহীন জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। সেখানেই প্রথম উট দেখতে পেলাম। উটের সারির মাঝে একজন তরুণীকেও দেখতে পেলাম। শান্তিল যখন কাছে গিয়ে তার সঙ্গে তুর্কী ভাষায় কথা বললেন তখন মনে হ'ল, জাতিতে সে অবার, যদিও নিজেকে অবার বলতে সে রাজী নয়।

ভাষার জন্য এতদিন মন খুলে কথা বলতে না পেরে শুধু মুখেই নয়, বুদ্ধিতেও যেন তালা পড়েছিল। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে না পেরে মনের বোঝা হাল্কা হ'ল। ঘাড়ের কাছে আমার আংরাখা সরে গিয়ে ভেতরের তাম্রবর্ণ চীবর দেখা যাচ্ছিল। দেখে দেখে মেয়েটির যেন আর আশ মেটে না। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল : তোমরা ভিক্ষু নও তো ?

মিথ্যা বলার দরকার ছিল না। টুপি খুলে কামানো মাথা দেখাতেই সে আমাদের ভক্তিভরে প্রণাম করল। দূরে যে ছেলেগুলো বসে ছিল তাদের ডাক দিল। তারপর আমাদের নিয়ে চলল তাঁর তাঁবুর দিকে। মেয়েটি আগেও অনেক ভিক্ষু দেখেছে। তাদের এখানে সবাই বুদ্ধভক্ত। মেয়েটি বলল, এখান থেকে দু দিনের পথে এক সংঘারাম আছে। আমাদের সঙ্গীরা যে হাটে তাদের জিনিস বিক্রি করবে সেই হাট নাকি সেখানেই বসে। সেখানে চীনের ব্যাপারীরাও আসে।

কথা বলতে বলতে জানি না কখন তাদের তাঁবুর কাছে এসে গেলাম। আগেই আমরা আংরাখা খুলে ফেলেছিলাম। বিশুদ্ধ ভিক্ষুর বেশে আমাদের

আসতে দেখে তাঁবুর যত নারীপুরুষ ছুটে এল। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে বলল : এঁরা জম্বুদ্বীপের ভিক্ষু। শীতসমুদ্র আর উত্তরের বনচরদের কাছ থেকে আসছেন।

তখন নারীপুরুষ সবাই ভক্তিভরে মাটিতে হাত রেখে আমাদের প্রণাম করল। তাঁবুর বাইরে আসন পেতে বসতে দিল। চামরের গরম দুধ নিয়ে এল। আমরা আমাদের সঙ্গীদের পরিচয় দিলাম পূর্বদেশের লোক বলে, ওরা যেমনটা শিখিয়ে দিয়েছিল। তাদের কাছেই শুনলাম, বনচরেরা যবগুকে কিছুদিন বন্দী করে রেখে আবাব সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে। যবগু তাদের মার্জনা করেছে। খবরটা শুনে ভারী আনন্দ হ'ল। সঙ্গীদের যখন আমি খবরটা দিলাম, প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারল না। পরে অবশ্য খুব খুশি হ'ল।

সেদিন আমরা দুপুরে এসেছিলাম। পরের দিন আর যাওয়া হল না। তার পরের দিন রওনা হলাম। মেয়েটির স্বামী আর কাকা চলল আমাদের সঙ্গে। হাটে তাদেরও কাজ আছে। আমাদের পক্ষে ভালোই হ'ল।

ধীরে ধীরে প্রকৃতি চোখ মেলে চাইল। সাদা সাদা ভূর্জগাছে নবকিশলয়েব সমারোহ। চারিদিক রূপেরঙে উদ্ভাসিত। পাখির কূজনে আকাশ-বাতাস মুখরিত। বসন্ত এসেছে। বসন্তের এই মনোরম পরিবেশেব মধ্য দিয়ে দুদিন পথ চলার পর নদীর ধারে সেই হাটে গিয়ে আমরা পৌছুলাম। নদীর তীরে শত শত তাঁবু পড়েছে। আমরা মনে করেছিলাম, আমরাই বুঝি উত্তর থেকে প্রথম এলাম। কিন্তু সেখানে পৌছে দেখলাম, বাবশিঙা হরিণ আর চামড়ার তাবু নিয়ে বনচরের দলও এসে গেছে। নিজেদের লোক পেয়ে আমাদের সঙ্গীরা খুব খুশি হ'ল। দলের লোক দলে মিশে গেল। আমরা দুজন মেয়েটির স্বামী আর কাকা, এই উপাসকের সঙ্গে সংঘারামেব উদ্দেশে রওনা হলাম।

সুন্দর কারুকার্য আর চিত্রালংকৃতকরা এই সংঘারাম। শীতে এখানে পঞ্চাশজন ভিক্ষু থাকেন। অন্য সময় তাঁরা যাযাবর উপাসকদের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান। সংঘারামের দ্বারদেশে পৌছুতেই প্রসন্নমুখ এক ভিক্ষু এগিয়ে এলেন। কোন্ ভাষায় কথা বলব, ভাববার অবসর পেলাম না। তুর্কী ভাষায় তিনি আমাদের বর্ষ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যখন বললাম, উনিশ বর্ষ, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসে আমায় প্রণাম করলেন। তাঁর নিজের বর্ষ বললেন, পনের। এবার শাণ্ডিলের পালা। শাণ্ডিল তাঁকে প্রণাম করলেন। ভিক্ষুদের উপসম্পদা (ভিক্ষুব্রত) গ্রহণ করার সময় থেকে বর্ষগণনা করা হয়, আর সেই অনুসারে

ছোটবড় মেনে প্রণাম দেওয়া-নেওয়া চলে। ভিক্ষু বললেন, তিনি চীনদেশের লোক। আমি বললাম, আমি জম্বুদ্বীপের অধিবাসী, আর শাক্তিল কুমারজীবের জন্মভূমি কুচীদেশের মানুষ।

সংঘারামের স্থবির (মোহন্ত), তিনিও বর্ষে আমার চেয়ে ছোট। আমিই এখানে সর্বজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু, তার ওপর বুদ্ধের জন্মভূমি থেকে এসেছি। তাই আমার অভ্যর্থনায় সারা সংঘারামে সাড়া পড়ে গেল।

সতের

কেউ যদি বেশি ঘুরে না থাকে—বেশি ঘুরলেও তো সব জায়গায় যেতে পারে না—তবে চার পা সামনের পৃথিবী তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হবে। যতই সে নিজের চোখে দেখবে কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনবে ততই তার অন্ধকার কেটে যাবে। পৃথিবীর যে অংশে আমি ঘুরেছি সেই অংশ সম্বন্ধে আমি অন্ধকারে ছিলাম না। কিন্তু শীতসমুদ্র থেকে এই যে সংঘারামে এসেছি তার পরের সবকিছুই আমার কাছে অন্ধকার মনে হ'ত, যদি-না এখানে চীনা ভিক্ষু বোধিসংঘ বা বো-সঙের দেখা পেতাম। বো-সঙ্ বললেন, সামনে পথ আমাদের অসমান। দেড় শ যোজনেরও বেশি পথ গেছে এমন এক মরুভূমির ওপর দিয়ে, যে ধরনের মরুভূমি হয়তো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সে সাধারণ পথ নয়, বণিকপথ। মরশুমে সেখান দিয়ে সর্বদা সার্থ যাওয়া-আসা করে। তিনি আরও বললেন, চীনে এখন তথাগতর শাসনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা দেখা যায়। বহু ভারতীয় ভিক্ষু আছেন সেখানে। চীন এক বিরাট দেশ। আমি আগে থেকেই জানতাম, সেখানকার লোক বিদ্যা ও শিল্পানুরাগী। একথা জেনে আমার ভারি আনন্দ হ'ল যে, তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে এক মাসের মধ্যেই চীনে পৌঁছুনো যাবে।

কিন্তু সংঘারামের স্থবির আর ভিক্ষুরা আমাদের ছেড়ে দিতে চাইলেন না। স্নেহের বাঁধন বড় কঠিন। সেই বাঁধনে তাঁরা আমাদের বেঁধেছিলেন। এখানকার ভিক্ষুরা সকলেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি কয়েকজনের বেশ ঝোঁক ছিল। তাই আমরা রয়ে গেলাম। শিগ্‌গিরই বর্ষাবাস শুরু হবে। আর তিনমাস পরেই সার্থ যাতায়াত আরম্ভ করবে। সুতরাং শরৎকালেই যাত্রা করব স্থির করলাম। এ তিনমাস আমরা যতটা

সম্ভব, ভিক্ষুদের বিদ্যাশিক্ষা দিলাম। তুর্ক ভাষায় ধর্মগ্রন্থ তখন খুব কমই ছিল। শান্তিলের সঙ্গে আমি 'অভিধর্মকোষ' আর গোটাকয়েক সূত্র অনুবাদ করলাম। 'প্রতিমোক্ষসূত্র' (ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নিয়মাবলী) আমার কণ্ঠস্থ ছিল। তার আগের তুর্ক-অনুবাদ শুদ্ধ ছিল না, আমরা তা সংশোধন করে দিলাম।

এখানকার লোকেদের জীবনযাত্রার রীতি, পোশাক-আশাক সবই যবগুর দেশের লোকেদের মতো। আসলে জাতিতে এরাও তুর্ক। এই যাযাবরদের মধ্যে একটা বিচিত্র ব্যাপার আছে। ভাষা, দেশ আর কালের সামান্য পার্থক্য থাকলেও তারা একই, কিন্তু যখন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তাদের নেতৃত্ব দেন তখন তারা তাঁরই নামানুসারে নিজেদের নাম বদলে নেয়। দশ বছর আগেই এখানকার লোকেরা নিজেদের অবার বলত, এখন বলে তুর্ক।

বর্ষা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আমরা ভিক্ষুদের পড়াতাম কিংবা তাদের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করতাম। কতবার যে আমাদের মধ্যদেশের বর্ষাকাল বর্ণনা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখানকার সবাই সবুজ দেশের লোক, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে পেরেছেন, জম্বুদ্বীপও এক শস্যশ্যামলা দেশ। বিশ্বাস করতে পেরেছেন, জম্বুদ্বীপ হূণদের এই প্রাচীন ভূমির চেয়ে অনেক সুন্দর। আমি কেবল গুণের কথাই বলতাম না, বলতাম সেখানকার অসহ্য গরম আর লু-র কথা, সাপের কথা। সাপের কথা শুনে ভারতদর্শনের প্রতি তাঁদের উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে যেত। গরম দেশে অন্য সব প্রাণীর মতো সাপ-বিছাও থাকে অনেক—এদেশের লোকের কাছে তা ভয়ের জিনিস।

সংঘারামের স্থবিরের বয়স চল্লিশ বছরের বেশিই হবে। তিনি ছিলেন অবারকুলের লোক। কয়েক বছর কাংস্যদেশে ছিলেন। কূচী ভাষাও কিছু কিছু জানতেন আর সেখানে সংস্কৃতও সামান্য পড়েছিলেন। তিনি চেষ্টা করতেন, এখানেও যেন ভিক্ষুরা সেই রীতিনীতি মেনে চলেন। এ কাজে আমি তাঁকে অনেক সাহায্য করেছি। কিন্তু আমার সেই যৌবনের স্বপ্ন—মহাচীনযাত্রা—সে তো সফল করতে হবে। ভিক্ষুরা এখানে আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই বাহুপাশ ছিন্ন করে আমি যাব কেমন করে? একটি মাত্র পথ আছে—আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের এখানে থেকে যাওয়া। শান্তিলের পক্ষে আমাকে ছাড়া সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি উপলব্ধি করলেন, তাছাড়া আমিও তাঁকে বললাম: মহাচীন যখন এখান থেকে মাত্র একমাসের

পথ আর প্রতি বছরই যখন বহু সার্থ যাওয়া-আসা করে তখন তোমার পক্ষে যাওয়া কঠিন হবে না।

তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

মহাপ্রাবারণার মহোৎসব সমাপ্ত হবার পর শুধু নবপরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকেই নয়, পরম আত্মীয় শান্তিলের কাছ থেকেও বিদায় নেবার সময় এসে গেল। এইদিনটির জন্য সত্যিই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের দুজনের পক্ষেই অশ্রু রোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের নতুন বন্ধু বো-সঙ্ এক চীনা সার্থবাহের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার যাত্রার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বনচরদের দেশের মহার্ঘ মৃগচর্মের খুব চাহিদা আছে মহাচীনের সামন্ত আর রাজপরিবারে। সোনার চেয়েও দামী সেইসব মৃগচর্ম। এই সার্থবাহ রাজধানী য়েহ্-এর বাসিন্দা। যেসব সার্থবাহ চীন থেকে এসেছিল তাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়। সে ছিল বুদ্ধভক্ত। তাই তার সঙ্গে যাওয়ায় আমার সুবিধা ছিল অনেক।

মধ্যাহ্নকালে সংঘারাম থেকে আমরা যাত্রা করলাম। যাত্রাপথে কোথাও পেলাম ঘাসে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড, কোথাও জঙ্গল। দু-এক দিন পরেই জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তৃণাচ্ছাদিত মাঠ আর পাহাড়ের শেষ নেই। আরও এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু এক পাহাড (বোগ্দাউলা) পার হতে হ'ল। তারপর সামনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত মহামরুভূমি (গোবি)। সংঘারাম থেকে দু শ ক্রোশ পথ আমরা চলে এসেছি। এর আরও চারগুণ পথ আমাদের পার হতে হবে মরুভূমির ভেতর দিয়ে। মরুভূমি সমতল নয়। তার এখানে ওখানে ছোট ছোট নগ্ন পাহাড়—পাহাড ঠিক নয়, টিলা। আবার কোথাও-বা নিম্নভূমি। সঙ্গীরা বলল, বর্ষার সময় জলে ভরে যায়, সরোবরের মতো দেখায়। মরুভূমিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা জলের। সার্থ তাই কুয়োর কাছে ছাউনি ফেলত। আমাদের যাত্রা শুরু হ'ত মধ্যাহ্নের পর, চলত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। সার্থবাহ আমাকে ঘোড়া দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার প্রয়োজন আমার ছিল না। একবারই শুধু আমি বাধ্য হয়ে ভিক্ষু-নিয়ম ভঙ্গ করে ঘোড়ায় চড়েছিলাম। আর নয়। বো-সঙের সঙ্গে আমিও চলেছি পায়ে হেঁটে।

আমরা যতই মহামরুভূমিতে প্রবেশ করছি ততই সবুজ তৃণ-বনস্পতি লুপ্ত হচ্ছে। হলুদ রঙের বালি। হলুদের ছোঁয়া লেগে তৃণগুল্মও যেন হলুদ হয়ে গেছে। মরুভূমি একেবারে নির্জন নয়। কোথাও কোথাও চটির ধারে

যাযাবরদের তাঁবু দেখা যেত। তারা দুধ, মাংস আর জ্বালানি বিক্রি করতে আসত। জ্বালানি কাঠ এখানে খুবই দুর্লভ। তবে যেখানে-সেখানে পোষা জন্তুজানোয়ারের মল শুকিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। দেখেছি, যাযাবর মেয়ে আর শিশুর দল সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়িতে রাখছে। যাযাবর মেয়ের মাথায় চুলের রাশি শিঙের মতো করে বাঁধা। দূর থেকে দেখতে লাগে ভারতবর্ষের মোষের শিঙের মতো। আসলে হয়তো মোষ নয়, অন্য কোনো বন্য জন্তু শিঙ। হিমালয়ের এদিকে এসে তো কোথাও আমি মোষ দেখি নি। বো-সঙ্ আর আমি বুঝে পেলাম না, কেশসজ্জায় পশুর শিঙের নকল করার প্রযোজন কী। এতে তো সৌন্দর্য বাড়ে না।

যাযাবরদের দেশে চাষ-আবাদ হয় না। তাদের কপালে অন্ন জোটে না। দূর থেকে আনতে খরচ পড়ে বেশি। তাই মাংসই তাদের প্রধান খাদ্য। বহু বছর থেকে আমি কেবল মাংস খেয়েই কাটাচ্ছিলাম। চীনা সার্থবাহের সঙ্গে থাকাকালে বো-সঙের কাছে শুনলাম- চীনা ভিক্ষুরা মাংস খান না। মহাযানে মাংসভক্ষণ নিষেধ। সবকথা শুনে সেদিনই ঠিক করলাম, আমি আর মাংস খাব না। আমিও তো মহাযানের অনুযায়ী। বোধিসত্ত্বের পথ সুগম নয়। হিংসা ছাড়া মাংস মেলে না। সুতরাং মাংসভক্ষণ নিষ্পাপ হতে পারে না।

চীনে গিয়ে যে কাজ আমি করব তাব জন্য সেখানকার ভাষার পরিজ্ঞান আবশ্যক। প্রথম দিনের পরিচয় থেকেই বো-সঙ্ আমাকে এই কাজে সাহায্য কবছিলেন। কিছুদিন পরেই আমার মনে হ'ল, ভাষা শেখা আমাব পক্ষে কঠিন হবে না। বো-সঙ্ লিপি শুরু করালে আমি দেখলাম, সেখানে উচ্চারণের কোনো প্রয়োজনই নেই, স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণও নেই। আমাদের অঙ্কের মতো চীনা লিপি কেবল অর্থের সঙ্কেত। অর্থাৎ কতগুলো জিনিস আছে বা শব্দ আছে ততগুলো অক্ষর শিখতে হবে। এতে আমি দমলাম না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা বড় কঠিন মনে হ'ল। আমি ভাষা শেখার দিকে বেশি করে নজর দিলাম। যাত্রাপথে সার্থবাহ উপাসকের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা আমি চীনা ভাষায় বলতে পারতাম। লিপি শেখার প্রতি আমার উদাসীন দেখে বো-সঙ্ একদিন বললেন: মহাচীন এক মহাদেশ। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় এত পার্থক্য যে, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের কথা ভালো বুঝতে পারে না। এই লিপিই সব জায়গায় সব লোকে বুঝতে পারে। সুতরাং এই লিপিকে উপেক্ষা করা যায় না।

মধ্যরাত্রে যখন আমরা পরবর্তী চটিতে গিয়ে পৌছুতাম তখন বড় ক্লান্ত লাগত। বড় পরিশ্রান্ত। উপাসক মধুরস কিংবা দ্রাক্ষারস খাবার জন্ত খুব অনুরোধ করত। কখনও কখনও আমরা তা খেতাম। তখন সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল ঘুম। বিছনায় পড়তেই ঘুম এসে যেত। সেই ঘুম ভাঙত পরের দিন সূর্যোদয়ের পর। মুখহাত ধুয়ে পুজোআচ্চা শেষ করতেই আসত প্রাতঃরাশ। উপাসক সার্থবাহ তখনও ঘুমিয়ে। তার তো কোনো কাজ ছিল না। দাস আর ভৃত্যরাই সব করত। সে কেবল আহার করত আর যাত্রার সময় শরীরটাকে নাড়াত। কখনও কখনও এই সময় সে আমাদের সঙ্গে ধর্মচর্চা করত, তাতে দোভাষীর কাজ করতেন বো-সঙ্।

প্রতিদিনই বো-সঙ্ আর আমি একসঙ্গে পথ হাঁটতাম। অহোরাত্রের অর্ধেকটাই কেটে যেত কথাবার্তায়। ভাষা শেখার এর চেয়ে বড় সুযোগ তো আর ছিল না। আমি বুদ্ধিলের কথা বলতাম। বুদ্ধিলেব মুখখানা আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠত। একদিন বুদ্ধিল আর আমি একসঙ্গে মহাচীনের পথে যাত্রা করব সঙ্কল্প কবেছিলাম। বুদ্ধিল তাঁব সঙ্কল্প পূর্ণ করতে পারলেন না। আজ তিনি নেই। তাঁর সঙ্কল্প আমিই পূর্ণ করছি, এতেই আমার আনন্দ। আজ যদি তিনি থাকতেন তাহলে কত ভালো হ'ত! চীনদেশে তাঁর মতো বিদ্বান্ এলে কত সুন্দর হ'ত! আমরা দুজনে মিলে অনেক বেশি কাজ করতে পারতাম। মহাচীনে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের কাজে তিনি অনেক সাহায্য করতে পারতেন।

মরুভূমিতে আমরা বিশ্রামের জন্য কোথাও বেশিক্ষণ থাকতাম না। পথে কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে নি। পথে কোনো পশুর রোগ হলেও সার্থ দাঁড়াত না। অনেক পশু ছিল, তাই অসুস্থ আর অকেজো পশুকে চটির ধাবে ফেলে দিয়েই তারা এগিয়ে যেত। সার্থবাহ প্রাণিহত্যা দেখতে পারত না। তাই মাংসের জন্য প্রাণিহত্যা করা হ'ত না। তবে তাবা প্রাণিহত্যা না করলেও অন্ত কেউ নিশ্চয় কবত, করে মাংস খেত—অবশ্য কেউ ধরে না রাখলে। অনুচরদের মধ্যে কারও অসুখ করলে তার জন্যও সার্থ দাঁড়াত না। স্বয়ং সার্থবাহ অসুস্থ হয়ে পডলে হয়তো একদিনের বেশি অপেক্ষা করত। তারপর হয় সার্থ তাকে ডুলিতে বসিয়ে যাত্রা শুরু করত, নয়তো সার্থবাহ দু-একজন অনুচরকে কাছে রেখে সার্থকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিত। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, আমাদের দুজনের মধ্যে কারও এমন হলে আমরা কেউ

কাউকে ছেড়ে যেতাম না। চটিতে আমাদের দুজনের তখন কী অবস্থা হ'ত, কে জানে! সার্থবাহ নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করত। মরুভূমির পথে যাত্রার এ-ও এক রূপ। তবে আমরা নিরাপদেই চীনের দিকে এগিয়ে চলেছি। আর এক-দুদিন মাত্র বাকি। তারপরই আমরা পৌছে যাব চীন সীমান্তে।

শেষদিন সকালেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দক্ষিণদিকে দূরে একটা অস্পষ্ট জিনিস দেখতে পেলাম। বো-সঙ্ বললেন, এই মহাচীনের মহাপ্রাচার। মহাচীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর এক আশ্চর্য জিনিস। আমাদের দেশে আর অন্য দেশে এই মহাদেশকে চীন কিংবা মহাচীন বলা হয়। এই নাম প্রবর্তিত হয়েছিল আজ থেকে আট শতাব্দী আগে, যখন এখানে চিনবংশের (খৃষ্টপূর্ব ২৫৫-২০৬ অব্দ) শাসন ছিল। এই বংশ সমগ্র চীনরাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এ বড সহজ কাজ ছিল না। এই বংশের তৃতীয় সম্রাট শীহ্-হোয়াঙ্-তী (খৃষ্টপূর্ব ২৪৬-২১০ অব্দ) এই মহাপ্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ তাঁরই কৃতিত্ব। চীনকে ঐক্যবদ্ধ করায় তাঁর হাতই ছিল সবচেয়ে বেশি। অতি প্রাচীনকালে, চীনের অধিবাসীরা কৃষি-শিল্প-ব্যবসাজীবী হয়ে ওঠার প্রারম্ভিক যুগে, মহামরুভূমি আর শীতসমুদ্র পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যাযাবরদের বিচরণভূমি ছিল—যেমন আজ আছে। তাদের বলা হ'ল হূণ। তাদের ভাষায় হূণ শব্দের অর্থ মানুষ। কিন্তু চীনাদের মুখে তা হয়েছে দানব। তারা বরাবর চীনের সমৃদ্ধ অঞ্চলে আক্রমণ করে লুটপাট চালাত। তারা মনে করত, চীনের লোক দুধালো গাই। চিনবংশের আগেও দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু 'শীহ্-হোয়াঙ্-তী'র মতো সম্পত্তি আর প্রভুত্ব কারও ছিল না। তাই তাঁর আগে কেউ তিন শ যোজন (১,৬০০ মাইল) দীর্ঘ এই বিশাল প্রাচীর নির্মাণের কথা কল্পনাও করতে পারত না। চীন সম্রাট তাঁর সমস্ত লোকজনকে চাবুকের বলে এই কাজে লাগিয়েছিলেন। আর তারই ফলে পূর্বের মহাসমুদ্র থেকে পীতনদীর পশ্চিমে যাযাবরদের ভূমি পর্যন্ত এই প্রাচীর নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় খাদ পড়ল, পাহাড় পড়ল, সমতলভূমি পড়ল—তবু সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলতে লাগল। নির্মাণকাজে নিযুক্ত হয়েছিল তিন লক্ষ সৈনিক। আর লক্ষ লক্ষ বন্দী আর বেগার মজুর। সরকারী কর্মচারীদেরও তাদের অপরাধের জন্য দণ্ড দিয়ে এখানে পাঠানো হ'ত, কোপভাজন, পণ্ডিতদের হাতেও কোদাল আর ঝুড়ি তুলে দেওয়া হ'ত। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রাচীর নির্মাণে প্রাণ

বলি দিয়েছে। বহু বর্ষ ধরে কাজ হয়েছে। সাধারণ প্রাচীর নয়, আট-দশ হাত চওড়া আর কয়েক হাজার ক্রোশ লম্বা এই প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছোটবড় দুর্গ, পাহাড়ের ওপর শত্রুসন্ধানের জন্ত ঘাঁটি, কত কী-ই না আছে! নদীর মধ্যে যেখানে প্রাচীর নির্মাণ করা যায় না সেখানে নির্মিত হয়েছে শক্ত মজবুত দুর্গ। যাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এই মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়েছে তাদের সন্তানরা আজও বর্তমান আছে। তাদের জীবনে কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসে নি। যুদ্ধ করার শক্তিও তাদেব কমে নি। চিনবংশের মতো চীন আজ ঐক্যবদ্ধ নয়, বহুধা বিভক্ত।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। প্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ করাব জন্য আমাদের মধ্যে তাড়া পড়ে গেছে। তবু আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীরটাকে দেখলাম। মানুষেয় তৈরি বিরাট বিরাট কীর্তি আমি বহুদেশে দেখেছি। মানুষ পাহাড কেটে বড় বড প্রাসাদ তৈরি করেছে, পাথব কেটে বড বড মূর্তি নির্মাণ করেছে। কিন্তু এ এমন এক প্রকাণ্ড প্রাচীর যে, ক্ষণকালের দৃষ্টিতে একে দেখা যায় না। এক এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে হলে কয়েক মাস ধরে ভ্রমণ করতে হবে। আট শতাব্দী কেটে গেছে, তবু আজও এর গায়ে কালের প্রভাব পড়ে নি। 'শীহ্-হোয়াঙ্-তী'ব এই কীর্তি হাজার হাজার বছর পর্যন্ত এমনই থাকবে।

এই প্রাচীরের ভেতরে মুখ্য নগব কলগন, আর বাইরে সাধাবণ সব ঘরবাড়ি আর একটি বড় মাঠ। সার্থ এই মাঠে এসে থামে। সময় সময় এই মাঠ বিরাট হাটের আকার ধারণ করে। সরকারী কর্মচারীরা তখন বহিরাগত পণ্যদ্রব্যের ওপর শুল্ক আদায় করে। গুপ্তচরেরা নজর রাখে ব্যাপারীর ছদ্মবেশে শত্রু যাতে প্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বিদেশীদেব প্রতি তাই বিশেষ দৃষ্টি। আমরা দুজন ছিলাম বিদেশী। কিন্তু আমাদের চেহারাই বলে দিচ্ছিল, আমরা হূণসন্তান নই, আমাদের দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

আমাদের সার্থবাহ সাধারণ ব্যাপারী ছিল না। সে ছিল রাজসম্মানিত নগরশ্রেষ্ঠী। রাজদরবারে তার প্রভূত সম্মান। তাই সৈনিকেরা তাকে সসম্মানে ভেতরে প্রবেশ করতে দিল। তারই কথায় আমবাও তার সঙ্গে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারলাম। নগরে শ্রেষ্ঠীর নিজের একটা ছোট প্রাসাদ ছিল। সেখানে যাবার আগে সে দুর্গপালের সঙ্গে দেখা করে গেল। তাকে ভেট দিল

পাঁচটি সুন্দর মৃগচর্ম। দুর্গপাল আমাদের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করল। তার রাজা বেন্-শান্-তি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত। তার প্রভাব পড়েছিল মন্ত্রী আর অমাত্যদের ওপর। দুর্গপাল হয়তো তাই আমাকে ভারতীয় ভিক্ষু জেনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান দেখাল।

এত দীর্ঘ পথভ্রমণের পর এখানে এসে আমি যেন নিজেকে অন্ধকার থেকে আলোয় খুঁজে পেলাম। দীর্ঘদিন পরে কেবল যে ভদ্র নাগরিক জীবন আর তার মধুর ব্যবহার উপলব্ধি করলাম, তা-ই নয়, আমি দেখলাম এখানে আগে থেকেই বুদ্ধের শাসন প্রচলিত রয়েছে। এই সীমান্ত নগরের প্রতিটি সড়ক আর গলির ধারে আছে স্তূপ আর মন্দির। ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীদের এক ডজনেরও বেশি বিহার যদি এমন সাধারণ এক নগরে থাকে তবে রাজধানীতে না-জানি কতগুলো আছে। বো-সঙ্ বললেন, বেঈ বংশের বহু সম্রাট সিংহাসনে বসেও ভিক্ষুর মতো জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের রাজধানী তাতুঙের কাছে পাহাড়ের মধ্যে তাদের পাহাড়-কেটে-তৈরি সংঘারাম আজও বর্তমান আছে। জন্মভূমি থেকে এই দূর চীনদেশে এসে বুদ্ধের শাসনের এত প্রচার দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল। আবাব বিরাটসংখ্যক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী দেখে খারাপও লাগল। তথাগত কখনও চাইতেন না যে, দেশের অর্ধেক লোক ঘরসংসাব ছেড়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হয়ে যাক। শ্রমণদের ব্রতপালন সকলেব পক্ষে সহজ নয়। তাই যদি হয় তাহলে তো দুঃশীল নারী-পুরুষরাও কাষায় ধারণ করবে।

কেবল একদিন এখানে থেকে আমরা আবার রওনা হলাম। শীতের প্রথম মাস কেটে গেছে। পথের দু ধারে গম, মটর আর অন্য কত ফসলের সবুজে ক্ষেত ছেয়ে আছে। চীনের চাষীরা খুব পরিশ্রম করতে পারে। তবে সবচেয়ে বড কথা, এখানে ধনী-দরিদ্র, কুলীন-অকুলীন সবই আছে, কিন্তু আমাদেরদেশের মতো বৈষম্য নেই। তথাগত বলেছেন, মানুষ মাত্রই সমান, ভাই-ভাই। তাঁর মনের এই ভাবকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সংঘে তিনি এই সাম্যভাব বড় কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁব নিজের বংশের অনুরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি শাক্যকুমাব যখন ভিক্ষু হতে গেলেন, নাপিত উপালিও তাঁদের অনুসরণ করতে চাইলেন। তথাগত তখন উপালিকেই প্রথম শিষ্য হতে বলেছিলেন, যাতে উপসম্পদায় জ্যেষ্ঠ হবার দরুণ প্রব্রজিত শাক্য তাঁকে অভিবাদন করেন। হাজার বছর কেটে গেছে তথাগতর শাসন প্রচারিত হয়েছে, তবু আজও মধ্যদেশে মানুষে-মানুষে সেই রকমই বৈষম্য বজায় রয়েছে। সাম্য সীমাবদ্ধ আছে কেবল

ভিক্ষুসংঘে। এই মহাদেশে আমি এসেছিলাম এখানকার লোকদের বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথে চলার প্রেরণা যোগাতে, এসে দেখলাম, অনেক বিষয়ে তারা অনেক আগে থেকেই এ পথে চলছে।

যে পথ দিয়ে আমরা চলছিলাম তা ছিল রাজপথ। বহু শতাব্দ নয়, বহু সহস্রাব্দ ধরে হয়তো এই পথে সার্থ যাতায়াত করেছে। পথে এক যোজন অন্তর অন্তর চটি আর পান্থশালা। যাত্রীদের আরামের সব ব্যবস্থাই আছে। তাদের পশুবাও সেখানে ভালোভাবে থাকতে পাবে। প্রত্যেক পান্থশালার ধারে বড় বড় গ্রাম। সেখানে দোকান রয়েছে, তৈরি খাবারও পাওয়া যায়। সকালবেলায় প্রাতঃরাশ সেরে আমরা চটি থেকে বেরুতাম। মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত চলত আমাদের যাত্রা। আহার আর বিশ্রাম করে তারপর আবার শুরু হ'ত পথ চলা। সূর্যাস্তের অনেক আগেই পৌছে যেতাম পরবর্তী চটিতে। তখন আমি পাশের গ্রামে কিংবা সেখানকার সংঘারামে যেতাম। এদেশে অনেক সময় নিছক আমার পোশাকের অভিনবত্বের জন্যই সম্মান পেতাম। সেটা আমার ভাল লাগত না। ইচ্ছা করলে স্থানীয় ভিক্ষুরাও এ পোশাক ধারণ করতে পারতেন। অন্যের পূজনীয় হয়ে থাকার বাসনা আমার ছিল না। অন্যের সেবাই আমার ব্রত। এখানে আমাব জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে চীনা ভাষায় দোভাষীর সাহায্য না নিয়েই, কিছু বলতে পারলেই আমার পরিব্রাজক মন খুশি হ'ত।

বো-সঙ যদি আমার সঙ্গেই ছিলেন, যাত্রাপথে সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তায় কাটত না। মন আমার অন্তর্মুখী হয়ে উঠত। আমি আমার ভাবে ডুবে যেতাম। ভবিষ্যতের কাজের চিন্তা আমায় পেয়ে বসত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তেই আমি পৌছুতে পারতাম না। তখন আমার বুদ্ধিলের কথা মনে পড়ত। বুদ্ধিল যদি আজ থাকতেন তাহলে আমরা দুজনে মিলে কত সহজেই না একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। নিজেকে আমার বড় একা মনে হ'ত। সার্থবাহ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল না। তাতে ভালোই হয়েছিল, নইলে বেশির ভাগ সময়ই আমার গম্ভীর আর বিষণ্ণ মুখ তার চোখে পড়ত।

বো-সঙ ছিলেন সাদাসিধে ভিক্ষু। আমার অনুরক্ত। আমার মানস-সমুদ্রে ডুব দেবার শক্তি তাঁর ছিল না। তবে তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন, মরুভূমির যাত্রাপথে আমার যে মনোভাব ছিল, এখন আর তা নেই। কিন্তু সেদিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল না। আমার পক্ষে তা ভালই হয়েছিল। যদি তিনি

সর্বজিন কিংবা শান্তিলের মতো মেধাবী হতেন তাহলে নিশ্চয় আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেন। তখন হয়তো আমি আমার মনের কথা সব তাঁকে বলতে পারতাম। কিন্তু তিনি কি আমাকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করতে পারতেন? বো-সঙ্ কেবল অনুচর ভিক্ষুই ছিলেন, আমার মননের সঙ্গী নন। তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ে বাৎসল্য ছিল, বন্ধুত্ব নয়। বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন, মনের দিক দিয়ে দুজনের সমান-ভাব।

এক সপ্তাহ পরে আমরা ছীবংশের রাজধানী য়েহ্-এ পৌঁছুলাম। আমার মনে হ'ল, এতটা পথ অতিক্রম করতে যেন মরুভূমির চেয়েও বেশি সময় লেগেছে। বড় বড় অট্টালিকা, হাটবাজার, সুরম্য রাজপ্রসাদ আর কত আকর্ষক সম্ভার নিয়েই-না এই বিশাল নগর আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে! কিন্তু এসব দেখে আমার মনে এতটুকু আনন্দ হ'ল না। বস্তুত, আমার চোখ ছিল নগরের ওপর, আর মন অন্যত্র। নগরের চেয়ে মহামরুভূমিই আমার কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার কেবলই মনে হ'ত, কেন এলাম এখানে? জবাব পেতাম,—মনে নেই, বুদ্ধিলের সঙ্গে এখানে এসে কাজ করবে কথা দিয়েছিলে! আবার এ-ও মনে হ'ত, যেখানে বেশি দুঃখ সেখানেই তো আমার প্রয়োজন। আমার সারা জীবনের শক্তি দিয়ে যদি দুটি প্রাণীরও দুঃখ লাঘব করতে পারি তাহলেই তো আমার জন্ম সার্থক। এখানে যত দুঃখ, শীতসমুদ্রের বনচর আর যাযাবরদের মধ্যেও তত দুঃখ ছিল না। তাহলে আমার কাজের অভাব কোথায়?

সার্থবাহের সঙ্গে নগরদ্বারের ভেতরে প্রবেশ করতেই আমার মনে হ'ল, বিরাট এক পাহাড় যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। এত অবসাদ আমি জীবনে খুব কমই অনুভব করেছি। দ্বাররক্ষীর কাছ থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেলাম, কারণ আমাদের সঙ্গে ছিল নগরশ্রেষ্ঠী। কোথায় যেতে হবে, কোথায় থাকতে হবে—কিছুই আমি আগে জিজ্ঞাসা করি নি। এখনও করলাম না। সার্থবাহ বলল: আমার গৃহই পবিত্র করুন।

আমার তখন বলা উচিত ছিল, কোন্ সংঘারামে থাকব। কিন্তু বলতে পারলাম না। সে যেন আমায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল।

য়েহ নগর চীনের সর্ববৃহৎ নগর নয়। সে সম্মান পেয়েছে ছাঙ্-আন্ আর লোয়াঙ্। য়েহ প্রথমে এক রাজ্যপালের রাজধানী ছিল, ছী-বংশের রাজধানী হয়েছে মাত্র সাত বছর আগে। তাই এখনও তার শ্রীবৃদ্ধি তত হয় নি।

বহু পথ ঘুরে আমরা সার্থবাহের প্রাসাদে এসে পৌঁছুলাম। রাজপ্রাসাদের মতো পাঁচতলা মহল। আগের দিনই খবর পৌঁছে গেছে, সার্থবাহ আসছে। তাই আত্মীয়-পরিজন সকলেই প্রস্তুত ছিল অভ্যর্থনা জানাতে। অভিনন্দনের কিছু অংশ আমিও পেলাম। তিনতলার ওপর সুন্দর পরিচ্ছন্ন এক ঘর পেলাম থাকার জন্য। ঘরের ভেতর প্রবেশ করেই আমার মনে হ'ল, সংঘারামেই আমার যাওয়া উচিত ছিল। ভিক্ষুদের জন্য নগরবাস নয়, গৃহস্থের ঘরে তাঁদের থাকা উচিত নয়।

আঠার

জানি না কেন, য়েহ-তে এসে প্রথমদিন আমার মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কোনো নতুন দেশে গিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়া কিংবা বিষণ্ণ হওয়া পর্যটকদের স্বভাববিরুদ্ধ। তারা যেখানেই যায় সেখানকার লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমার মন দু-এক দিনই বিষণ্ণ ছিল। সার্থবাহ আমাদের দরবারে নিয়ে গেল। সম্রাট বেন-শ্বেন্ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমার সম্বন্ধে তিনি আগেই সার্থবাহের কাছে শুনেছিলেন। আমার অসাধারণ যাত্রার কথা শুনে তাঁর মনে আমার সাহস সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জেগেছিল। সম্রাট স্বয়ং এখানকার সবচেয়ে বড় আর সম্মানিত থিয়েন্-পিঙ্ বিহারে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার আহার আর আরামের সমস্ত বন্দোবস্তই তাঁর দিক থেকে হ'ল। মন্ত্রী আর রাজকর্মচারীদের তিনি আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন আমাকে সকল রকম সাহায্য করেন।

আমি থিয়েন-পিঙ্ বিহারেই থাকতে লাগলাম। আমার সঙ্গে বো-সঙ্'ও ছিলেন। এখানেই ভিক্ষু ফা-চে'র সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তিনি আমার কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন। চীনে দুই বিরাট আচার্য ছিলেন— কন্-ফু-জু বা কন্-ফু-শী আর লাউ-জু। তখন শাক্যমুনি মধ্যমণ্ডলে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কন্-ফু-শী'র শিক্ষা ছিল ইহলৌকিক। লাউ-জু ছিলেন ধর্মাচার্য। এই দুই মতের আচার্য বৌদ্ধধর্মের অভিবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুদের মধ্যে যখন অতিচারও দেখা যেত তখনই এই দুই আচার্যের অনুগামীরা আমাদের অনিষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগত। বৌদ্ধধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়। আমাদের এই মনোভাব তাঁদের কাছে

আরও বিপজ্জনক মনে হ'ত। তাঁরা বলতেন: তোমরা আমাদের গ্রাস করবে বলে এই চাল বার করেছে।

য়েহ্-এর সম্রাট বেন্-শেন্ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। আমি বিহারে যাবার পরই তিনি তাঁর সংগৃহীত তালপত্র আর ভূর্জপত্রে লেখা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলি চীনের অধিবাসীদের জন্য অনুবাদ করতে বললেন। আমার আগে আরও ভারতীয় ভিক্ষু এখানে এসেছেন। বহু গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরা করেছেন। বারাণসীর গৌতম প্রজ্ঞারুচি সতের-আঠারটি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমাদের উদ্যানের অধিবাসী উপশূন্যও কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। প্রজ্ঞারুচির সহকারী আমাদের উদ্যানের অন্য একজন ভিক্ষু বিমোক্ষপ্রজ্ঞও কয়েকটি গ্রন্থের ভাষান্তর করেছেন। বিমোক্ষপ্রজ্ঞকে এখানকার লোক কপিলবস্তুর শাক্যদের, অর্থাৎ তথাগতর জাতি বলে মনে করত। শক আর শাক্যদের সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ধর্মবোধি আর একজন ভারতীয় ভিক্ষু। তিনি অনুবাদ করেছেন 'মহাপরিনির্বাণসূত্র'। চীনা ভাষায় আমার দখল ছিল না বটে, কিন্তু কথাবার্তা বলতে পারতাম। ক্রমে ভাষার জ্ঞান আমার বাড়তে লাগল। অবশ্য তখনও আমি কোনো চীনা পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে অনুবাদেব কাজ করতে পারতাম। এ কাজের পক্ষে ফা-চে খুবই উপযুক্ত লোক ছিলেন। আমাকে সাহায্য করার জন্য আরও অনেকে প্রস্তুত ছিলেন।

য়েহ্-এ একা আমি ছিলাম। কিন্তু উত্তর আর দক্ষিণ চীনে তখন বহু ভারতীয় ভিক্ষু অনুবাদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তথাগতর উপদেশ যখন কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ ছিল তখন তা এখানকার লোকেদের কাছে নিরর্থক ছিল। তাই প্রত্যেক জায়গায় ভারতীয় আর দেশীয় ভিক্ষু আর বুদ্ধভক্ত এই পুণ্য কাজে রত হয়েছিলেন। উত্তর চাউবংশের রাজধানী ছাঙ্-আন্'এ গুণভদ্র মগধের জ্ঞানযশ যশোগুপ্ত আর জ্ঞানগুপ্ত এই কাজই করছিলেন। প্রথম বছরে আমি অনুবাদ করলাম 'চন্দ্রদীপসমাধিসূত্র', 'মহাকরুণাপুণ্ডরীকসূত্র', 'সুমেরুগর্ভসূত্র', আব 'প্রদীপদানীয়সূত্র'। তারপর আমার ওপর আরও কাজের ভার এসে পড়ল। অনুবাদের গতি তখন আর আগের মতো তীব্র রইল না। পরে আমি আর তিনটি মাত্র গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে পেরেছিলাম— 'অভিধর্মহৃদয়শাস্ত্র', 'চন্দ্রগর্ভসূত্র' ও 'পিতাপুত্রসমাগসূত্র'।

এখানে এসে প্রথম বছরে চারটি গ্রন্থ অনুবাদ করার পর সম্রাট বেন্-শেন্

আমাকে তাঁর রাজ্যের ভিক্ষুদের সংঘনায়ক করে দিলেন। আমার কিন্তু তা ভালো লাগল না। প্রথমে আমি এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকারও করেছিলাম। কিন্তু সম্রাট বললেন: আপনার মতো লোক, যিনি বুদ্ধ-শাসনের অভিবৃদ্ধি কামনা করেন তিনিও যদি সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব না নেন তাহলে কে নেবে?

শঙ্কিত হৃদয়ে এ দায়িত্বভার আমি নিলাম। কিন্তু পরিচালকের হৃদয় কেবল কোমল হলেই তো হয় না, কখনও কখনও বিধান দেবার সময় কঠোরও হতে হয়। সুতরাং সকলকে মিত্ররূপে রাখা যায় না!

আমার পথ সরল ও নিষ্কণ্টক ছিল না। কিন্তু হাজার হাজার ক্রোশ অ-সরল পথ যখন অতিক্রম করতে পেরেছি তখন কর্মক্ষেত্রে ভীরুতা প্রদর্শন শোভা পায় না। উনিশ বছরের য়েহ-বাসের প্রথম বছরেই যা-কিছু অনুবাদের কাজ করেছি। বাকি সময়ে যে তিনটি সাধারণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছি তা তো কয়েক মাসেই করা যেতে পারত। চীরাজবংশ এই ভেবে আত্মতুষ্টি লাভ করবে যে. তারাও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়ে স্বীয় কীর্তি অমর করতে পেরেছে। হয়তো আমার মনের কোণেও এমনটা উঁকি মারত, অনুবাদের অমর কীর্তিতে তৃপ্তি লাভ করতাম। কিন্তু অমরতার ওপর নয়, অনিত্যতার ওপরই আমার অটল বিশ্বাস। অনন্তকালের কথা আমি ভাবি না, আমি চাই অন্তরের আগুন নিভিয়ে শান্তি লাভ করতে।

অনুবাদ করার জন্য বহু গ্রন্থ ছিল। বুদ্ধিলের নিজের হাতে লেখা 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' তখনও আমার কাছে ছিল। থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। মাঝে মাঝে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করার ইচ্ছাও হ'ত। কিন্তু সেজন্য মন প্রস্তুত ছিল না। মহাযানের গ্রন্থাবলীই আমি অনুবাদ করেছি, কারণ বোধিসত্ত্বের জীবন আমার খুব প্রিয় ছিল। আমার এ জীবন যদি ক্ষণকালের জন্যও কোনো প্রাণীকে সুখ দিতে পারত তাহলে আমি অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করতাম। নিত্য আমি অবদানের পরায়ণ করতাম। আর্যশূরের 'জাতকমালা' আমার নিত্য পাঠের অন্তর্গত ছিল। তথাগত বোধিসত্ত্ব থাকাকালে বহু জন্মে পরহিতার্থে আপন দেহ দান করেছেন। কখনও ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রীর মুখের গ্রাস হয়েছেন, কখনও-বা অনশনক্লিষ্ট পথিকের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আগুনে লাফিয়ে পড়েছেন।

আমি বোধিসত্ত্বব্রত পালনে রত হলাম।

বোধিসত্ত্বব্রতে যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই আমার হৃদয় দ্রবীভূত হচ্ছে। কারও দুঃখ দেখতে পারি না। য়েহ নগরী কিংবা অন্য কোনো গ্রামে যখন

কোনো অনাথ শিশুকে দেখতাম, আমার পা আর এগুত না। কোনো রমণীকে অসুস্থ দেখলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য মনে করতাম। এখানে অবস্থানকালে যদি কোনো বিদ্যা আমি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করে থাকি তবে তা হচ্ছে আয়ুর্বেদ। চীনের ভিক্ষুরা চিকিৎসাকে জনহিতের সবচেয়ে বড় উপায় বলে গণ্য করেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হবার জন্য এখানে চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। লাউ-জু আর কন-ফু-জু'র অনুগামীরা একেও আমাদের এক চাল বলে মনে করল। কিন্তু কেউ চাল বা কূটনীতি বললেই তো কোনো ভাল কাজ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। পৃথিবীর সকল দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করাই যখন জীবনের লক্ষ্য করেছি তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য প্রাণ দিতেও আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এতে হীন স্বার্থের গন্ধ থাকতে পারে না।

আমি নিজেকে কুশল বৈদ্য মনে করি না। কোনো বিষয়ে কুশলতা লাভ করার জন্য স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা দরকার। সে ক্ষমতা হয়তো আমার নেই। তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ, তাহলে আমি চিকিৎসার কাজে এত ব্যস্ত থাকতাম যে, সারা ছী রাজ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই আমার সবটা সময় চলে যেত। তবে একথা আমি বলতে পারি যে, আমারই প্রচেষ্টায় এই রাজ্যে চিকিৎসার এমন সুবন্দোবস্ত হয়েছিল, যা এখানকার অন্য কোনো রাজ্যে হয় নি। ভিক্ষুদের সংঘারামে অবশ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তবে তত ব্যাপক আর সুব্যবস্থিত ছিল না।

বোধিসত্ত্বের পথে আরূঢ় হয়ে যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম তা সফল হতে পুরো পাঁচ বছর লেগেছিল। গুণমিত্র নামে এক কুশল বৈদ্যের সহযোগিতা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি ছিলেন কুস্তনের এক ভিক্ষু। ঘুরতে ঘুরতে স্নেহ নগরে এসে পৌঁছেছিলেন। সংঘনায়ক হবার আগের বছরই আমি খ্যান-পিঙ্ সংঘারামের পাশে এক বিশাল চিকিৎসালয় নির্মাণ করিয়েছিলাম। তাতে স্থাপিত হয়েছিল ভৈষজ্যগুরুর ছোট্ট একটি প্রতিমা। ধাতুর প্রতিমা নয়, কারণ পরে হয়তো কেউ সে প্রতিমা গলিয়ে তার ধাতু বিক্রি করে দিতে পারে। পাথরেরও নয়। মাটির। মাটির প্রতিমার অস্তিত্ব ততদিনই থাকে, যতদিন তার প্রতি শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা থাকে।

গুণমিত্র রাজধানীতেই থাকতেন। বাইরে যাবার সময় পেতেন কম। তিনি ছিলেন থিয়েন্-পিঙ্ মহাচিকিৎসালয়ের মহাবৈদ্য। নগরপ্রাকারের মধ্যে

সম্রাট এক বিরাট শুশ্রূষালয় নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্ত যেতেন। এছাড়াও একটি বড় কাজ নিয়েছিলেন তিনি—নতুন নতুন বৈদ্য তৈরি করার কাজ।

আমি সংঘনায়ক হওয়ায় একটা লাভ হয়েছিল—থিয়েন্‌-পিঙ্‌ সংঘারামেই সারা রাজ্যের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রব্রজ্যা হ'ত। গুণমিত্র আর আমি লক্ষ্য রাখতাম, কোনো অযোগ্য তরুণ কিংবা তরুণী যেন সংঘে প্রবেশ করতে না পারে। আমরা তার বিদ্যা, শীল, বুদ্ধি ইত্যাদির যথাযথ পরীক্ষা নিতাম। ছ মাস পর্যন্ত চলত সেই পরীক্ষা। যখন বুঝতে পারতাম, কেবল সংসার থেকে দূরে সরে আসার জন্তই সে সংঘারামে আসে নি, সংসারের দুঃখ দূর করার জন্ত সে কিছু করতে পারে তখনই তাকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দিয়ে শ্রামণের-শ্রামণেরী বা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী করতাম; তার শিক্ষার দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখতাম। শ্রামণের-শ্রামণেরী বা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যোগ্য আচার্য-উপাধ্যায়েব অধীনে শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম আছে।

নগরপ্রাকারের মধ্যে ভিক্ষুণীদের সংঘারাম আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ভিক্ষুর মতো ভিক্ষুণীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সংঘারাম অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সম্রাটের এক ভগ্নী ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে ভিক্ষুণী-সংঘারামের পাশে মেয়েদের জন্য এক বিশাল চিকিৎসালয় তৈরি করিয়ে দিলেন। আমি সংঘনায়ক হবার আগে ছী রাজ্যে সংঘারাম আর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর অভাব ছিল না। কিন্তু দশ বছর পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর এমন কোনো বড় গ্রাম এখানে ছিল না, যেখানে সংঘারামের সঙ্গে ছোটখাটো একটা চিকিৎসালয় নেই। আমরা কেবল ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ঔষধি আর নিদানই গ্রহণ করলাম না, চীনের সমৃদ্ধ চিকিৎসাপদ্ধতিও গ্রহণ করলাম। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত থিয়েন্‌-পিঙে আলাদা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

প্রত্যেক জায়গায় সংঘের ব্যবস্থা আর চিকিৎসালয় দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার ওপরই ছিল। তাই আমাকে বাইরেও যেতে হ'ত। যাত্রাপথে বহু কানাখোঁড়া, বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন লোক দেখতে পেতাম। তাদের জন্ত আমি শরণস্থান নির্মাণ করিয়েছিলাম। সম্রাট আমাকে যা কিছু দিতেন, এমনি ক্ষেত্রেই তার আমি সদ্ব্যবহার করতাম। পথে কোনো দীনদুঃখী দেখতে পেলে তাকে এই শরণস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতাম। যাত্রাপথে অনেক জায়গায় আমি জলকষ্ট দেখেছি। বহু দূর থেকে লোকে জল বয়ে আনে। ময়লা জল খায়।

তাদের জন্ত আমি কুয়ো কাটাতে শুরু করলাম। স্থির করলাম, সারা রাজ্যে এমন কোনো জায়গা রাখব না, যেখানে লোকের জলকষ্ট থাকে। ছী রাজ্য তো মরুভূমি নয়। ভূপৃষ্ঠের তলায় রয়েছে স্বচ্ছ মধুর জল। তবে কেন লোকে জলের কষ্ট ভোগ করবে?

আমার তুফানী জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। পর্যটনের ইচ্ছা তৃপ্ত করতাম ছী রাজ্যের ভেতরে ঘুরে। চীনা ভাষা আর চীনা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন বাড়ল তখন আমার খুব ইচ্ছা হ'ল, দেশের অন্ত সব জায়গায় যাই। কিন্তু তার উপায় ছিল না। সংঘনায়কের দায়িত্ব নিয়ে পায়ে আমি বেড়ি পরেছি। সে ছিল স্বেচ্ছা-বেড়ি। আমি দীনদুঃখীর দুঃখ লাঘব করতাম। কারও অশ্রু মুছিয়ে দিতে পারলে কিংবা কারও দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করতে পারলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করতাম। অন্ত কাজের সময় আমি খুব কমই পেতাম। অনুবাদের কাজ কেবল এক বছর করে চারটি গ্রন্থ শেষ করেছিলাম। অধ্যাপনার কাজও আমি নিজে নিই নি। আমি একান্ত মনে ভৈষজ্যগুরুর দেখানো পথে চলছিলাম।

রোগী আর অনাথের সেবা এবং অহিংসাব্রত প্রচার আমার জীবনের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি যখন গভীরভাবে ভাবতাম তখন আমার নিজের ওপর অবিশ্বাস আসত। মানুষ দীন আর অনাথ হোক, যাতে আমি তাদের সেবা করতে পারি, এ কোন্ বিচার? তার চেয়ে কি এই ভালো নয় যে, পৃথিবীতে কেউ দীন আর অনাথ থাকবে না আর তাদের সেবাও করতে হবে না?

এই ধরনের ভাবনা মনে আসার আগে কূচী আর তার আগের দু-একটি নগরে কয়েকজন পারসীক সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। য়েহ-তে তাঁদের এক আশ্রম ছিল। ছাঙ্-আনে ছিল আরও বড় আশ্রম। পারসীক ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে এক নতুন ধর্মমার্গ স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের এখানে যেমন হীনযানের সঙ্গে মহাযান। এই মার্গের গুরু মানী তাঁর পুরনো ধর্মগুরুদের যেমন ভক্তি করতেন তেমনই ভক্তি করতেন বুদ্ধকে। আর এই শিক্ষাই তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন। তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে আমাদের বিহারে আর মন্দিরে আসতেন। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম, সম্মান করতাম। সময় পেলেই তিনি তাঁর ধর্ম ও গুরুর শিক্ষা সম্পর্কে বলতেন।

য়েহ-তে তখন আমারই বয়সী এক মানীপন্থী সাধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে

আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বহু পর্যটনে তিনি আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। একবার তিনি আমাকে এক করুণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাতে আমার মন বিষাদে ভরে উঠেছিল, কাজের প্রতি আমার অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন :

আমার বয়স যখন দশ বছর তখনই ঘটেছিল এই ঘটনা। মানীর উত্তরাধিকারী আমাদের গুরু মজ্‌দক সারাটা জীবন মানুষের সুখের পথ খুঁজেছেন। তিনি বলতেন, "দীনদুঃখী আর রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা ভালো, কিন্তু তাতে দুঃখের মূল উৎপাটিত হয় না। দুঃখ দূর করার একটিমাত্র পথ আছে। সে মানুষে মানুষে ধন-সম্পত্তির বৈষম্য দূর করা। কেউ অনশনে থাকবে না, কেউ ধন-বৈভবে ডুবে থাকবে না।" আমাদের দেশে তিনি খুবই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে তাঁর প্রদর্শিত পথে লোকে চলতে শুরু করেছিল। চারদিকে বিরাজ করছিল সাম্যের একচ্ছত্র রাজত্ব। এমন প্রভাব তাঁর হয়েছিল যে, শাহানশাহ্‌ কবাদ'ও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু যে ধনিক্‌সম্প্রদায়ের মুখে দরিদ্রের রক্ত লেগে রয়েছে তারা নিজেদের সম্পত্তি চলে যেতে দেখে চুপ করে থাকবে কী করে? তাই তারা চেষ্টা করতে লাগল, গুরু মজ্‌দকের উদ্দেশ্য যেন সফল না হয়। বৃদ্ধ কবাদের যুবক পুত্র খুসরো যখন ধনিক্‌সম্প্রদায়ের হাতিয়ার হ'ল আর আমাদের গোটা দেশে আর রাজধানীতে যখন সেই ভীষণ ঘটনা ঘটল তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। কিন্তু আজও সে কথা মনে পড়লে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, দু চোখে অশ্রু ঝরার বদলে ঘৃণার আগুন জলে ওঠে—যদিও আমি জানি তা গুরুর উপদেশ-বিরুদ্ধ। গুরু বলতেন, "এই পৃথিবীতেই স্বর্গ আনতে হবে। এই পৃথিবীতেই ফলের উদ্যান তৈরি করতে হবে, মধু আর দুধের নদী বহাতে হবে। মানুষ যদি মানুষের রক্ত শোষণ না করে তবে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে।" গুরুর উপদেশ নয়, তাঁর কাজেই মানুষের দারিদ্র ঘুচে গেল। তিনি বলতেন, "কেবল সম্পত্তিতে নয়, বিবাহেও আপন-পর ভাব জেগে ওঠে, আপন সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব জন্মায়। যতদিন বিবাহপ্রথা থাকবে ততদিন সারা দেশে একই আত্মীয়তার সুর ধ্বনিত হবে না। সকলে একই বাঁধনে বাঁধা পড়বে না।" তাঁরই কথায় বিবাহপ্রথা উঠে গেল। আমি আমার মাকে চিনি, কিন্তু কে আমার বাবা তা জানি না। রাজধানী তসপোনে খুসরো সেদিন তার প্রাসাদের সামনে মানবদেহের উদ্যান তৈরি করেছিল। তার আদেশে নারী-

পুরুষ সকলের মাথা মাটিতে পুঁতে হাত-পা ওপরে রাখা হয়েছিল। তারপর সে বলেছিল, "এই নাও, পৃথিবীতে নেমে আসা তোমাদের স্বর্গ।" রাক্ষস আমাদের মতো শিশুদেরও সেখানে দাঁড় করিয়ে সেই দৃশ্য দেখিয়েছিল, যাতে আমাদের মনে মজ্‌দকের শিক্ষার কোনো প্রভাব না পড়ে। যাকেই সে মজ্‌দকের ধর্মদূত মনে করেছে তাকেই এমনি করে হত্যা করেছে। সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা, এই রাক্ষস খুসরো আজ অদ্বিতীয় ন্যায়াবতার বলে গণ্য।

মিত্রদাতের করুণ কাহিনী আমার মনে স্থায়ী প্রাভাব ফেলল। আমি ভাবতে লাগলাম, তথাগতও দুঃখ দূর করার পথের সন্ধান দিয়েছেন। মহাযান বলেছে, যতদিন পৃথিবীর একটি প্রাণীও দুঃখী থাকবে ততদিন আপন নির্বাণ কামনা করা উচিত নয়। বুদ্ধের প্রশংসক মানী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মজ্‌দক তাঁদের দেশে এই কাজই করছিলেন। তাঁদের পথ ছিল বিপদসংকুল। কিন্তু হয়তো সেই পথই ঠিক। হয়তো সে-ই দুঃখ দূর করার প্রকৃত পথ। আমিও দেখছিলাম, এত চিকিৎসালয় আর অনাথাশ্রম থাকতেও অভাবের কারণ যে দুঃখ তার শিকড় কাটতে পারছি না। আমি কত ভেবেছি, মানুষের মধ্যে সম্পত্তির যে বৈষম্য তা-ই সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ। সম্রাট কিংবা সামন্তদের বৈভবের মধ্যে এতখানি ডুবে থাকার কী অধিকার আছে? এ বৈভব তো তাদের প্রাসাদে আকাশ থেকে পড়ে নি। মানুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়েই এই বহুমূল্য ধাতু আর মণিমাণিক্য আসে, নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়, মহার্ঘ মৃগচর্ম আর পট্ট (রেশম) বস্ত্র প্রস্তুত হয়। যাদের হাতে এইসব জিনিস তৈরি হয় তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে দরিদ্র। যারা নিজের হাতে কুটোটিও দুভাগ করে না তারাই থাকে আরামে। যদি কেউ বলেন, এ হচ্ছে পূর্বজন্মের কর্মফল তবে তা হবে দুঃখের মূল যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকে কায়েম রাখার চেষ্টা।

খুসরোর আদেশে যখন অন্যের সন্তান নকল পিতাদের বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন মিত্রদাত ছোটখাটো এক সামন্তের পুত্র হলেন। ছ বছর তিনি তার নকল পিতার কাছে ছিলেন। কিন্তু কোনোদিনও মাকে ভুলতে পারেন নি। মা'র ভূপ্রোথিত সেই নগ্ন দেহ তাঁর চোখের সামনে সর্বদা ভাসত। স্বপ্নে তিনি মাকে দেখতেন। মা মাটির নিচে থেকে মুখ উঁচু করে বরাভয় দিয়ে

বললেন, "বাবা, ভয় পেও না। এই পথেই মানুষের কল্যাণ হবে—সে আজই হোক, কি হাজার বছর পরেই হোক।"

দেশে মানী আর মজ্দকের শিক্ষার কথা জানার উপায় ছিল না। লোকে ভয় পেয়ে মত বদলে ফেলেছিল। কেউ কেউ মত ছাড়ার বদলে নিজের দেশ ছেড়ে যেথাদের দেশে চলে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়স হতেই মিত্রদাত তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। দেশে দেশে ঘুরলেন। তারপর এলেন এই মহাচীনে।

তথাগত আমাদের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা আর উপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—কাউকে ঘৃণা করবে না, কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না, শত্রুতা দিয়ে শত্রুকে দমন করা যায় না। তবু মিত্রদাতের কাছে সেই ভয়ংকর কাহিনী শুনে খুসরোকে ঘৃণা না করে আমি পারলাম না। তার প্রতি আমার মনে দারুণ ঘৃণা জন্মাল। আর তখনই আমি অসুখে পড়লাম। আমি তখন রাজধানীর বাইরে ছিলাম। মিত্রদাত আমাকে য়েহ্-তে নিয়ে এলেন। পেটে আমার অসহ্য ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করি। আমার অসুখের খবর শুনে সম্রাট হাউ-চু সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে করে সংঘারামে আমায় দেখতে এলেন। আমার পক্ষে এ এক অসাধারণ সম্মান। চীনের সম্রাট দেবপুত্র। তাঁর দর্শন পেলে লোকে ধন্য হয়। সেই দেবপুত্র স্বয়ং আমাকে দেখতে এলেন। বহুক্ষণ ধরে আমার শরীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁর মুখের ভাবে আর গলার স্বরে মনে হল, তিনি আমার অসুখে খুবই দুঃখ পেয়েছেন।

মিত্রদাত আমার শুশ্রূষা করছিলেন। তার চোখে আমি খুসরোকে দেখতে পেলাম। সম্রাটের দিকে দৃষ্টি যেতেই তাঁর মুখটা যেন খুসরোর মুখের মতো মনে হ'ল। সম্রাট! তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ মানুষের মধ্যে বৈষম্য বজায় রাখা। আমাদের সার্থবাহের কাছে লক্ষ লোকের সম্পত্তি আছে। রাজভবনের সম্পদের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। যদি তাঁরা জানতে পারেন, আমি এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেছি তাহলে কি তাঁরা চুপ করে থাকবেন? আমাকে এই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন? এমনি করে রোগশয্যার ধারে এসে কুশলসংবাদ নেবেন? কখনও না।

আমার অসুখ খুব কঠিন। কিন্তু গুণমিত্র আর অন্যসব বন্ধুর চেষ্টায় আমি ভালো হয়ে গেলাম। শুয়ে শুয়ে আপন মনে খালি ভাবতাম, এই বৈষম্যের

জন্ত তো একজন মাত্র দায়ী নয়। একজন সম্রাট মারা গেলেই কি এই বৈষম্য দূর হয়ে যাবে? একজন সম্রাট মরলে তাঁর জায়গায় আর একজন সম্রাট আসবেন। একজন সামন্ত কিংবা সার্থবাহ শেষ হলে তাঁর স্থানও শূন্য থাকবে না। এতে একটা গোষ্ঠীর স্বার্থ আছে। তাই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে এরকম বৈষম্যের বীজই থাকবে না। তার জন্য বহুজনকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বহুজনের প্রতি আমি নিরাশা পোষণ করি না। মহাচীনের বহুজন যে অত্যাচারীর তলোয়ারের ভয়ে কখনও নিজেদের পথ চিরতরে ছাড়ে নি, তথাগতর শাসনের প্রতি অত্যাচার থেকে তা জানা গেছে। হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী, উপাসক আর উপাসিকা হাসতে হাসতে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে আলিঙ্গন করেছেন, শাণিত খড়্গের সামনে মাথা পেতে দিয়েছেন। তথাগত যে দুঃখনিরোধ পথের সন্ধান দিয়েছেন তার জন্য তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছেন। আমি জানি, সে পথ তারা কোনোদিনও ছাড়বেন না। পরিশেষে এমন একদিন আসবে, যখন খুসরোর মতো রাক্ষসরা অত্যাচার করতে করতে শেষ হয়ে যাবে। আকাশ থেকে পৃথিবীতে তখন সত্যিই স্বর্গ নেমে আসবে।

উনিশ

য়েহ্-এর মেয়াদ শেষ হয়ে এল। শেষ সময়ে সম্রাট হাউ-চু আমার কাজে আরও বেশি করে সাহায্য করতে লাগলেন। ছীবংশের দুর্বলতা তখন স্পষ্ট দেখা দিয়েছে। সামন্ত আর রাজপুরুষদের অত্যাচার রোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবু সম্রাট হাউ-চু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেমন অশান্তি হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পরেই দেখা দিল অরাজকতা। সম্রাট হাউ-চু'র উত্তরাধিকারী অন্-তেহ্, ওয়াঙ্ আর ইউ-চু ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য এবং বিলাসী। ছাঙ্-আনের চাউবংশ বরাবর য়েহ্-কে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখেছে। ছাঙ্-আন্ পুরনো রাজধানী। বড় বড় রাজবংশ এখান থেকে মহাচীন শাসন করেছে। পে-বেই বংশের অমাত্যরা ভেবেছিল, তারা সারা রাজ্যের অধিকারী হবে; কিন্তু তার আগেই পে-ছীবংশ রাজ্যের পূর্বভাগ অধিকার করে নিল। বংশ-স্থাপক শি বো সিন-তী যা করতে পারে নি তার দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী বু-তী তা-ই করল। ছীবংশ শেষ হয়ে গেল। বু-তী কিন্তু বেশি

দিন শাসন করতে পারল না। বু-ভী'র পর শেন্-ভী সিংহাসনে বসল। রাজ্য পরিবর্তনের পর স্নেহ, আর রাজধানী রইল না। বু-ভী পুরনো রাজবংশের বিশ্বাসপাত্রদের বিপজ্জনক মনে করে তাদের উচ্ছেদ করতে লেগে গেল। ছী-বংশের প্রভাব বৃদ্ধিতে আমাদেরও কিছু হাত ছিল। আমরা বহুজন হিতায় যে সেবা করতাম তার জন্য আমাদের প্রতি আর আমাদের সহায়ক ছী সম্রাটের প্রতি লোকে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বু আমাদের কাজে বাধা দিতে শুরু করল। ফলে মিত্রদাত আর বো-সঙের সঙ্গে আমাকে রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে হ'ল। বু'র উত্তরাধিকারী শেন্-ভী দু বছরের শাসনে সব ছারখার করে দিল। ছী রাজ্যের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা ছিলেন তার চক্ষুশূল। বু আদেশ দিয়েছিল: শাক্য শ্রমণদের কাজ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হোক, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের চীবর ছেড়ে গৃহস্থ হতে বাধ্য করা হোক, যদি কেউ তা হতে না চায় তাহলে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।

তবু আমি আমার পথ ছাড়তে চাইলাম না। ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। আমার বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল না যে, এমনিভাবে আমার জীবনটাকে আমি শেষ করে দিই। যদি বেঁচে থাকি তবেই তো আবার কাজ শুরু করতে পারব—সে যেখানেই থাকি না কেন। তাছাড়া আমার আত্মবলিতে অনেক বন্ধুই আমার অনুগামী হ'ত। তাহলে বহু জন সেবায় যে পথ আমরা উন্মুক্ত করেছিলাম তা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যেত। চীবর আমি ছাড়লাম না: ঠিক করলাম, চীবরের ওপর গৃহস্থের চোগা পরব।

আমাদের চোখের সামনে চিকিৎসালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। রাজবংশ প্রথমে বৈদ্য রেখে চিকিৎসালয় চালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা তত যোগ্য ছিল না। সেবার আদর্শও তাদের মধ্যে ছিল না। তাছাড়া রাজভাণ্ডার থেকে পর্যাপ্ত উপকরণও দেওয়া হ'ত না। দুঃখত্রাণের জন্য যে পীঠস্থান আর আশ্রম আমরা আঠার বছরের পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলাম তা দেখতে দেখতে ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদেরও সময় হয়ে এল। উত্তরের দেশ ছেড়ে দক্ষিণের দেশে চলে যেতে বাধ্য হলাম।

আমি তখন উনষাট বছরের প্রৌঢ়। ষাট বছরের সীমা পার হতে হতে এক ধরনের মানসিক অবসাদ দেখা দিল। আমার সঙ্কল্প শিথিল হয়ে এল। আমি যেন জীবনের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছি। আমার মনে হতে লাগল, যাবার বেলা হয়ে এসেছে। নতুন করে কাজ আরম্ভ করার সে উৎসাহ আর

নেই, সময়ও না, সঙ্গীও না। ষাট বছর বয়সে যখন পীতনদীর দক্ষিণতীরে এসে নামলাম তখন আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আশা-আকাঙ্ক্ষা সব শেষ হয়ে গেছে। পা দুটো কোথাও স্থির হয়ে থাকতে চাইছে না। আমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ভারতের মতো মহাচীনেও উত্তর-দক্ষিণের ভেদ আছে। যদিও তথাগতর শাসন দুই অংশেই সমান, তবু তার রাজনীতিতে সামান্য পার্থক্য এসে গেছে। উত্তর চীন তার উত্তর আর পশ্চিমের যাযাবরদের সীমান্তে অবস্থিত। যেখান থেকে যাযাবরেরা লুঠতরাজ করতে কিংবা বসবাস করতে আসত। আসত সেই অনাদিকাল থেকে। বহু শতাব্দী পর্যন্ত তারা উত্তর চীনে শাসনও করেছে। তারা চীনের জনসমুদ্রে এসে নাম-রূপ হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে। তাই দক্ষিণ চীনের লোকেরা উত্তর চীনের লোকদের উঁচু নজরে দেখে না। ভারতেও এমন হয়েছে। খস, যবন, শক, যেথা প্রভৃতি কত জাতিই-না বাইরে থেকে এসে ভারতের লোকদের মধ্যে মিশে গেছে। দক্ষিণ ভারতের পহ্লবরাও তো মূলত বিদেশী ছিল।

দক্ষিণের মহানদী ইয়াঙ্-চী-কিয়াঙ্ পীতনদী অর্থাৎ হোয়াঙ্ হো-র মতোই বিশাল। দুই নদীই ভারতের যে কোনো নদীর চেয়ে বড়। চীনের লোকেরা সমস্ত দেশটাকে এক অখণ্ড রাজ্য বলে মনে করে। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ছিলও এক অখণ্ড রাজ্য। কিন্তু সামন্তকুলের স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বার্থান্ধতা বহুবার দেশটাকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে। আবার জোড়া লাগানোও হয়েছে। চিন্‌বংশই (খৃষ্টপূর্ব ২৫৫ অব্দ থেকে ২০৬ অব্দ) তা করেছে। তাই বাইরের লোকেরা এই দেশটাকে চীন বলে। চিন্‌বংশের উত্তরাধিকারী হান্‌বংশও সওয়া চার শ বছর চীনকে এক রাজ্য করে রেখেছিল। এই সময় সওয়া দু শ বছরেরও বেশি কাল ছাঙ্-আন্ মহাচীনের রাজধানী ছিল। তারপর আড়াই শ বছরের জন্য সে সৌভাগ্য লাভ করেছে লোয়াঙ্। ছাঙ্-আন্ আর লোয়াঙের নাম আজও লোকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করে। শান্তির দ্বারা বংশ পরিবর্তন হয় না, হয় আগুন আর তলোয়ারের দ্বারা, যাতে রাজধানী রাজদুর্গ হবার দরুন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হান্‌বংশের পর দ্বিতীয় চিন্‌বংশ সারা চীনে শাসন করেছে। তারপর উত্তর-দক্ষিণ ভাগ হয়ে গেছে। দক্ষিণে কয়েকটি রাজবংশ নানকিঙ্ আর চিয়াঙ্‌লিঙ্ থেকে রাজ্য শাসন করেছে।

দক্ষিণের রাজধানী নানকিঙ্ পর্বতবেষ্টিত। একদিকে তার ইয়াঙ্-ৎসে নদী। নানকিঙ্ বড় সুন্দর নগর। বিদ্যা আর কলার কেন্দ্র। তবু আমি এখানে থাকতে চাইলাম না। ভয় হ'ল, ছী রাজ্যের সংঘনায়ককে এখানকার লোকেরা চিনে ফেলবে। অতিকষ্টে চারদিন নানকিঙের ছোট্ট এক সংঘারামে রইলাম।

সম্রাট বু-তী'র কথা আমার বার বার মনে পড়তে লাগল। বড় করুণ তাঁর কাহিনী। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা তিনি তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন লিয়াঙ্ বংশের সংস্থাপক। ছীবংশের শেষ রাজা হো-তী তাঁর যোগ্য সেনাপতি বু-তী'র হাতেই রাজসিংহাসন তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সিংহাসনের প্রতি বু-তী'র কোনো আসক্তি ছিল না। বহুবার তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর অনুরোধে পারেন নি। ধর্মকর্মেই সারাটা সময় অতিবাহিত করতেন। বহু বিহার তিনি তৈরি করিয়েছেন। বহু গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়েছেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহান ত্যাগের প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। দিনে তিনি একবার মাত্র আহার করতেন। মাংস খেতেন না। বলির জন্য পশুহত্যাও তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যেখানে বলি দেবার বিশেষ প্রয়োজন হ'ত, আটার পশু (পিষ্টপশু) বানিয়ে বলি দেওয়া হ'ত। অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড তিনি সহ্য করতে পারতেন না, জলভরা চোখে নিজের হাতে তাদের মুক্ত করে দিতেন। প্রতিটি প্রাণীর জন্যই তাঁর হৃদয়ে অপার করুণা ছিল। এমন মানুষের এতদিন পর্যন্ত রাজসিংহাসনে টিকে থাকা সত্যিই বড় আশ্চর্যের কথা। শেষে তাঁকে তাঁর উত্তর দেশের রাজার হাতেই বন্দী হতে হ'ল। কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

দক্ষিণের রাজধানী ছেড়ে আসার আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দক্ষিণ দেশে আত্মগোপন করা মুশকিল হবে। উত্তরের চেয়ে দক্ষিণেই সংঘারামের সংখ্যা বেশি। তীর্থযাত্রা আর পর্যটনের জন্য ভিক্ষুরা সারাদেশে ঘুরে বেড়ান। আমরা তিনজন যদি একসঙ্গে থাকি, তাঁরা আমাদের চিনে ফেলতে পারেন— অবশ্য তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু আমি এক দীন ভিক্ষু পর্যটকের মতো ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, জীবনের কঠিন অবস্থাটা উপলব্ধি করতে।

বোঝাতে অনেক সময় লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গী দুজন আমার কথা মেনে নিলেন। আমি চলতে শুরু করলাম। নগরের বাইরে গিয়ে মহানদীর দক্ষিণ তীর ধরে চললাম ওপরের দিকে। আমি এখন একা। নিঃসঙ্গ। তীর-

চীবর আর সংঘাটীই আমার অঙ্গাবরণ। কাঁধে মাটির ভিক্ষাপাত্র, পিঠে সেই চিরসঙ্গী তালপাতার পুঁথি, হাতে লাঠি। নগ্ন পা। আমি চলেছি। যত তাড়াতাড়ি পারি, রাজধানী থেকে দূরে সরে যেতে হবে। পথে যেখানেই রমণীয় পর্বতস্থলী কিংবা নদীতট আছে সেখানেই আছে সংঘারাম। আমি নিয়ম করে নিলাম, সন্ধ্যার সময় কোনো সংঘারামে গিয়ে উঠব, আর সকাল হলে যাত্রা শুরু করব। পুরো তিনটি বছর এমনি করে ঘুরে ঘুরেই কাটল। কেবল একবার এক পরিচিত ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, আমার এই রহস্য যেন তিনি উদ্‌ঘাটন না করেন। তিনি রাজী হয়েছিলেন। আমি নিতান্ত অপরিচিতের মতোই ঘুরতে লাগলাম।

আমি ভিক্ষুবেশে ছিলাম। বৌদ্ধই হোক কি অবৌদ্ধ, গৃহস্থদের মনে ভিক্ষুদের প্রতি কিছু-না-কিছু শ্রদ্ধা থাকেই। দরিদ্রদের শ্রদ্ধা আর দয়া দেখে মন আমার গলে যেত। তারা নিজেরা অভুক্ত থেকে ভিনদেশী আর দরিদ্রদের খাওয়াত। আমি ভিক্ষু, কিন্তু চেহারায় ভিনদেশী আর পোশাকে দরিদ্র।

আগে আমি ধর্মোপদেশ দিতাম। এখন আর তা ভালো লাগে না। উৎসাহ পাই না। দুঃখসত্যের সেই আদিকালের ব্যাখ্যা দিতে ভারি সঙ্কোচ হয়। জন্ম দুঃখের. জরা দুঃখের, মৃত্যু দুঃখের, প্রিয়জনের বিয়োগ আর অপ্রিয়জনের সংযোগ—তা-ও দুঃখের। কেবল এইটুকু বললেই দুঃখের স্বরূপ প্রকাশ পায় না। দুঃখ হচ্ছে—আমাদের চোখের সামনে বহুজন পরিশ্রম করতে করতে আপন অর্জিত অন্নধনও উপভোগ করতে পারে না। তাদের অনাহারে থাকতে হয়। তস্করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অর্জনকারীদের সংখ্যা এক শ'র মধ্যে নব্বইজন। এমন করে দুঃখসত্যের আসল রূপটা দেখিয়ে দিলে তার ফল কী হত? হয়তো অরণ্যে রোদন হ'ত। আমার শ্রোতারা এই সহজ সরল কথাটা বুঝতে পারত না। ভাবত, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি কিংবা প্রভুবর্গের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করে তাদের স্থান দখল করতে চাইছি। কিংবা আমার বেশভূষা দেখে সেকথা মনে না করলেও বাতুল ভাবতে পারত।

উত্তর চীনের খবর আমি প্রায়ই পেতাম। চাউবংশ বৌদ্ধদের ভয়ে ভীত ছিল। বৌদ্ধশ্রমণ নিশ্চিন্তমনে কাজ করে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করুন, এটা তারা সহ্য করতে পারছিল না। কোনো বৌদ্ধভিক্ষু কখনও যে রাজসিংহাসনের প্রতি লোভ করেছেন, এমন কথা আমি জানি না। রাজার বিরোধিতাও তাঁরা করেন না। অবশ্য দীনদুঃখী আর রোগীর সেবা করা, শিল্প আর বিদ্যা প্রচার

করা যদি অপরাধ হয় তাহলে অন্য কথা। একথা অবশ্য ঠিক যে, সংঘের দরুন বৌদ্ধদের শক্তি অনেক বেশি। কোনো রাজবংশের যদি উচ্ছেদ ঘটে, তবে পুরনো দিনগুলোকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু আমাদের সংঘ যেন অমর হয়ে এসেছে। কোনো রাজার অত্যাচারে কখনও যদি সর্বনাশ ঘটে, তার তিরোধানের পর কোথা থেকে যেন লক্ষ হাত জড়ো হয়ে সংঘারামকে আবার আগে চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তোলে। সংঘের এই অজেয় শক্তির জন্য বহু সম্রাট আর সামন্ত আমাদের প্রভাব সহ্য করতে পারত না।

এবারের এ যাত্রায় অনেক তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা হ'ল আমার। আমি অকিঞ্চন ভিক্ষু। কালকের খাবারও আমার ভিক্ষাপাত্রে থাকে না। মৃত্যু আমার কাছে ভয়ের বস্তু নয়। মানুষ যতদূর কষ্ট সহ্য করতে পারে ততদূর কষ্ট সহ্য করতে আমি প্রস্তুত। আমার অঙ্গে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের তৈরী চীবর। যাত্রাপথে কতবার আমি চোর-ডাকাতের সংস্পর্শে এসেছি। তারা ভেবেছে, দীন ভিক্ষু বস্ত্রের অন্তরালে মণিকাঞ্চন লুকিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি চীবর আর ভিক্ষাপাত্র তাদের সামনে ফেলে দিয়েছি। বলেছি: যদি তোমাদের কাজে লাগে নিয়ে যাও। তারা নেয় নি। নেবার মতো কিছু ছিল না।

আমার এই তিন বছরের জীবন একেবারে নতুন। দুপুরে ভিক্ষান্নে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে কোনো গাছের তলায় পুঁথি খুলে বসতাম। বৃদ্ধিলের হাতের সুন্দর লেখা পড়তে পড়তে তাঁর কথা মনে হ'ত। মনে মনে বলতাম: তোমার অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু মনের মতো করে পূর্ণ করতে পারি নি। দুঃখসত্যের ভিন্ন রূপ আমি দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তার নিরোধের পথ দেখতে পাচ্ছি না, পেলেও সে পথে চলতে পারছি না। তুমি যদি এ সময় আমার কাছে থাকতে তাহলে হয়তো কোনো পথ খুঁজে বার করতে পারতাম।

আমি মহানদী পার হয়ে তার দক্ষিণে তুঙ্-তিঙ্ মহাসরোবরের তীরে এসে পৌঁছুলাম। এখানে এসে খবর পেলাম, যে চাউবংশের অত্যাচারের দরুন আমাকে আমার কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে সেই চাউবংশেরই প্রধানমন্ত্রী তার বিনাশসাধন করে বেন্-তী নাম ধারণ করে ছাঙ্-আনের সিংহাসনে বসেছে। পতন করছে দুই রাজবংশের। যে সংঘারামে আমি খবরটা শুনলাম সেখানকার ভিক্ষুরা এতে খুবই খুশি হলেন। চাউবংশ শেষের দিকে উত্তর চীনের সংঘারাম আর ভিক্ষুদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে। তাই এই ভিক্ষুদের মতো আমারও এতে খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে একথা ভেবে মনটা ব্যথায় ভরে উঠল যে, এতদিন আমি নিজেকে যে অনাসক্ত আর নির্লিপ্ত বলে মনে করেছি, সে আত্মপ্রতারণা মাত্র। সেজন্যই তো চাউয়ের বিনাশে এত আনন্দ অনুভব করছি, পীতনদীর দিকে যাবার জন্য মন আবার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। ভোগ আর সুখের লালসা কোথাও দেখতে পেলাম না। তাহলে উত্তরাপথে যাবার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হ'ল কেন? উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে আর ভালো লাগে না। ইচ্ছা হ'ল, উত্তরে গিয়ে বহুজনের হিতার্থে কিছু কাজ করি। কিন্তু তখনই উত্তরাপথে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম না। সরোবর থেকে মহানদী পার হয়ে বহুদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলাম। এমন সময় খবর পেলাম, সম্রাট বেন্-তী কেবল উত্তরের চাউ আর ছী ভূমিতেই সন্তুষ্ট নয়, সারা চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়েছে সে। দক্ষিণ চীনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

এবার আমি অজ্ঞাতবাসের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলাম। আমার পা দুটো আপনা থেকেই সেই দেশের দিকে এগিয়ে চলল, যে দেশে এখন সুইবংশের প্রভুত্ব। বেশি দেরি লাগল না, বেন্-তী আমার খবর পেয়ে গেল। সিংহাসনে বসার পরের বছরই (৫৮২ খৃষ্টাব্দে) আমাকে সে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানাল। আমি ছাঙ্-আনের উদ্দেশে রওনা হলাম। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম, মানুষের মনও প্রতারণা করে।

কুড়ি

ছাঙ্-আন্ আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। য়েহ্-তে থাকাকালে দু-একবার এখানে আমি এসেছি। এবার বোধহয় সারা জীবনের জন্য এলাম। তেষট্টি বছর বয়সে আর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না। মহাচীনের প্রথম বিহার—শ্বেতাশ্ব বিহার—যদিও লোয়াঙ্ নগরে তৈরি হয়েছিল, তবু ছাঙ্-আনের প্রাধান্য লোয়াঙের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। লোয়াঙ্ থেকেই আমাদের প্রথম পথপ্রদর্শক কাশ্যপ মাতঙ্গ অনুবাদ আর ধর্মপ্রচারের কাজ করেছিলেন। লোয়াঙ্, ছাঙ-আন্ আর নানকিঙ—এই তিন বিরাট কেন্দ্রে এসে ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। সুই-সম্রাট ইয়াঙ-তী তাঁর পূর্বের রাজবংশের লোকরুচির কথা ভালো করেই জানতেন।

তিনি জানতেন, প্রজাগণগুলীর ধর্মমত জোর করে দমন করলে তার ফল কল্যাণকর হয় না। ভারতের ধর্মরাজ অশোক আর কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। একথা বলা সহজ যে, বৌদ্ধধর্ম বিদেশী ধর্ম, আর কন্-ফু-জু ও লাউ-জু স্বদেশের আচার্য বলে তাঁদের ধর্মমার্গ স্বদেশী—সুতরাং গ্রহণীয়। কিন্তু তথাগতর ধর্ম তো কোনো দেশ, কাল বা জাতির মধ্যে বাঁধা পড়ে নি। মানুষ মাত্রেরই কল্যাণ চেয়েছিলেন তিনি। চীনে এসে আমরা কখনও একথা প্রচার করি নি যে, চীনের নরনারী চীনত্ব ত্যাগ করে অন্য কিছু হোক। আমরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য নষ্ট করতেও চেষ্টা করি নি। আমরা চেষ্টা করেছি তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে তথাগতর ঐতিহ্য মিশিয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করতে। রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে তথাগত কখনও বলেন নি।

সম্রাট ইয়াঙ্ সব দিক দিয়ে দূরদর্শী এবং কর্মঠ পুরুষ ছিলেন। অযোগ্য চাউবংশের বিনাশসাধন করেই আপন কর্তব্য তিনি শেষ করেন নি। উত্তরের শাসন দৃঢ় করে দক্ষিণের চিন্‌বংশের শেষ সম্রাট হো-চু'কে অপসারিত করে উত্তর আর দক্ষিণ চীনকে মহাচীনের রূপ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন: রাজবংশের পরিবর্তন হয়, কিন্তু দেশ ঠিকই থাকে। নিজ বংশের স্বার্থের জন্য দেশবিভাগ ভালো নয়। আমি জানি, আমার এ সুইবংশ অনন্তকাল থাকবে না। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানই যে হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ হোক, কাল হোক—সুইবংশ একদিন লোপ পাবেই। আমি এমন কাজ করতে চাই, যাতে উত্তর আর দক্ষিণের পার্থক্য ঘুচে যায়।

ইয়াঙ্-তী মনের কথা বলতেন। তিনি জানতেন, তরবারির দ্বারা স্থাপিত ঐক্য সবল হয় না। ঐক্য স্থায়ী করার জন্য আরও কিছু করার দরকার হয়। দুই মহানদী চীনকে দু ভাগে ভাগ করেছে, মহানদী দুটির মধ্যে যদি সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে মহাচীন এক হয়ে যাবে। এই ধারণা কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি লোয়াঙের পাশ দিয়ে পীতনদী থেকে খাল কেটে দক্ষিণের মহানদী ইয়াঙ্-চী-কিয়াং' এর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তিনি হাজার লী (এক হাজার মাইল) লম্বা এই খাল। এতেই বোঝা যায়, এই কাজ চীনের মহাপ্রাচীর তৈরির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইয়াং-তী তিরিশ লক্ষেরও বেশি লোক নিযুক্ত করলেন খাল কাটার কাজে। পনের বছরের বেশি বয়সের প্রতিটি লোককে এই কাজে বাধ্যতামূলকভাবে

লাগালেন। এ ছাড়া প্রতি পাঁচ পরিবারের একজন করে বৃদ্ধ কিংবা নারীকে খাবার দাবার পৌঁছুনোর কাজে লোপর্দ করলেন। এ কাজে পঞ্চাশ হাজার সৈনিককেও লাগালেন তিনি। সম্রাট বলতেন: জীবনের কোনো ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে মানুষের কষ্টের সীমা রইল না। কাজ করতে করতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিল। শেষে কয়েক বছর পরে খাল তৈরি হ'ল। সম্রাট বললেন: আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। চিন্‌বংশের সম্রাট শীচ্-হোয়াঙ্ মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেও উত্তরের যাযাবরদের পথরোধ করতে পারেন নি। তার দরকারও ছিল না। আমাদের চীন এত বিরাট যে, কেউ তাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারবে না। ক্ষণকালের জন্য আপন জ্ঞান আর মহত্ত্ব দেখিয়ে সকল বিজেতাকে এই মহাসমুদ্রেই নীল হয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি যে খাল তৈরি করলাম তা চিরদিনের জন্য উত্তর আর দক্ষিণের বিভেদ ঘুচিয়ে দেবে।

ইয়াঙ্-তী ছিলেন খেয়ালী মানুষ। কখনও কখনও তিনি উৎসাহের অপব্যয় করতেন। চীনের বাইরে (কোরিয়ায়) দেশজয় করার জন্য তিনি বহু ধনজন নষ্ট করেছিলেন। খাল কাটা শেষ হলে আপন বৈভব দেখাবার জন্য ছোটখাটো প্রাসাদের মতো পঞ্চাশখানা নৌকো সোনা আর মণিমাণিক্য দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তাঁর নিজের নৌকোখানি ছিল হাল্কা লাল—তিরিশ হাত উঁচু, দেড় হাজার হাত লম্বা, চারতলা, আর বিশাল পোতের মতো বহুকক্ষ-সমন্বিত। সম্রাজ্ঞীর নৌকোও ছিল তেমনি বহুমূল্য মণিমাণিক্য আর সোনায় সজ্জিত। দাসদাসীদের সবাইকে রত্নাভরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীদের জন্য আলাদা আলাদা নৌকো ছিল। আমি তখনও বৈদেশিক ভিক্ষুসংবর্ধক স্থবিরের পদে ছিলাম, তাই সেই নৌ-আবাসের ও প্রধান ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ভিক্ষু জিনগুপ্ত, গৌতম ধর্মজ্ঞান, আমাদের উদ্যানবাসী বিনীতরুচি আর অন্যান্য ভিক্ষু। খালের মাঝ বরাবর চলেছে নৌকোর বহর। তিন হাজার লী পথযাত্রা করতে হবে। খালের দুধার দিয়ে রেশমের দড়ির গুণ টেনে নৌকো নিয়ে চলেছে রেশমের পোশাক পরা হাজার হাজার লোক। তাদের পেছন দিককার বাতাসে রয়ে যাচ্ছে বহুমূল্য সুগন্ধির গন্ধ। চারদিকে কেবল আনন্দমঙ্গল ধ্বনি। শত শত সুন্দরী তরুণী রমণীয় বস্ত্রাভরণে সজ্জিত হয়ে গুণটানা-লোকদের সঙ্গে হাসতে হাসতে চলেছে। পথশ্রমে যাতে কষ্ট

না হয় সেজন্যই যেন খালের দু ধারে রয়েছে গাছের সারি। খালের দুধারে পতাকা হাতে ছুটে চলেছে সওয়ারী। এই দৃশ্য দেখবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে অগণিত নরনারী।

এই বৈভবে আমার মন কিন্তু প্রসন্ন হ'ল না। বরং ব্যথায় ভরে উঠল। যাদের পরিশ্রমে এই বিরাট খাল তৈরি হয়েছে, যারা দেহের রক্ত জল করে এই বৈভব সৃষ্টি করেছে—তাদের কষ্ট কি এতে বিন্দুমাত্র কমেছে? তারাই কি এতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করেনি?

আমি ছাঙ্-আনে পৌঁছুনোর তিন বছর পরে এলেন জিনগুপ্ত। আমাদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। বহু বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। আমার মনের ব্যথা আমি তাঁর কাছে খুলে বলতে পারতাম। মিত্রলাভের খোঁজ করলাম অনেক, কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পেলাম না।

সম্রাটের এই বৈভব দেখে জিনগুপ্তও খুশি হন নি। কিন্তু মহাচীনকে ঐক্য-বদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়েছেন প্রতাপশালী সম্রাট। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবে কে? এই খালের জন্য এখন উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ায় খুব সুবিধা হবে, লোকজনের যাতায়াত সহজ হবে, প্রয়োজন হলে উত্তর থেকে দক্ষিণে সৈন্য পাঠানো যাবে, দক্ষিণের লোকদের যে ধারণা উত্তরে অর্ধ-বর্বরদের বাস, সেই ধারণাও দূর হবে,—সবই ঠিক, সেই সঙ্গে এ-ও ঠিক যে, এতে বহুজনের নয়, অল্পজনেরই হিত আর প্রভুত্ব বাড়বে।

সম্রাট ইয়াঙ্ নতুন করে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। চাউবংশের অত্যাচারের দরুন বড় বড় ভিক্ষুরা পালিয়ে গিয়েছিলেন। সংঘারামগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। এখন সংঘারামের সংস্কার শুরু হ'ল। ভিক্ষুরা আসতে লাগলেন। আমি এলাম। গৌতম ধর্মজ্ঞান আর বিনীতরুচিকে সেই বছরই আমন্ত্রণ করে আনা হ'ল। আমি আসার তিন বছর পর এলেন জিনগুপ্ত। জিনগুপ্ত আগেও একবার চীনে এসেছিলেন। তখন ছাঙ্-আন্ ছিল সম্রাট মিঙ্-এর শাসনাধীন। সম্রাট মিঙ্ তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করিয়েছিলেন 'চতুর্দেবরাজিকা বিহার'। বু-তী' আমলে যখন বৌদ্ধদের ওপর দারুণ অত্যাচার হতে লাগল তখনই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। জিনগুপ্ত ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর প্রতিভা কিছু কিছু বুদ্ধিলের মতো ছিল। চীনা আর তুর্কী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। বহু গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এর আঠাশটি সর্গের এমন সুন্দর অনুবাদ

তিনি করেছেন যে, পড়ার সময় মূল রসেরই স্বাদ পাওয়া যায়। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-এর মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলীও অনুবাদ করেছেন জিনগুপ্ত।

জিনগুপ্ত আমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন। আমি তাঁকে বিদ্যাজ্যেষ্ঠ মনে করতাম। তিনিও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন: বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। বহু বাধাবিপদ তুচ্ছ করে ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্য দিয়ে চাউসম্রাট মিঙের সময় ছাঙ্-আনে এসেছিলেন। উঠেছিলেন চাউ-ইয়াঙ বিহারে। কিন্তু বু-তী'র সময় তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। দেশে ফেরার সময় তিনি যখন তুর্কদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তোপা খান অনুরোধ করল তার ওখান থেকে যেতে। থেকে গেলেন জিনগুপ্ত। তুর্ক-সম্রাটদের মধ্যে তোপা ছিল পরম বুদ্ধভক্ত। জিনগুপ্ত আর তার সঙ্গীদের সাহায্যে সে ধর্মপ্রচার করতে লেগে গেল। সেখান থাকাকালেই জিনগুপ্ত খবর পেলেন, চীনে নতুন রাজবংশ (সুইবংশ) স্থাপিত হয়েছে, বৌদ্ধ-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য তিনি আবার রওনা হলেন। সম্রাট ইয়াঙের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তিনি এলেন মহাচীনে।

বিদেশী ভিক্ষুদের সৎকারের ভার ছিল আমার ওপর। তাই আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান্ ছিলেন আর আমি উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তাই আমার প্রতি তাঁর ঈর্ষা হতে পারত। আসার পরই আমি তাঁকে বললাম: এ পদ আপনি গ্রহণ করুন।

কিন্তু তিনি মুখেই নয়, মন থেকেও চাইলেন, এ পদে যেন আমিই অধিষ্ঠিত থাকি। নানা প্রকৃতির লোকদের সেবা করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া তিনি তাঁর সমস্তটা সময় অনুবাদের কাজে লাগাতে চাইলেন। আমি তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিলাম।

কোনো বিষয়ে আমি নিজেকে জিনগুপ্তের চেয়ে বড় মনে করতাম না। অনুবাদের কাজে তো আমি নিজেকে দীর্ঘসূত্রী বলতে পারি। কিন্তু মহাচীনে ধর্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় পন্থা, অধিক সংখ্যায় তথাগতর উপদেশাবলী অনুবাদ করা। জিনগুপ্তের কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। আমি কামনা করলাম, তিনি শতায়ু হোন (নরেন্দ্রযশের মৃত্যুর এগার বছর পরে ৬০০ খৃষ্টাব্দে জিনগুপ্ত মারা গিয়েছিলেন)। দেশপর্যটনে তিনি আমার চেয়ে কম কষ্ট সহ্য করেন নি। যাত্রাপথে তিনি তাঁর দশজন সহচরের মধ্যে ছ জনকে হারিয়েছেন। তাঁর বিদ্যার পরিচয় পেয়ে অত্যাচারী চাউ-সম্রাট চেয়েছিলেন, তিনি ভিক্ষুর বেশ ছেড়ে সাধারণ গৃহস্থ হয়ে ছাঙ্-আনে

স্থানে বাস করেন। কিন্তু জিনগুপ্ত তা স্বীকার করেন নি। সম্রাট তাঁকে হত্যা করতে পারে, এ ভয়ও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি যে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন তাকে দৈবযোগই বলতে হবে। তুর্কদের দেশে দশটা বছর তিনি আরামে কাটান নি, সঙ্গীদের নিয়ে সেই যাযাবরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাদের স্বভাবে কোমলতা আনার চেষ্টা করেছেন।

কেবল জিনগুপ্ত কিংবা আমি নই, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে শত সহস্র লোক মহাচীনে এসে সাধ্যানুসারে ধর্মের কাজ করেছেন। সবই অনুবাদের কাজ করতে পারতেন না। কেউ চিকিৎসার কাজ করেছেন, কেউ অধ্যাপনার কাজ করেছেন, কেউ-বা উপদেশ দিয়েছেন। চীনে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে তাদের চেষ্টা কম সহায়ক হয় নি। আমাদের অনূদিত গ্রন্থাবলীর যদি কিছু ভবিষ্যতে অবশিষ্ট থাকে আর সেজন্য লোকে যদি আমাদের স্মরণ করে তাহলে সেই সঙ্গে তাঁদেরও স্মরণ করা উচিত, যাঁরা কোনো গ্রন্থ অনুবাদ না করে অন্য অনেক মহৎ কাজ করেছেন।

আমার বয়স এখন (৫৮৯ খৃষ্টাব্দ) একাত্তর বছর। আমার স্বাস্থ্য সব সময়ই ভালো ছিল। ভালো না থাকলে এই দুঃসহ দীর্ঘযাত্রা করে এই বয়স পর্যন্ত পৌছুতে পারতাম না। আজও আমি চলেফিরে বেড়াতে পারি। ছাঙ্-আনের বাইরে বহু বিহারে যাই। লোয়াঙ্, যেহ্-হী-শু, হেঙ্-আন্, নানকিঙ্ প্রভৃতি পুণ্যস্থানেও যেতে হয়। ভিনদেশী ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে আমি বাধ্য হই। সেসব জায়গায় পুরনো পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আমি আনন্দ পাই। নদী আর খালের পথ ছাড়া অন্য পথে আমি হেঁটেই চলি। আমি পুরনো পরিচিতরা খুব কমই বেঁচে আছেন। আমিও তো শরতের শুকনো পাতা, যে কোনো সময় ঝরে পড়তে পারি। সত্তর বছর আগেকার জীবনের কথা যখন ভাবি তখন প্রতিটি জায়গায় হারিয়ে যাওয়া পুরনো বন্ধুদের স্মৃতি আমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু আমার নিজের জীবনের জন্য দুঃখ হয় না। আমি যা ভালো মনে করেছি, মনপ্রাণ দিয়ে তা-ই করেছি। যতখানি যা করতে চেয়েছি, সব করতে পারি নি। কারণ, পথে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল। সেসব বাধা অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাই যেখানে আমি অসফল হয়েছি সেখানে আমার দোষ নেই। সে দোষ আমি স্বীকার করি না।

…নরেন্দ্রযশ আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু যে পথে তিনি গিয়েছেন সেই পথেই আমাদের সকলকে যেতে হবে। বেন্‌-তী' অষ্টম বর্ষে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন তিনি জীবনের সমস্ত কাজ থেকে অবসর নিলেন। তাঁর মহা-প্রয়াণের কথা কাউকে জানতেও দিলেন না। অসুখ করে নি। কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে নি। মিত্রমণ্ডলীর মাঝে বসে ছিলেন, হঠাৎ মাথাটা ঝুঁকে পড়ল —যেন প্রস্ফুটিত ফুল হঠাৎ শুকিয়ে ঝরে গেল।

…আমি জিনগুপ্ত। আমার কথাই তিনি শেষে লিখেছেন। ভালোবেসে প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করেছেন। তার পাত্র আমি নই। তাঁর পর্যটনের কাছে আমার পর্যটন কিছুই না। তাঁর মতো কষ্টও আমাকে সহ্য করতে হয় নি। ইচ্ছা করলে আরও বেশি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করতে পারতেন, আমি যত করেছি। অবলোকিতেশ্বরের করুণার কথা পড়েছি, নরেন্দ্র তাঁরই মতো করুণাময় ছিলেন। তাঁর কাজের কথা, বিশেষ করে তাঁর ভ্রমণকাহিনী তিনি লিখে রেখে যেতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য। চীনে এই ধরনের ভ্রমণকাহিনী লেখার রীতি আছে। তা থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনকাহিনী লিখে গেছেন।

নরেন্দ্র ছিলেন অজাতশত্রু। আমাকে যে তিনি ভালোবাসতেন তার আর একটি কারণ, গান্ধারে আমার জন্ম। উদ্যান আর গান্ধার পাশাপাশি দুটি দেশ। তাঁর কাছে আপন-পর ভেদ ছিল না। সকলে সমানভাবে তাঁর স্নেহ আর বাৎসল্য লাভ করত। তাঁর বড় দুঃখ ছিল, কেন তিনি সহস্রবাহু, সহস্রমুখ আর সহস্রকায় হলেন না! তাহলে একসঙ্গে সহস্রজনের সেবা করতে পারতেন।

বহু গুণের অধিকারী ছিলেন নরেন্দ্র। তাই যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটে এল শেষবারের মতো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর শবযাত্রায় সম্মিলিত হ'ল সকল জাতির মানুষ। ছাঙ্‌-আনের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, ব্যাপারী-বৈশ্য কোনো শ্রেণীর মানুষই বাদ গেল না। কুচী, কুস্তনী তুখারী সকলেই তাঁর জন্য চোখের জল ফেলল।

সমর্যাদায় আমরা তাঁর শব দাহ করলাম। অস্থি এনে বিহারের এক স্তূপে স্থাপন করলাম। তাঁর স্মৃতি চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য করলাম। তিনি থাকলে এসব কিছুই করতে দিতেন না। চিরস্থায়িত্বের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি চাইতেন, প্রাণিমাত্রই সুখী হোক, পৃথিবীর দুঃখসাগর শুকিয়ে যাক।